শ্রাবণ—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম্ম

শ্রীঅরবিন্দ

ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতির মধ্য হইতে গুণত্রয়ের অতীত পরম দিব্য প্রকৃতিতে আত্মার যে মুক্তিপ্রদ বিকাশ, তাহাই হইতেছে আমাদের অধ্যাত্মসিদ্ধি ও মুক্তিতে উপনীত হইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহাও উৎকৃষ্টভাবে সংসাধিত হইতে পারে—যদি ইতিপূর্ব্বে উচ্চতম সাত্ত্বিকগুণের প্রাধান্যের এমন বিকাশ হয় যাহা দ্বারা সত্ত্বও অতিক্রান্ত হয়, নিজের অপূর্ণতা সকলের উর্দ্ধে চলিয়া যায় এবং গুণত্রয়ের দ্বন্দ্বের অতীত এক উর্দ্ধতন মুক্তি, পরমতম জ্যোতি, আত্মার শান্ত শক্তির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। মুক্ত বুদ্ধিতে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাসকল সম্বন্ধে যে উচ্চতম মানসিক ধারণা করিতে পারি তদনুযায়ী এক উচ্চতম সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও লক্ষ্য আমাদের সত্তাকে নূতনভাবে গঠন করিয়া দেয় এবং সেই শ্রদ্ধাই উক্ত পরিবর্ত্তনের দ্বারা আমাদের নিজ সত্য সত্তা সম্বন্ধে দৃষ্টিতে অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। ধর্ম্মের আদর্শ ও নীতি, আমাদের প্রাকৃত জীবনের যথাযথ বিধির অনুসরণ এক যুক্ত সুদৃঢ় স্ব-প্রতিষ্ঠ সিদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়, সেখানে সকল নীতির আবশ্যকতাকে অতিক্রম করা হয় এবং অমৃত আত্মার স্বতস্ফূর্ত্ত ধর্ম্ম দেহ প্রাণ মনের নিম্নতন নীতির স্থান গ্রহণ করে। সাত্ত্বিক মন ও সঙ্কল্প সেই ঐক্যাত্মক জীবনের জ্ঞান ও তপঃ শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবে—যেখানে সমগ্র প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ পরিহার করে এবং তাহার অন্তরস্থিত ভগবানের মুক্ত আত্ম-অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মী তাহার উৎসের সহিত মিলিত, পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত জীবাত্মা হইয়া উঠে; সে নিজে আর কর্ম্মটির কর্ত্তা থাকে না, পরন্তু বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পুরুষের কর্ম্মের অধ্যাত্ম যন্ত্র স্বরূপ হয়। তাহার রূপান্তরিত

ও জ্ঞানালোকিত প্রাকৃত সত্তা এক বিশ্বগত ও নির্ব্যক্তিক কর্ম্মের নিমিত্তস্বরূপ, দিব্যযোদ্ধার ধনুস্বরূপ ব্যবহৃত হইবার জন্য বর্ত্তিয়া থাকে। যাহা ছিল সাত্ত্বিক কর্ম্ম, তাহাই হয় সিদ্ধপ্রকৃতির মুক্ত ক্রিয়া; সেখানে আর ব্যক্তিগত কোন খণ্ডতা থাকিতে পায় না; এই গুণ বা ঐ গুণটিতে কোনরূপ আসক্তি থাকে না—থাকে শুধু এক পরমতম অধ্যাত্ম আত্মরূপায়ণ। ভগবৎসন্ধানী ও অধ্যাত্মজ্ঞানের দ্বারা একমাত্র দিব্যকর্ম্মী ভগবানে সমর্পিত কর্ম্মসকলের ইহাই হয় চরম পরিণতি।

এখনও একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন আছে; প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে সেটির খুবই গুরুত্ব ছিল, আর সেই প্রাচীন মতের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার সাধারণ প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী; গীতা ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়াছে, এখন তাহা যথাস্থানে উত্থাপিত হইতেছে। সাধারণ স্তরে সকল কর্ম্মই গুণত্রয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়; যে-কর্ম্মটি করিতে হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম, তাহার তিনটি রূপ—দান, তপ ও যজ্ঞ এবং ইহাদের প্রত্যেকটি কিম্বা সবগুলিই যে কোন একটি গুণের প্রকৃতি অনুযায়ী হইতে পারে। অতএব ঐগুলিকে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চতম সাত্ত্বিক স্তরে তুলিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া এমন এক প্রসারতায় উপনীত হইতে হইবে যেখানে সকল কর্ম্মই হইবে অবাধ আত্মদান, দিব্য তপের শক্তি, অধ্যাত্মজীবনের নিত্য যজ্ঞ। কিন্তু ইহা হইতেছে একটি সাধারণ নিয়ম, আর এই সকল আলোচনা দ্বারা কেবল সাধারণ তত্ত্বগুলিই বিবৃত হইয়াছে, সেগুলিই নির্ব্বিশেষে সকল কর্ম্ম এবং সকল মনুষ্যের পক্ষেই প্রযুজ্য। সকলেই কালক্রমে অধ্যাত্মবিকাশের দ্বারা এই দৃঢ় সংযম, এই উদার সিদ্ধি, এই উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। কিন্তু যদিও মন ও কর্ম্মের সাধারণ বিধিসকল মনুষ্যের পক্ষে সমান তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বদা বৈচিত্র্যের একটা নীতি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে কেবল মানবীয় আত্মা, মন, সঙ্কল্প, প্রাণের সাধারণ নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করে তাহাই নহে; পরন্তু নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতিরও অনুসরণ করে; প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজের পরিস্থিতি, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও শক্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম সম্পাদন করে—অথবা বিভিন্ন ধারার অনুসরণ করিয়া চলে। এই যে বৈচিত্র্য, প্রকৃতির এই ব্যষ্টিগত নীতি, ইহাকে অধ্যাত্ম সাধনায় কোন স্থান দিতে হইবে?

এই জিনিষটার উপর গীতা কতকটা জোর দিয়াছে; এমন কি প্রারম্ভে যে ইহার খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। প্রথমেই গীতা অর্জ্জুনের স্ব-ধর্ম্মের কথা, ক্ষত্রিয় হিসাবে তাহার প্রকৃতি, নীতি ও কর্ম্মের কথা বলিয়াছে; বিশেষ জোরের সহিত বিধান দিয়াছে যে, যাহার যাহা নিজস্বপ্রকৃতি, নীতি, কর্ম তাহা পালন ও অনুসরণ করা কর্ত্তব্য—ইহা দোষযুক্ত হইলেও সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয় (১); পরের ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া বিজয়লাভ করা অপেক্ষা নিজের ধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়। পরের ধর্ম্ম অনুসরণ করা আত্মার পক্ষে বিপজ্জনক; অর্থাৎ তাহার বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক ধারার বিরোধী, সেটি হয় যন্ত্রবৎ আরোপিত—অতএব বাহির হইতে আরোপিত, কৃত্রিম এবং আত্মার যে প্রকৃত মহত্ত্ব সেইদিকে ক্রমবর্দ্ধনের পক্ষে বিনষ্টিকর। সত্তার ভিতর হইতে যাহা আইসে তাহাই যথাযথ ও স্বাস্থ্যকর জিনিষ, তাহাই অকৃত্রিম কর্ম্মধারা; বাহির হইতে ইহার উপর যাহা জোর করিয়া আরোপ করা হয় অথবা প্রাণের তাড়না বা মনের ভ্রান্তির দ্বারা চাপাইয়া দেওয়া হয় সেইটি নহে। প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক সংস্কৃতির চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্মে এই স্বধর্ম্মের বাহ্যিক মোটামুটি চারি বিভাগ করা হইয়াছে গীতা বলিয়াছে, সেই প্রথা একটি ভগবৎ বিধানের অনুযায়ী মায়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য কথায়, সজ্ঞি প্রকৃতির চারিটি সুস্পষ্ট শ্রেণী আছে, অথবা প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষের চারিটি মূলরূপ বা স্বভাব আছে; যা প্রত্যেক মানুষের উপযোগী কর্ম্ম হইতেছে তাহার প্রকৃতি বিশিষ্ট রূপের অনুযায়ী। এইটিই এখন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। গীতা বলিতেছে, ব্রাহ্ম ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি আধ্যাত্মিক ভাব, মূল স্বরূপ (স্বভাব) হইতে জা

(১) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩। ৩৫

গুণানুসারে তাহাদের কর্ম্মসকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে (২)। শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণের কর্ম্ম—তাঁহার স্বভাব হইতে জাত। শৌর্য্য, তেজ, দৃঢ়সঙ্কল্প, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান এবং ঈশ্বরভাব (শাসন কর্ত্তা ও নেতার ভাব), এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষিকর্ম্ম, গোপালন, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। সকল প্রকার পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহার পর গীতা বলিতেছে, (৩) যে-ব্যক্তি জীবনে আপন স্বভাবানুরূপ কর্ম্ম করে সে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধি লাভ করে; অবশ্য ঐ সিদ্ধিলাভ কেবল কর্ম্মটির দ্বারাই হয় না—পরন্তু যদি সে যথাযথ জ্ঞান ও যথাযথ প্রেরোচনা লইয়া ঐ কর্ম্ম করে, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার অর্চ্চনারূপে যদি সে ঐ কর্ম্ম করিতে পারে, যে বিশ্বেশ্বর হইতে জীবগণের সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই যদি ঐকান্তিক ভাবে ঐ কর্ম্ম নিবেদন করিতে পার কেবল তাহা হইলেই সে সিদ্ধিলাভ করে। যে প্রচেষ্টা, যে ক্রিয়া ও কর্ম্মই হউক না কেন, সবই এইরূপ কর্ম্মার্পণের দ্বারা সমস্ত জীবন, আমাদের ভিতরে ও বাহিরে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে আত্মনিবেদনে পরিণত হইতে পারে এবং তাহাই অধ্যাত্ম-সিদ্ধিলাভের উপায়ে পরিণত হয়। কিন্তু যে-কর্ম্ম কোন ব্যক্তির নিজ স্বভাবের অনুযায়ী নহে, যদিও তাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয়, কোন বাহ্যিক ও কৃত্রিম নীতি অনুসারে বিচার করিলে যদিও তাহা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হয় অথবা জীবনে অধিকতর সাফল্য আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও তাহা আভ্যন্তরীণ বিকাশের পক্ষে নিকৃষ্টতর—ঠিক এই কারণেই যে তাহার প্ররোচনা বাহ্যিক, তাহার প্রেরণা যন্ত্রবৎ (৪)। নিজের স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্মই শ্রেয়, যদিও অন্য কোন দিক দিয়া দেখিলে সেইটি দোষযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। মানুষ যখন সত্য অভিসন্ধি লইয়া এবং নিজের প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করে তখন সে কোনরূপ পাপ বা মালিন্যের ভাগী হয় না। গুণত্রয়ের ক্ষেত্রে সকল ক্রিয়াই ত্রুটিযুক্ত, সকল মানবীয় কর্ম্মই দোষ, চ্যুতি ও অপূর্ণতার অধীন; কিন্তু সে-জন্য আমাদের নিজ নিজ কর্ম্ম এবং স্বাভাবিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত হয় না (৫)। কর্ম্ম হওয়া চাই সুনিয়ন্ত্রিত, নিয়তং কর্ম্ম, কিন্তু তাহা হওয়া চাই মানুষের স্বরূপতঃ নিজস্ব, ভিতর হইতেই বিবর্ত্তিত, তাহার সত্তার সত্যের সহিত সুসমঞ্জস, স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম।

গীতার সঠিক তাৎপর্য্যটি এখানে কি? ইহার যে বাহ্যিক অর্থ সেইটিকেই প্রথমে ধরা যাউক—গীতা যে নীতিটি বিবৃত করিয়াছে ভারতীয় জাতি ও সেই যুগের ধ্যানধারণার দ্বারা ইহা কিরূপ অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, প্রাচীন সংস্কৃতিতে ইহার কি অর্থ ছিল প্রথমে সেইটিই বিবেচনা করা যাউক। এই শ্লোকগুলি এবং এই বিষয়ে গীতা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছে, জাতিভেদ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বাক্‌বিতণ্ডায় তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে, কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া প্রচলিত প্রথার সমর্থন করিতেছে, আবার কেহ কেহ জাতিভেদের বংশানুক্রমিতা অপ্রমাণ করিতেই ইহার সাহায্য লইতেছে। বস্তুতঃ গীতার শ্লোক-গুলি প্রচলিত জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে, কারণ ইহা হইতেছে প্রাচীন সামাজিক চাতুর্ব্বর্ণ্যের আদর্শ আর্য্য-সমাজের চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ এবং গীতার বর্ণনার সহিত ইহার কোন

(২) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥১৮।৪১
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানংবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রাহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩
কৃষি গৌরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪

(৩) স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্ম নিয়তং সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬

(৪) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম ॥৪৭

(৫) সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮

মিলই নাই। কৃষি, গোরক্ষা এবং সকল প্রকার বাণিজ্যকে গীতায় বৈশ্যের কর্ম্ম বলা হইয়াছে; কিন্তু পরবর্ত্তী জাতিভেদ প্রথায় যাহারা কৃষি এবং গোরক্ষায় ব্যাপৃত, শিল্পী, ক্ষুদ্র-কারিগর এবং অন্যান্য অনেকেই বস্তুতঃ শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে; কোথাও বা তাহারা সমাজের গণ্ডীর বাহিরে পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়িয়াছে; আর কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত কেবল বণিক শ্রেণীই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বত্র নহে। কৃষি, রাজকার্য্য, চাকুরী, এই সব বৃত্তি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই অবলম্বন করিতেছে। এই ভাবে অর্থনীতিক কর্ম্মবিভাগে এমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে যে তাহার আর সংশোধনের কোন সম্ভাবনাই নাই; আর গুণানুসারে কর্ম্মের নীতির স্থান ত জাতিভেদ প্রথায় আরও কম। এখানে আছে শুধু আচারের দৃঢ় বন্ধন, ব্যষ্টিগত প্রকৃতির প্রয়োজনের কোন হিসাবই লওয়া হয় না। আর জাতিভেদ প্রথার সমর্থকগণ ধর্ম্মের দিক্ হইতে যে তর্ক উত্থাপন করেন তাহা বিবেচনা করিলেও আমরা নিশ্চয়ই গীতার কথাগুলির উপর এমন অদ্ভুত অর্থ আরোপ করিতে পারি না যে, মানুষ তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের কোন হিসাব না লইয়াই তাহার পিতামাতার বা নিকট বা দূর পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবে, গোয়ালার ছেলে গোয়ালা হইবে, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হইবে, মুচির বংশধরগণ আবহমান কাল পর্য্যন্ত বরাবর জুতাই তৈয়ারী করিবে—এইটিই হইতেছে তাহার স্বধর্ম্ম; আর নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণা বা গুণাগুণের হিসাব না লইয়া এইরূপ নির্ব্বোধ ও গতানুগতিক ভাবে পরধর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিলে আপনা হইতেই সে বিকাশের পথে অগ্রসর হইবে এবং অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ করিবে—গীতার শিক্ষার এরূপ ব্যাখ্যা করা ত আরও অসমীচীন। প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রথা আদর্শ বিশুদ্ধ অবস্থায় যেমনটি ছিল অথবা ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইহা কখনই একটা আদর্শ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না অথবা ইহা ছিল একটা সাধারণ নিয়ম; বাস্তব জীবনে লোকে অল্পাধিক শৈথিল্যের সহিতই ইহার অনুসরণ করিত) সেইটিই হইতেছে এখানে গীতার কথাগুলির প্রকৃত লক্ষ্য এবং কেবল সেই প্রথার সম্বন্ধেই গীতার কথাগুলি বিবেচনা করিতে হইবে। আবার এখানেও বাহ্যিক অর্থটি যে ঠিক কি ছিল তাহা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার তিনটি দিক ছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক। অর্থ-নীতির দিক দিয়া ইহা সমষ্টি জীবনে সামাজিক মানুষের চারিপ্রকার কর্ম্ম ঠিক করিয়াছিল, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও বুদ্ধি-বিষয়ক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম। অতএব কর্ম্ম চারি প্রকারে—পৌরহিত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চ্চার কর্ম্ম, রাজ্যশাসন, রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালন ও যুদ্ধের কর্ম্ম, উৎপাদন, অর্থোপার্জ্জন এবং বাণিজ্যের কর্ম্ম, মজুর ও পরিচারকের কর্ম্ম। চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে এই চারি প্রকার কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেওয়ার উপর সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই প্রথা শুধু যে ভারতেরই বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে; সামাজিক ক্রম বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ অবস্থায় কিছু বৈষম্যের সহিত এই প্রথা অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজেরও প্রধান লক্ষণ ছিল। এখনও সাধারণতঃ সকল সমাজের জীবনেই এই চারি প্রকার কর্ম্ম অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগ আর কোথাও নাই। প্রাচীন প্রথাটি সর্ব্বত্রই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছিল একটা অধিকতর শিথিল ব্যবস্থা, অথবা যেমন ভারতে হইয়াছে—একটা বিশৃঙ্খল ও জটিল সামাজিক আড়ষ্টতা ও অর্থনৈতিক অচলতার উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহা শেষ পর্য্যন্ত জাতিভেদের বিষম গোলমালে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটা কৃষ্টিগত আদর্শ; তাহা প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তাহার ধর্ম্মবিষয়ক আচার, তাহার মর্য্যাদার ধারা, নৈতিক বিধি বিধান, উপযোগী শিক্ষা ও অনুশীলন, বিশিষ্ট চরিত্র, বংশগত আদর্শ ও সাধনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বাস্তব জীবনের সত্য সকল সময়েই যে পরিকল্পনাটির অনুরূপ ছিল তাহা নহে (মানসিক আদর্শ এবং প্রাণ ও দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহার, এই দুইয়ের মধ্যে সকল সময়েই কতকটা ব্যবধান থাকে), কিন্তু যতদূর সম্ভব আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার একটা অবিশ্রান্ত ও অদম্য প্রয়াস চলিয়াছিল। এই প্রয়াসের এবং অতীতে সামাজিক মানুষের শিক্ষা ও সাধনায় ইহা যে কৃষ্টিগত আদর্শ ও পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী ছিল;

কিন্তু অতীতের সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ইহার যে মূল্য আছে তাহা ছাড়া আজিকার দিনে ইহার আর কোন সার্থকতাই নাই। শেষতঃ যেখানেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানেই ইহা ধর্ম্মভাবের দ্বারা অল্পাধিক সমর্থিত হইয়াছিল (প্রাচ্যদেশে অধিক, ইউরোপে খুবই অল্প) এবং ভারতে ইহাকে এক গভীরতর আধ্যাত্মিক উপযোগিতা ও অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। এই আধ্যাত্মিক অর্থটিই হইতেছে —গীতার শিক্ষার যথার্থ মর্ম্ম কথা।

গীতা যখন রচিত হয় তখন এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল এবং ইহার আদর্শটি ভারতীয় মনকে অধিকার করিয়াছিল; গীতা এই আদর্শ এবং ইহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি দুইটিই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণ আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে" (৪।১৩)। কেবল এই উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে পারা যায় না যে, গীতা এই প্রথাটিকে শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ এইরূপ স্বীকার করে নাই; বরং তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, আদিতে ইহা ছিল না এবং যুগ বিবর্ত্তনে পরবর্ত্তীকালেও ইহা থাকিবে না। তথাপি এই উক্তিটি হইতে এমন বুঝা যাইতে পারে যে, সামাজিক মানুষের যে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মবিভাগ—ইহা সাধারণতঃ প্রত্যেক সমাজেরই মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অন্তর্নিহিত; অতএব যে বিশ্বপুরুষ সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত মানব জীবনে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, এইটি তাঁহারই একটি দিব্য বিধান। বস্তুতঃ গীতার এই পদটি হইতেছে সাধারণ বুদ্ধির ভাষায় বেদের পুরুষ সূক্তের বিখ্যাত রূপকটির * বিবৃতি। কিন্তু তাহা হইলে এই সকল কর্ম্মবিভাগের স্বাভাবিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক রূপ কি হইবে? প্রাচীন কালে বংশানুক্রমিক নীতিটিই কার্য্যতঃ ভিত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম মানুষের সামাজিক কর্ম্ম ও পদ-মর্য্যাদা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সুযোগ, জন্ম ও সামর্থ্যের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এখনও মুক্ততর এবং অপেক্ষাকৃত শিথিলবদ্ধ সমাজে এইরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু সামাজিক স্তরবিভাগে যেমন বেশী বেশী বাধা-ধরা হইয়া পড়িল, মানুষের পদমর্য্যাদাও কার্য্যতঃ জন্মের দ্বারাই প্রধানতঃ কিম্বা কেবল তাহারই দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল এবং পরবর্ত্তী জাতিভেদ প্রথায় জন্মই পদমর্য্যাদার একমাত্র বিধি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণের ছেলে পদমর্য্যাদায় সকল সময়েই ব্রাহ্মণ, যদিও ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও চরিত্রের কিছুই তাহার মধ্যে না থাকে—বুদ্ধিগত শিক্ষা বা অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যোগ্যতা বা জ্ঞান না থাকে, তাহার আপন শ্রেণীর যথার্থ কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহার কর্ম্মে বা তাহার প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণত্বের কিছুই না থাকে।

এইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল; কারণ কেবল বাহ্যিক লক্ষণগুলিই সহজে এবং সুবিধামত নির্ণয় করা সম্ভব এবং ক্রমশঃ বেশী বেশী যন্ত্রভাবাপন্ন জটিল ও গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থার জন্যই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক লক্ষণ। কল্পিত বংশানুক্রমিক গুণের সহিত মানুষের প্রকৃত সহজাত চরিত্র ও সামর্থ্যের যে পার্থক্য হওয়া সম্ভব তাহা শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা পূরণ করিবার বা যথাসম্ভব কম করিবার চেষ্টা কিছুকাল হইয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে এই প্রয়াস বন্ধ হইয়া যায় এবং বংশানুক্রমিক প্রথাই অনতিক্রমণীয় বিধান হইয়া পড়ে। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বংশানুক্রমিক প্রথা স্বীকার করিলেও বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, গুণ, চরিত্র এবং সামর্থ্যই হইতেছে একমাত্র সুদৃঢ় ও যথার্থ ভিত্তি; এইগুলি না থাকিলে বংশগত সামাজিক পদমর্য্যাদা আধ্যা-ত্মিক মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়—কারণ তাহার প্রকৃত সার্থকতা নষ্ট হইয়া যায়। গীতাও যেমন সর্ব্বত্র তেমনিই এখানে আভ্যন্তরীণ সত্যটির উপরেই তাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গীতা একটি শ্লোকে মানুষের জন্মের সহিত জাতকর্ম্মের কথা বলিয়াছে বটে, সহজম্ কর্ম্ম, কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বংশানুক্রমিক ভিত্তি বুঝায় না। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে ভারতীয় তত্ত্বটিই গীতা গ্রহণ করিয়াছে এবং তদনুসারে মানুষের সহজাত প্রকৃতি এবং জীবনের ধারা মূলতঃ তাহার অতীত জন্ম সকলের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, এ-সব হইতেছে তাহার অতীতের কর্ম্ম এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনের দ্বারা ইতিপূর্ব্বেই সম্পাদিত আত্মবিকাশ; এ-সব কেবল তাহার বংশ, পিতামাতা, শারীরিক জন্মরূপ স্থূল ব্যাপারের উপর নির্ভর করে না, এইগুলি কেবল একটা

* ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যকঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

পরিচায়ক লক্ষণ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু মুখ্যশক্তি নহে। 'সহজ' শব্দটির অর্থ যাহা আমাদের সহিত জন্মিয়াছে, যাহা কিছু স্বাভাবিক, সহজাত, অন্তর্নিহিত; গীতা অন্য সকল স্থানে ইহার পরিবর্ত্তে "স্বভাবজ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। মানুষের কর্ম্ম বা বৃত্তি তাহার গুণের দ্বারাই নির্দ্ধারিত; ইহা হইতেছে তাহার স্বভাব হইতে জাত কর্ম্ম, স্বভাবজম্ কর্ম্ম এবং তাহার স্বভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম। কর্ম্ম ও বৃত্তির ভিতর দিয়া যে আভ্যন্তরীণ গুণ ও ধর্ম্ম প্রকট হইতেছে তাহার উপর জোর দেওয়াই হইতেছে গীতার কর্ম্ম-বাদের সমগ্র তত্ত্ব।

আর গীতা স্বধর্ম্মের অনুসরণের যে আধ্যাত্মিক সার্থকতা ও শক্তি দেখাইয়াছে, বাহ্যিক রূপটির উপর জোর না দিয়া আভ্যন্তরীণ সত্যের উপর এই জোর দেওয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি। এইটিই হইতেছে গীতার এই অংশটির বাস্তবিক প্রয়োজনীয় মর্ম্মকথা। বাহ্যিক সামাজিক ব্যবস্থার সহিত ইহার সম্বন্ধের উপর সাধারণতঃ অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, যেন ঐ বাহ্যিক ব্যবস্থাটিকে তাহার উৎকর্ষতার জন্যই সমর্থন করা কিম্বা দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বারা উহার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করাই ছিল গীতার লক্ষ্য। বস্তুতঃ বাহ্যিক ব্যবস্থাটির উপর গীতা খুবই কম ঝোঁক দিয়াছে; পরন্তু বর্ণব্যবস্থা যে আভ্যন্তরীণ নীতিকে বাহ্যিক ব্যবহারে সুনিয়ন্ত্রিত রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল গীতা তাহারই উপর খুব বেশী ঝোঁক দিয়াছে। আর ব্যষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনে এই নীতিটির যে উপযোগিতা—এখানে সেইটিরই উপরে রহিয়াছে গীতার দৃষ্টি, সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক জীবনে অথবা অন্য কোন সামাজিক ও কৃষ্টিগত প্রয়োজনে ইহার যে উপযোগিতা আছে তাহার উপরে নহে। গীতা বৈদিক যজ্ঞের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাকে গভীর-ভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে ইহার এমন এক আভ্যন্তরীণ, অন্তর্মুখী ও সার্ব্বজননীন অর্থ—এমন একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য দিয়াছে যাহাতে ইহার সমস্ত মূল্যের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখানেও ঠিক ঐভাবে গীতা মানুষের চারিবর্ণ বিভাগকে গ্রহণ করিয়াছে, তবে ইহাকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে—ইহার এক আভ্যন্তরীণ, অন্তর্মুখী ও সার্ব্বজনীন অর্থ, একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ভাবটির মূল্য অন্যরূপ হইয়াছে এবং তাহা এক স্থায়ী ও জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর কোন বিশেষ অস্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। যে আর্য্যসমাজ ব্যবস্থা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে তাহার বৈধতা প্রতিপাদন করাই গীতার লক্ষ্য নহে—যদি শুধু তাহাই হইত তাহা হইলে গীতার স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম্মের নীতিতে কোন চিরন্তন সত্য বা মূল্য থাকিত না—গীতার লক্ষ্য হইতেছে মানুষের বাহিরের জীবনের সহিত তাহার অন্তর্জীবনের সম্বন্ধ, তাহার অন্তরাত্মা হইতে, তাহার প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ধারা হইতে তাহার কর্ম্মের বিবর্ত্তন।

আর আমরা বস্তুতঃ দেখি যে, গীতা নিজেই তাহার উদ্দেশ্যটি খুবই স্পষ্ট করিয়াছে; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম বাহ্যিক বৃত্তির দিক দিয়া বর্ণনা না করিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা, পৌরোহিত্য এবং শাস্ত্রচর্চ্চা বা শাসনকার্য্য, যুদ্ধ এবং রাজনীতি এইরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দিক দিয়াই বর্ণনা করিয়াছে। এখানে গীতার ভাষাটি আমাদের কাছে কেমন একটু বিচিত্রই লাগে। শান্তি, আত্মসংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমাশীলতা, সরলতা, জ্ঞান, অধ্যাত্ম সত্য গ্রহণ ও অনুশীলন—সাধারণতঃ এইগুলি মানুষের বৃত্তি, কর্ম্ম বা পেশা বলিয়া কথিত হয় না। অথচ গীতা ঠিক এইটিই বুঝিয়াছে এবং বলিয়াছে—বলিয়াছে যে, এই সব জিনিষ, ইহাদের বিকাশ, ব্যবহারের ভিতর দিয়া ইহাদের অভিব্যক্তি, সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধর্ম্মকে রূপ দিবার পক্ষে ইহাদের ক্ষমতা এই সবই হইতেছে ব্রাহ্মণের প্রকৃত কর্ম্ম; শিক্ষা, পৌরোহিত্য এবং অন্যান্য বাহ্যিক কর্ম্মগুলি হইতেছে কেবল ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র, এই আভ্যন্তরীণ বিকাশের অনুকুল উপায় স্বরূপ, ইহার যথাযথ আত্ম-অভিব্যক্তি, সুনির্দ্দিষ্ট বর্ণগত আদর্শে এবং বাহ্যিক চরিত্রের সুদৃঢ়তায় ইহার স্থায়ী রূপলাভের পন্থা-স্বরূপ। যুদ্ধ, রাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, নেতৃত্ব ও শাসন হইতেছে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্র এবং উপায়; কিন্তু তাহার প্রকৃত কর্ম্ম হইতেছে সক্রিয় যুযুধান রাজোচিত বা বীরোচিত প্রকৃতির ধর্ম্মকে বিকাশ করা, ব্যবহারে অভিব্যক্ত করা, বাহ্যরূপে এবং গতির ওজস্বান ছন্দে প্রকট করা। বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম্ম বাহ্যবৃত্তির দিক দিয়াই

বর্ণিত হইয়াছে, আর এই যে বৈপরীত্য ইহারও কিছু অর্থ থাকিতে পারে। কারণ যে প্রকৃতি উৎপাদন ও উপার্জ্জনের দিকে চলে, কিম্বা শ্রম ও পরিচর্য্যার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বণিকের ও দাসের মনোবৃত্তি—ইহারা সাধারণতঃ হয় বহির্মুখী, কর্ম্মের চরিত্র গঠন করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা ইহার বাহ্যিক মূল্য লইয়াই অধিক ব্যাপৃত থাকে; আর প্রকৃতির সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার পক্ষে এই প্রবৃত্তি তেমন অনুকুল নহে। আর এই কারণেই ব্যবসা ও যন্ত্র-শিল্পের যুগ অথবা কর্ম্ম ও উৎপাদনের চিন্তায় ব্যাপৃত সমাজ নিজের চারিদিকে এমন একটা আবেষ্টনের সৃষ্টি করে যাহা অধ্যাত্ম-জীবন অপেক্ষা ঐহিক জীবনেরই অধিকতর অনুকূল; ঊর্দ্ধগামী মন ও আত্মার সূক্ষ্মতর সিদ্ধি অপেক্ষা স্থূল জীবনে দক্ষতার পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। তথাপি এই ধরণের প্রকৃতি এবং ইহার কর্ম্মেরও আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে এবং তাহাদিগকেও সিদ্ধিলাভের উপায় ও শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। অন্যত্র যেরূপ বলা হইয়াছে, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মণ এবং মহানুভবতা, শৌর্য্য ও মহৎ চরিত্র শক্তির আদর্শ লইয়া ক্ষত্রিয়, শুধু ইহারাই নহে—পরন্তু ধনোপার্জ্জনব্রতী বৈশ্য, শ্রম পাশে বদ্ধ শূদ্র, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ও পরাধীন জীবন লইয়া নারী, এমন কি পাপ-যোনিসম্ভূত চণ্ডাল, ইহারাও এই পথ ধরিয়া অচিরাৎ উচ্চতম আভ্যন্তরীণ মহত্ত্ব ও অধ্যাত্ম স্বাধীনতার দিকে, সিদ্ধির দিকে, মানুষের মধ্যে যে দিব্য সত্তা রহিয়াছে তাহার মুক্তি ও পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। *

* Essays on the Gita হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

কালিদাস

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

উজ্জয়িনীর রঙ্গমঞ্চে,
নব রত্নের সভাতে—
রাজা বিক্রম বিষণ্ণ মন
বসিয়া আছেন প্রভাতে।

হয়ে গেছে কাল শকুন্তলার
সর্ব্ব প্রথম অভিনয়,
নট নটী দল বিদায় মাগিছে,
প্রণতি জানায়ে সবিনয়।

কি সুধার পরিবেশন করেছে
সে কি আদর্শ চারু তার,
দিকে দিকে ছোটে যশ সৌরভ
সেই অপূর্ব্ব বারতার।

তন্ময় আজ গোটা রাজধানী,
একই কথা সব ভবনে,
'মৃদু মৃগ দেহে মেরোনা ক শর'
এখনো পশিছে শ্রবণে।

শকুন্তলার বিরহে যেমন
অবসাদ লীন তপোবন,
বিশাল বিশালা তেমনি হয়েছে
শিথিল সবার দেহ মন।

বলিলেন রাজা হে কবি তোমার
প্রতিভা দিয়েছে যে আভাষ
সেই ত যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি
সেই ত মোদের ইতিহাস।

যা কিছু রম্য, যাহা সুমধুর,
তুমি রেখে গেলে কুড়ায়ে,
কাল ভাণ্ডারে তব অবদান
দানেতে যাবে না ফুরায়ে।

শত সহস্র বরষ পরে ও
এই সুধারস গড়াবে,
জন্মান্তর সৌহার্দ্দ্য কি
স্মরাবে হে সখা স্মরাবে ?

বন জ্যোৎস্নার কুসুমোদ্গম,
মৃদু গুঞ্জন ভ্রমরের,
হংস পদীর ও গীত লহরী
ভোগ্য করিলে অমরের।

তরু আলবালে জল দেয় বালা,
মৃগ করে কার পথ রোধ,
তাদের ও চিত্র অমর করেছে
নিবিড় তোমার রস বোধ।

মোদক খণ্ড-লোভী মাধবৎ,
মোর কঞ্চুকী সারথি,
অনন্ত প্রাণ লভিয়া আজিকে
হেরিছে তোমার আরতি।

পরভৃতা তব শুনিয়াছে শ্লেষ,
আতপত্র ও হাসিছে,
মূক ও মৌন তোমার পরশে
মুখর হইয়া আসিছে।

সে দিনের সেই উৎসব প্রাতে
দেখিনু দাঁড়ায়ে দুজনায়,
একদিকে উঠে রাঙ্গা হ'য়ে রবি
আন্ দিকে শশী ডুবে যায়।

লোক ভাগ্যের ব্যসন উদয়
কি ছবি ফুটালে তুলিতে,
অতুলন তব প্রকাশ ভঙ্গি,
কিছু যে দেবে না ভুলিতে।

সিপ্রা আনিলে কি মন্ত্র দিলে
মূর্ত্তি রচিলে কি রসের ?
মোদের ক্ষণিক সুখ দুখ হল—
আনন্দ চির দিবসের।

অতি সন্ধানী কঠিন বড়ই
তোমার নিকট করা বাস,
মরমের ব্যথা, সরমের কথা,
কিছুই রাখ নি অপ্রকাশ।

নভো ঘেরা তব ইন্দ্রজালেতে
সকলি ধরেছ যাদুকর,
তত্ত্ব খুঁজিয়া মোরা হারা হই
কৃতী ত তুমিই মধুকর।

আজিকার আমি প্রবল মালিক,
কেহ নই আমি বালিকার,
জীর্ণ তুচ্ছ লৌহ তন্ত্র—
নব রত্নের মালিকার।

হে মহামানব চিনেও চিনেনি
হয়ত কয়েছি কুভাষণ,
কাল কালিমার অনেক উর্দ্ধে
উজ্জ্বল তব সুখাসন।

অনন্ত পথে উঠ জয় রথে
কত করিয়াছি পরিহাস,
তুমি যে আমার এই গৌরব
আমরা তোমার কালিদাস।

হে কবি এ যুগ ধন্য করিলে,
সজীব করিলে আঁকিয়া
মহাকাল ভালে অমৃতক্ষরা
শশি-কলা গেলে রাখিয়া।

রাজ্য ও রাজা মিলাইয়া যাবে
কাল সাগরেতে পাবে লয়,
তুমি আমাদের মরণ সুহৃদ
তুমি আমাদের পরিচয়।

বিনীত বেশেতে যেতে হবে কবি
পরাইয়া দাও তব চীর,
অকূলের কূলে দেখাইয়া দাও
কোথা আশ্রম মরীচির।

বন্ধুর দেওয়া বিজয় তিলক
মুছনা হে কবি মুছনা
আসে অনাগত গুরু গৌরব
এ কেবল তারি সূচনা।

গল্প ও উপন্যাস

কালরাত্রি

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পুঁটুরাণীর ভালো নাম বিজনবাসিনী। এ নাম রাখিয়াছে তাহার স্বামী। অখ্যাত এক পল্লীগ্রামের শেষপ্রান্তে তাহাদের খড়ে ছাওয়া মাটির কুটীর—সোনারপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা তাহাদের সেই কুটীরের কিছু দূরে দামোদরবাহিনী শাখানদী সুবর্ণরেখা। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে সে, বৃদ্ধ পিতার শেষ বয়সের একমাত্র সন্তান। পিতা মারা গিয়াছেন আজ প্রায় এক বৎসর, আপনার বলিতে তাহার এখন আর কেহ নাই, সংসারে সে একান্ত একা।

পুঁটুরাণীর বয়স পনেরো। হরিণীর মতো আয়ত মদির তাহার চোখের তারা দুইটি নিবিড় কালো, বৃষ্টিধৌত স্নিগ্ধ শ্যামল পল্লবের মতো গায়ের রঙ, চাঁপার কলির মতো কোমল আঙুল, নিটোল উজ্জ্বল কপাল, জোড়া ভ্রূর নীচে ভ্রমরের মতো দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ চোখের পাতা, বাঁশির মতো উন্নত নাসিকা, শাঁখের মতো গ্রীবা, বলয়িত দুই বাহু এবং নবকিশলয়ের মতো লাবণ্যে ঢলঢল মুখখানির বুঝি তুলনা নাই।

পুঁটুরাণীর সৌভাগ্যেরও বোধ করি সীমা নাই। সাহেবগঞ্জের এক রাজা উপাধিধারী বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র বরুণেন্দ্রনাথ সেবার বাহির হইয়াছিল বাঙলাদেশের পল্লী-ভ্রমণে। সুবর্ণরেখা নদীপথে নৌকাবিহার করিতে করিতে সেদিন যখন ছায়ানিবিড় স্বপ্নময় মাধুরীভরা ছোট একখানি গ্রাম এবং এই নদী জলরেখার উপরে ধীরে ধীরে ঘুমের সন্ধ্যা-গোধূলির ছায়া ঘনাইয়া আসিল, তখন আচ্ছন্নের মতো মাঝিকে সে সেখানেই নৌকা বাঁধিতে বলিল। তখন পটে আঁকা ছবির মতো সেই পল্লীর চারিদিকে ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে অসীম বিজনতা, ঘনায়মান গোধূলি-অন্ধকারের সেই আশ্চর্য্য রমণীয় স্তব্ধতার মধ্যে রামধনু-রঙীন আকাশে ক্ষান্ত-বর্ষণ শ্রাবণ শেষ হইয়া শেফলি-শুভ্র শরৎকালের আগমনীর বাঁশি বাজিতেছে। পুঁটুরাণী তখন কলসী লইয়া নদীর ঘাটে জল লইতে আসিয়াছিল। এই শ্যামায়মান রহস্যময় গোধূলি-আলোকের পরম মুহূর্ত্তে সহসা বরুণেন্দ্রনাথের সহিত পুঁটুরাণীর শুভদৃষ্টি ঘটিয়া গেল। মুগ্ধের মতো বহুক্ষণ বরুণ এই অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর আরক্তিম প্রফুল্ল মুখের দিকে অনিমেষ চোখে চাহিয়া রহিল। পুঁটুরাণী তখন সলজ্জ সঙ্কোচে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিতে সুরু করিয়াছে।

চমক ভাঙিলে বরুণ ডাকিল, শোনো!

পুঁটুরাণী সম্ভ্রমে সরমে সেই উন্নত গ্রীবা ফিরাইয়া সপ্রশ্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

আবেগকম্পিত অস্ফুটকণ্ঠে বরুণ কহিল, তোমার নাম কি ?

পুঁটুরাণীর কপালে তখন মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম দেখা দিয়াছে। আনতমুখে অস্ফুটমধুর কণ্ঠে সে কহিল, পুঁটুরাণী।

বরুণের এবার একটু ভয় ভাঙিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বাড়ী কত দূরে!

পুঁটুরাণীর অপরিচয়ের রহস্যভরা লজ্জাও যেন একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতেছে। অদ্ভুত প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সুন্দর তরুণের এই অভাবিত প্রশ্নে তাহারও বিস্ময়ের অবধি নাই। এবার একটু স্পষ্টকণ্ঠেই সে কহিল, এই ত, কাছেই।

বরুণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, কে কে আছেন তোমার ?

পুঁটুরাণীর সারল্যভরা করুণ ভীরু চোখ দুইটি সহসা ছলছল করিয়া উঠিল। ধরা গলায় সে কহিল, কেউ না।

ব্যথিত বিস্ময়ে বরুণ কিছুক্ষণ চুপ করিরা রহিল। তারপর সহসা বলিয়া উঠিল, আমি বিদেশী। আজ রাত্রে এই গাঁয়ে কোথাও আশ্রয় চাই। তাই··

সহসা পুঁটুরাণী বলিয়া ফেলিল, আপনি চলুন, পাশের বাড়ীতে আমার গ্রাম-সম্পর্কে পিসীমা আছেন, তিনি আমার মায়ের মতো, আপনার কোনো কষ্ট হবে না।

বরুণের মনে হইল, এই অপরিচিতা কিশোরীর কণ্ঠস্বর

বীণাবিনিন্দিত, তাহার এই সহজ, ব্যগ্র, ব্যাকুল আবাহন যেন উন্মাদক মোহের মতো তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই ছায়াশ্যামলা নদীমেখলা অপরূপ মাধুরীমন্দির মৌন গ্রামশ্রী, কুমারীর শুভ্র সিঁথির মতো দীর্ঘ পায়ে-চলা পথ, সজলকোমল শ্যাম দূর্ব্বাদলে বিকীর্ণ নদীতীর এবং মূর্ত্তিমতী গ্রামলক্ষ্মীর মতো আল্‌তা-রাঙা পায়ে দাঁড়াইয়া এই বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরী—বরুণের মনে হইল, বুঝি এই রহস্যময়ী বিজনবাসিনী পুঁটুরাণীর রূপের অবধি নাই।

গ্রাম-সম্পর্কে পিসীমা মহামায়া দেবীর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বয়সও হইয়াছে, পুঁটুরাণীর ভাবনায় তাঁহার বিন্দুমাত্র স্বস্তি ছিল না। তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন।

গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পুঁটুরাণীকে স্নেহ করিত। তাহার করুণ সুন্দর মমতাময় ভীরু চোখদুটির দিকে চাহিয়া অপরিসীম ভালোবাসায় তাহাদের বুক ভরিয়া উঠিত।

বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী চপলাঠাকরুণ বলিলেন, আহা বাপ-মা-মরা মেয়েটার ভাগ্যি ছিল গো! হবেই না বা কেন, লক্ষ্মীর মতো রূপ যেন গা ফেটে পড়ছে, ওর কি কষ্ট হতে পারে কখনো?

পুঁটুরাণী তখন রান্নাঘরে বসিয়া আপন মনে ক্ষণে ক্ষণে অজানা আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। পিছন হইতে কমলা আসিয়া তাহার দুই চোখ টিপিয়া ধরিল।

পুঁটুরাণী সহসা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, উঃ, ছাড়ো ছাড়ো লাগছে কমলদি!

চোখ ছাড়িয়া দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানে-কানে কমলা কহিল, সত্যি তোর পছন্দ আছে রাণী।

লজ্জায় তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া পুঁটুরাণী বলিয়া উঠিল, যাঃ।

পাশের ঘরে কমলার মা সুনয়নী তখন মহামায়া দেবীকে বলিতেছিলেন, জ্যাঠামশাই যে বলতেন ও রাজরাণী হবেই, সে কথা ত সত্যি হয়ে গেল!

কমলা কহিল, যাঃ কি, ওই শোন্। চল তোর বর দেখে আসি। বেচারী বড় ফাঁপরে পড়ে গেছে। দূরের কোন্ মাঠ হইতে যেন গাভীর হাম্বারবকে ডুবাইয়া রাখাল-ছেলের বাঁশির সুর ভাসিয়া আসিতেছে। আমনধানের গন্ধে ভরা এই অপরূপ শ্যামলী প্রকৃতির উচ্ছলিত শরীর হইতে যেন একটি করুণ শেফালি-সৌরভ শিশির-সজল পূবালি বাতাসে ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছে।

তখনও বেলা বেশি হয় নাই। রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা দাওয়ার পাশে বরুণেন্দ্রনাথ বসিয়া আছে। অপূর্ব্ব সুন্দর আরক্তিম গৌরকান্তি, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, বিস্ফারিত বক্ষ, খড়্গের মতো নাসা, প্রশস্ত ললাট এবং বিশাল দুই চক্ষুর আশ্চর্য্য উজ্জ্বলতা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন নিপুণ ভাস্করের হাতে মর্ম্মর-খোদিত সজীব প্রতিমূর্ত্তি! তাহার দৃষ্টি তখন বহু দূরে প্রসারিত। সুমুখে কোমল দূর্ব্বাদলে ঢাকা দিগন্তলীন প্রান্তরে প্রজাপতি উড়িতেছে। রামধনু-রঙীন ক্ষণ-চপল রৌদ্রকরোজ্জ্বল স্ফটিকস্বচ্ছ অবারিত প্রসন্ন নীল আকাশে বিচিত্র পাখীর কাকলী যেন মূর্চ্ছিত, স্বপ্নাতুর গ্রামশ্রীকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে।

ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য স্নান-আহ্নিক সারিয়া খড়ম পায়ে দিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামের মধ্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি জনকের মতো জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার জীবন। পুণ্যের একটি অচঞ্চল শুভ্র দিব্য দীপ্তিতে তাঁহার বিশাল দেহ হইতে যেন অপরূপ একটি প্রসন্ন মহিমা বিকীর্ণ হইতেছে। গম্ভীর অথচ বিরাট পুরুষ, কপালে চন্দনলেখা, গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালার নীচে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ দেখা যাইতেছে।

বরুণ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মধুর হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন, থাক্, থাক্, বোসো বাবা বোসো। তোমার নাম কি?

নতমুখে বরুণ বলিল, শ্রীবরুণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, পুঁটুরাণীকে তুমি বিয়ে করতে চাও?

বরুণ জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল। কপালে তাহার তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।

ভবানীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবাকে জানাতে হবে ত? পরশুই ভাদ্রমাস পড়ে যাচ্ছে।

বরুণ বলিল, তাঁকে না জানালেও বিশেষ ক্ষতি নেই। বিয়েতে আমার মত ছিল না ব'লে তাঁর বড় দুঃখ ছিল। তাঁর অমত হবে বলে মনে হয় না।

গম্ভীরকণ্ঠে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, ও, বুঝলাম। বেশ দেখি তোমার হাত।

ধীরে ধীরে বরুণ তাহার দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া তাঁহার সুমুখে ধরিল।

তাহার করতলের রেখা বিচার করিতে করিতে ভবানী-প্রসাদের চোখ দুইটি ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কখনো-বা সেই মুখে মেঘম্লান অপরাহ্নের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

বরুণের হৃদয় আশা-আশঙ্কায় ব্যাকুলতায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। ওদিকে সহসা পুঁটুরাণীর ডান চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

ভবানীপ্রসাদ হাত সরাইয়া কহিলেন, উঁহু, এ বিবাহ তুমি কোরো না বাবা, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। অবশ্য এ বিবাহে পুঁটুরাণীর ভবিষ্যৎ খুব ভালো, কিন্তু তোমার পক্ষে ফল শুভ হবে না।

বিবর্ণমুখে বরুণ কহিল, কারণটা জানতে পারলে আর তার প্রতিকার করলেও কি—

বাধা দিয়া ভবানীপ্রসাদ কহিলেন, হ্যাঁ, প্রতিকার অবশ্য নেই, কিন্তু মুক্তি আছে। যদি পুঁটুরাণীর অদৃষ্টের জোরে তোমার সে অমঙ্গল কেটে যায়, তবে তোমাদের আর কোনও ভয় নেই। তোমরা সুখী হবে।

তারপর গম্ভীরকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, পুঁটুরাণী, এদিকে একবার শুনে যাও ত মা।

জানালার পাশেই তাহারা দাঁড়াইয়াছিল। কমলা ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহাকে বলিল, দেখবো তোর বরাতের জোর কেমন।

পুঁটুরাণী সলজ্জসঙ্কোচে নতমুখে কম্পিতবক্ষে ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

ভবানীপ্রসাদ সস্নেহে তাহাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, দেখি মা, দেখি তোমার হাতটা। না, না, লজ্জা কি?

পুঁটুরাণী তাহার বামহাতখানি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিল। ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন, তাহার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে তিনি তাহার রেখা বিচার করিলেন। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, যাও মা ঘরে যাও, এ বিয়ে তোমাদের হবে।

লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া হরিণীর মতো চঞ্চল লঘু পায়ে পুঁটুরাণী ছুটিয়া পলাইল।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, ওর হাতেও তোমার অমঙ্গলের কিছু ছায়া আছে, কিন্তু নিয়তি, দেখলাম তোমাদের বিবাহ হবেই, কেউ রোধ করতে পারে না। তবে কালরাত্রিতে একটু সাবধানে থাকবে, তোমার বিশেষ আশঙ্কার সময় সেই রাত্রে—তবে পুঁটুরাণীর হাতের যা লক্ষণ দেখলাম, আমার বিশ্বাস, তুমি সেই অমঙ্গল কাটিয়ে উঠতে পারবে।

কম্পিতবক্ষে বরুণ তাঁহাকে প্রণাম করিল।

ভবানীপ্রসাদ মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, ভয় কোরো না, তোমরা সুখী হবে।

অসীম রহস্যময় নির্জ্জন পল্লীকুটীরের সুমুখে দিগ্বলয়লীন শ্যামল প্রান্তরে মধ্যাহ্নরৌদ্র তখন প্রখর হইয়া উঠিতেছে। নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখার অন্তরাল হইতে দূরাগত মধুর মর্ম্মরধ্বনি, সুবর্ণরেখার ধীর জলকলস্বরে সুর মিলাইয়া উজান বাহিয়া চলিয়াছে—চাষী ও জেলের দল—তাহাদের সারিগানের অস্ফুট সুর-ঝঙ্কার, বিজনবাসিনী তন্বী কিশোরী পুঁটুরাণীর অনন্ত বিস্ময়ভরা কালো চোখের চকিত চাহনি, তুলসীমঞ্চের বেদী ঘেরিয়া অপূর্ব্ব শেফালি-সৌরভ—সমস্ত মিলিয়া বরুণকে যেন মদির চঞ্চলতায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মনে হইল যেন তাহার জীবনের একমাত্র সাধের বস্তু ছোট বাঁশের বাঁশিটি বাহির করিয়া সেই গভীর করুণ রাগিণীর রোমাঞ্চকর মূর্চ্ছনায় এই পরম প্রিয়, একান্ত আত্মীয় গ্রামশ্রীকে আপন করিয়া লয়। তাহার এই বাঁশির আকর্ষণে সুরমূর্চ্ছনাহত বিমুগ্ধ সর্পের মতো এই নিরুপমা গ্রামলক্ষ্মী ঘুমাইয়া পড়িবে। এই বাঁশির তীব্রমদির সুরে তাহার সেই প্রেম, সেই মধুর স্বপ্নকে মূর্ত্তিমতী করিয়া এই মুহূর্ত্তটিকে অমর করিয়া রাখিবে।

সে তাহার বাঁশি বাহির করিল।

এমন সময়ে কমলা আসিয়া কহিল, ও কি অতিথি-ঠাকুরের কি আনন্দে বাঁশি বাজাবার ইচ্ছে হলো নাকি? নিন, উঠুন আপনার আসন পাতা হয়েছে।

মৃদু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বরুণ কহিল, চলুন।

সৌভাগ্যক্রমে পরদিনই বিবাহের একটি ভালো দিন ছিল। শুভ গোধূলিলগ্নে বরুণেন্দ্রনাথের সহিত পুঁটুরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। ভবানীপ্রসাদই সম্প্রদান করিলেন।

পর দিন বরুণ পুঁটুরাণীকে লইয়া দেশে রওনা হইল।

বর-বধূ যাত্রা করিতেছে, সকলেই অশ্রুসজল চোখে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। আয়ুষ্মতী বধূদের ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনিতে সুবর্ণরেখা নদীতীরে অপরাহ্নের আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। সানাইয়ের একটানা করুণ ইমন্ রাগিণী শোনা যাইতেছে। সীমন্তে সিন্দুর, পরণে রক্তচেলী, নববধূবেশে পুঁটুরাণীকে মানাইয়াছে বড় চমৎকার। চন্দনের পত্রলেখায় তাহার শুভ্রসুন্দর কপালে, রক্তিম কপোলে, বাসর-স্বপ্নোজ্জ্বল দুইটি অঞ্জনলেখা-অঙ্কিত মদির চক্ষে একটি মধুর বিষাদ-শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাঝি তাহার শঙ্খধবল পাল তুলিয়া দিয়াছে উজানী বাতাসে। বরুণ ও পুঁটুরাণী ভবানীপ্রসাদ ও মহামায়াকে প্রণাম করিয়া সজলচক্ষে নৌকায় গিয়া বসিল। সকলে অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া বর-বধূকে বিদায় জানাইল। নৌকা চলিতে সুরু করিল।

দাঁড়ের শব্দে নৌকা আগাইয়া চলিতেছে, ওপারে ছায়াবৃত অস্পষ্ট সবুজ গ্রামরেখা, নদীর বাঁকে বাঁকে ভাঙা মন্দির, বট-অশথের ঝুরি নামিয়া পড়িয়াছে তীরের মুখে, একঝাঁক শঙ্খচিল উড়িয়া চলিয়াছে কাশবনের উপর দিয়া। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। দূরে কোথায় যেন তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বলিতেছে। এই স্বর্ণাভ গোধূলি আলোকে বরুণ হঠাৎ পুঁটুরাণীর ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি করিল।

মুগ্ধের মতো তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে দেখিয়া লজ্জারুণ আনন্দে পুঁটুরাণী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, যাও—

বরুণ তাহার খোঁপা খুলিয়া দিয়া একরাশ কালো চুল এলো করিয়া কহিল, যাও কি বলতে আছে, বলো, এসো।

চঞ্চলা বালিকার মতো মাথা নাড়িয়া পুঁটুরাণী বলিল, না, এসো না।

বরুণ তাহার কাছে আর একটু সরিয়া গিয়া বলিল, রাগ না কি?

পুঁটুরাণী উদাস চোখে তরঙ্গায়িত সুবর্ণরেখার নীল জলের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

বরুণ বলিল, কি, চুপ করে' রইলে যে!

মৃদু হাসিতেই পুঁটুরাণীর আকর্ণপ্রসারী কালো চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুক্তার মতো সুন্দর দাঁতগুলি দেখা গেল, পাতলা সেই ওষ্ঠাধরের এককোণে রক্তাভ কপোলে ছোট্ট একটি চমৎকার টোল পড়িল এবং সেই উচ্ছল তরল হাসির শব্দে কানের দুলের মাঝখানকার তারা দুইটি ঝিক্‌মিক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

আবিষ্টের মতো আবেগকম্পিত কণ্ঠে বরুণ বলিল, কি আশ্চর্য্য আমাদের বিয়ে—তোমাকে পাবার জন্যেই যেন ভগবান জোর ক'রে আমায় এখানে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক যেন স্বপ্নের মতো।···আজ থেকে তোমার নাম রাখলাম, বিজনবাসিনী।

পুঁটুরাণী কোনো কথা কহিল না। আনন্দে তাহার সর্ব্বশরীর তখন ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

শ্রাবণ-পূর্ণিমার দেরী নাই—মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ছায়াপথের তরল মদির রূপালি জ্যোৎস্না আকাশে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিয়াছে। নিশীথরাত্রির এই রমণীয় নিঃশব্দতার মধ্যে অবিশ্রাম জলকলস্বরের গান শুনিতেছে শুধু বরুণ আর পুঁটুরাণী।

ঘুমে পুঁটুরাণীর শরীর এলাইয়া পড়িয়াছে, চোখ দুইটি ঢুলিয়া আসিতেছে।

গভীর স্নেহে বরুণ কহিল, তোমার ঘুম পেয়েছে? ঘুমোও না। আমার চোখে ঘুম নেই। আমি বাঁশি বাজাই, তুমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ো।

বরুণ বাঁশি বাজাইতে সুরু করিল। বাঁশিতে সে কি অপূর্ব্ব সুরের ঝঙ্কার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। পুঁটুরাণী তাহার সমস্ত শ্রবণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সেই সুরের উচ্ছল মদির সুধারস পান করিতে লাগিল—মায়াবী বাঁশুরিয়ার বাঁশী ইমনে বাজিতেছে, শিরায় শিরায় উদ্দাম ফেনিল সুরের স্রোতস্বিনী তরল তীব্র বিদ্যুৎশিখার মতো তাহার মূর্চ্ছিত প্রাণ-তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হইয়া ফিরিতেছে। তীব্র আনন্দের আবেগে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সর্ব্বশরীর যেন পূবালি বাতাসে আন্দোলিত নতুন ধানের মঞ্জরীর মতো শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। নিস্তব্ধ নির্জ্জন এই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন এই অপার্থিব সুরের মোহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। মনে হইল, এই আশ্চর্য্য অনুভব বুঝি বাস্তবজগতের নয়, বোধ করি স্বপ্নে সে কোন্ ব্যাকুল হৃদয়ের অশান্ত বাসনা বাঁশির রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া করুণকণ্ঠে কি যেন প্রার্থনা করিতেছে।

তাহার মনে পড়িল, তাহার বাবা বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের বাড়ীতে একবার কীর্ত্তনের আসর বসিয়াছিল। কীর্ত্তনীয়ার সে কি মধুর বেশ, মাথায় শিখীচূড়া, হাতে চামর, পায়ে নূপুর, আর কি তাহার অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠস্বর—ললিতকোমল কণ্ঠে সে যখন আখর দিয়া কীর্ত্তনে তান ধরিত, চোখের জল কাহারও আর বারণ মানিত না।

একটি গান সে আজও ভুলিতে পারে না। শ্রীমতী রাধা শ্যামের কাছে কেমন করিয়া বাঁশরীতে তান তুলিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিবার জন্য মিনতি জানাইতেছেন। মুরলী বাজাইবার মন্ত্র তাহাকেও শিখিতে হইবে। এই বাঁশি শোনাতেই তাহার চরম বাঁশির সুর সাধা হউক, এই বাঁশিই তাহার প্রাণ হউক, এই বাঁশি বাজাইতে আজ সে শিখিবেই।

মনে মনে সে সেই গানের কলি আবৃত্তি করিতে লাগিল:

মুরলী করাও উপদেশ,
কোন্ রন্ধ্রে কি ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশি অতি অনুপম,
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম।
কোন্ রন্ধ্রে রসাল ফুটায়ে পারিজাত,
একে একে শিখাইয়া দাও প্রাণনাথ॥

দুই চোখের অবারিত অশ্রুধারায় কপোল তাহার ভাসিয়া গেছে, নিষ্পলক চোখে সে বরুণের মুখের দিকে চাহিয়া নিস্পন্দের মতো বসিয়া আছে। বাঁশির সুর ক্রমশ মৃদু হইয়া আসিতেছে। দুই তীরে কুয়াশাবৃত গ্রামরেখা স্বপ্নাচ্ছন্ন মায়াপুরীর মতো জাগিয়া আছে। পুঁটুরাণী এবার ঘুমাইবে।

ঘুমের ঘোরে বোধ করি সে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

রূপকথার রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া তেপান্তরের মাঠের উপর দিয়া পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া রাজকন্যার সন্ধানে আসিয়াছে স্বপ্নপুরীর দেশে। সেই ঘুমন্ত রাজপুরীতে তখন রাজকন্যা শিয়রে সোনার কাঠি রাখিয়া গভীর ঘুম ঘুমাইতেছে। বনস্পতির ছায়াঙ্কিত পল্লবের আড়াল দিয়া নিবুম জ্যোৎস্না যেন পথ ভুলিয়া তাহার স্ফুটকমলের মতো মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঘুমের ঘোরে সে শুনিতেছে ঝরণার গান, বনৌষধির উন্মাদক গন্ধে সে কস্তুরীমৃগের মতো চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বহু দূরে কোথায় বুঝি জিরিজিরি বেতসের বনে অবিশ্রাম কুহুস্বরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাঁশি বাজিতেছে। কে যেন রূপার কাঠি ছোঁয়াইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার শিয়রে বসিয়া অনিন্দ্যসুন্দর এক রূপকুমার রাজপুত্র—মাথায় তাহার শিরস্ত্রাণ-শোভিত কনক-মুকুট, হাতে ধনু, কাঁধে বর্শা, বুকে বর্ম্ম! চোখ মেলিয়া সে চাহিতেই চারি চক্ষে তাহারা হাসিয়া উঠিল। তারপর সহসা কোথা হইতে যেন একটি কুৎসিত ভীষণ-দর্শন দানবাকার মূর্ত্তি আসিয়া তাহাদের সম্মুখে খিলখিল করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। তারপর দুইজনে সে কি ঘোর যুদ্ধ! রাজকন্যার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।···

ঘুমের ঘোরে সহসা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়া পুঁটুরাণী চোখ মেলিল। দারুণ আতঙ্কে আপাদমস্তক তাহার তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেছে। দুঃস্বপ্নের সেই শ্বাসরোধকারী ভয়ে তাহার দুই চোখ যেন জ্বালা করিতেছে।

নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া মুখে-চোখে দিয়া সে কিছু শান্ত হইল। তারপর বরুণের দিকে তাকাইয়া দেখিল সে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে, প্রশান্ত হাসিতে জ্যোৎস্নাস্নাত সুন্দর মুখখানি তাহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। পুঁটুরাণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া পরম নির্ভরতার সহিত বরুণের একপাশে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ পরেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি বোধ করি শেষ প্রহর। তাহারা দুইজনেই গভীর ঘুমে ঘুমাইতেছে। নৌকা চলিতেছে ধীর মন্থরগতিতে। সহসা শ্রাবণরাত্রির অন্ধকার আকাশ পুঞ্জ পুঞ্জ নিবিড় কালো মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া দূর দিগ্বলয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। ঝিল্লীবিদার সূচীভেদ্য নিরন্ধ্র ঘন অন্ধকারে আসন্নবর্ষণ মেঘ থমথম করিতে লাগিল। গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চকিত বিদ্যুৎশিখা জ্বলিয়া

উঠিতে লাগিল। নদীর স্রোত প্রখর দুর্ব্বার হইয়া উঠিতেছে, সেই অসীম মসীবর্ণ অন্ধকারে অসহায় পাখীর মতো তাহাদের নৌকা দুলিতেছে। সহসা দুরন্ত বৃষ্টিধারা শাণিত করকার মতো উদ্দাম দ্রুতবেগে নামিয়া আসিল। ঝমঝম করিয়া অশান্ত ধারাপতনধ্বনি অপার অন্ধকার ভরিয়া বাজিতে লাগিল।

মাঝি চীৎকার করিয়া উঠিল, কত্তা উঠুন, উঠুন, দেখুন একবার কি মেঘ উঠেছে—

বরুণ আর পুঁটুরাণী হঠাৎ এই দুর্য্যোগের মধ্যে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে একেবারে হিম হইয়া গিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বরুণ বলিল, কাছে কোথাও গাঁ আছে মাঝি? কোনোরকমে পারে যাওয়া যাবে?

মাঝি বলিল, মেঘ দেখেই সেদিক পানে যাচ্ছি কত্তা, আর বেশি দূর নেই।

ভয়ে পুঁটুরাণীর মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেছে। বরুণ তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল, ভয় কি রাণী, পারে নেমে আমরা না হয় একটু ভিজলামই বা! আমার ত চমৎকার লাগছে, ঠিক যেন স্বপ্নের মতন। একঘেয়ে একটানা জীবনে আমাদেরই ত সত্যিকারের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হ'লো—সেই অদ্ভুত বিয়ে—আর তোমার জ্যাঠামশাই ভবানীপ্রসাদ থেকে সুরু ক'রে এই ঝড়জলের মাঝখানে নদীর ওপরে তুমি আর আমি!

স্বপ্নের কথা মনে পড়িতেই পুঁটুরাণী সভয়ে শিহরিয়া বরুণের বুকে মুখ লুকাইল। সমস্ত শরীর তখন তাহার বেতসলতার মতো কাঁপিতেছে।

বরুণ কহিল, এ কি কাঁপছো তুমি, শীতে না ভয়ে? আমি রয়েছি পাশে, ভয় কি তোমার?

অস্ফুটকণ্ঠে পুঁটুরাণী বলিল, না, ভয় না।

নৌকা তীরে ভিড়িয়াছে। তাহারা দুইজনে হ্যারিকেন হাতে করিয়া তীরে নামিয়া কাছেই বিরাট বনস্পতির নীচে ঘন লতাগুল্মে ঘেরা একটি পাথরের উপরে গিয়া বসিল। পল্লবের ফাঁক দিয়া ঝিরঝির করিয়া বৃষ্টির ছাট আসিয়া তাহাদের মুখে লাগিতেছে—নিবিড়, নির্জ্জন সেই বনৌষধির গন্ধে ব্যাকুল অন্ধকার বনভূমি, শ্রাবণ-রাত্রির অবিশ্রাম রিমঝিম বর্ষণ-মুখরতার মধ্যে তাহাদের স্তম্ভিত, মৌনী হৃদয় স্পন্দমান হইয়া উঠিয়াছে।

অভিভূত আচ্ছন্নের মতো বহুক্ষণ তাহারা সেই অপার নীরবতায় নিমগ্ন হইয়া রহিল। সহসা অস্ফুট একটি চীৎকার করিয়া বরুণ সেই পাথরের উপর বিবর্ণ হইয়া শুইয়া পড়িয়া দুঃসহ যন্ত্রণাময় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, রাণী আমাকে কিসে যেন কাটলো—তোমার জ্যাঠামশায়ের কথাই ঠিক হ'লো, আজ কালরাত্রি, কালসাপেই বুঝি কাটলো আমাকে—তোমার কি হবে?

এই আকস্মিক আঘাতে পুঁটুরাণী যেন বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হইয়া গেল। দারুণ প্রাণ-পিপাসায় দুই চোখ যেন তাহার জ্বলিতে লাগিল। না, এ নিয়তি সে ব্যর্থ করিবে। স্বপ্নের ভয়কে সে আর ভয় করিবে না। তাহার সর্ব্বশরীরে কোথা হইতে যেন অসীম বেদনাময় সাহসিকতা, আশ্বাসভরা তেজ জাগিয়া উঠিল। মৃত্যুমুখীর তৃণ অবলম্বনের মতো সেই বিজয়িনীর দুর্ব্বার প্রাণ-বন্যা তীব্র উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিল। বাঁশি বাজাইতে সে শিখিয়াছে, সে ধ্যান করিয়াছে তাহার এই প্রাণ-স্পন্দী বাঁশিতে বিশ্বপ্রকৃতি মোহাচ্ছন্ন করিবার সাধনা, আজ তাহার চরম পরীক্ষার দিন। সে শুনিয়াছিল, এই বাঁশীর মোহনিয়া সুরের মূর্চ্ছনায় সাপুড়িয়া শিবকন্যা দেবী মনসাকে প্রসন্ন করিতে পারে।

মাঝি কোথা হইতে কয়েকটি লতা সংগ্রহ করিয়া বরুণের পায়ে বাঁধিয়া দিল।

আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজিয়া মনে মনে নীলকণ্ঠ মহেশ্বর এবং আস্তিকজননী বিষহরী দেবীকে স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে বাঁশিতে তান ধরিল পুঁটুরাণী। সে বাঁশির সুরে বর্ষণ-ক্লান্ত প্রকৃতি যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল, খণ্ড মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠিয়া পল্লবান্তরাল দিয়া মুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল, দূরে নীল নদীজলধারা কুলুকুলু শব্দে সুর মিলাইতে সুরু করিল। সে কি করুণ প্রাণ-স্পন্দন, বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই মদির মোহ-সঞ্চারিণী তীব্র মধুর আনন্দ-বেদনা লীলায়িত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

সহসা এক অভাবনীয় দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে

ভাসিয়া উঠিতেই আনন্দে তাহার বাঁশি, তীক্ষ্ণ ঝঙ্কারে উচ্চকিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, অপরূপ ভীষণ-সুন্দর এক কালসর্প গভীর আনন্দে তাহার বিশাল ফণা উন্নত করিয়া ধীরে ধীরে আবেশমুদিত মদিরচক্ষে দুলিতেছে। জ্যোৎস্নার রূপালি আলোর রেখা তাহার মাথার মণিতে পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। প্রদীপ্ত সেই নীলকান্ত মণির চারিপাশে বোধ করি ব্রজপুরীর চিরকিশোর মুরলীধর কৃষ্ণের কোমল চরণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন! সে-রূপ দেখিয়া পুঁটুরাণী রোমাঞ্চিত আনন্দে আরো জোরে বাঁশি বাজাইতে লাগিল। মুখে তাহার করুণ মধুর হাসি, বাঁশির সুরের নেশায় সে যেন উন্মাদ হইয়া গেছে।

অপার্থিব দুর্লভ সেই সুরের ঝঙ্কারে সেই কালসর্প ক্রমশ নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—বোধ করি এই অধীর বংশীরবের কারণ সে এইবার বুঝিল। এই অসহ আনন্দের বিনিময়ে প্রতিদান যে কিছু দিবে। ধীরে ধীরে সে তাহার মুখ লইয়া গেল বরুণের নীল বিবর্ণ বিশাল দেহের কাছে। পায়ের কাছে ক্ষতস্থানে মুখ লাগাইয়া সে বিষ তুলিতে লাগিল। বাঁশি শুনিতেছে, আর দুই চোখ বাহিয়া তাহারও জলধারা নামিয়া আসিতেছে। বহু ক্ষণ পরে সে তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া মূর্চ্ছিতের মতো শুইয়া পড়িল। মাঝিটি একটি ঝাঁপি রাখিয়াছিল তাহার পাশেই। পুঁটুরাণী তখনও বাঁশি বাজাইতেছে। শিথিল গতিতে সেই সাপ ঝাঁপির কাছে আগাইয়া যাইতেছে। বাঁশির সুর ক্রমশ মৃদু হইয়া আসিতেছে। মাঝিটি ঝাঁপির মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

ধীরে ধীরে সেই মাঝির সাহায্যে পুঁটুরাণী বরুণকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া গেল। তাহার পর সে সাপের ঝাঁপিটি ধরিয়া মাথায় ঠেকাইয়া নৌকার পাটাতনের নীচে রাখিয়া দিল।

তখন বর্ষণ থামিয়া গেছে। পূর্ব্ব দিগন্ত রঞ্জিত করিয়া সদ্যোজাত সূর্য্যের রক্তিম অরুণজ্যোতি জাগিয়া উঠিতেছে। কালরাত্রি মিলাইয়া গেছে অতীতের অন্ধকারে।

ঝিরঝির করিয়া শরৎকালের ভোরের মৃদুমধুর বাতাস বহিতেছিল। ধীরে-ধীরে চোখ মেলিয়া বরুণ দেখিল, তাহার সুমুখে নির্নিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আরক্তিম প্রফুল্লসুন্দর মুখখানি আনত করিয়া পুঁটুরাণী চাহিয়া আছে। বরুণের দুই চোখে আনন্দের অশ্রু জমিয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া সে কহিল, তোমার জ্যাঠামশাই কিন্তু এসনিই আভাস দিয়েছিলেন; শেষে কিন্তু বলেছিলেন, তোমরা সুখী হবে।

বিনম্র প্রেমে ও মধুর মমতায় ভরা মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া পুঁটুরাণী বলিল, কিন্তু তোমার কাছে বাঁশি শিখেছিলাম বলেই ত?···বাড়ী আর কতদূর?

দূরের অস্পষ্টপ্রায় ত্রিশূল-চিহ্নিত অরুণ-কিরণোজ্জ্বল শিবমন্দিরের স্বর্ণচূড়ার দিকে তর্জ্জনী সঙ্কেত করিয়া বরুণ বলিল, ওই যে, ওই মন্দির। আমরা এসে পড়েছি।

কবিতা

শ্রীমতী গীতা দেবী আচার্য্য চৌধুরী

কবি তব ব্যথার বাণী—
আমার সুরে গাঁথা,
সিক্ত তব অশ্রুনীরে
আসনখানি পাতা।
কোন্ বনানীর অন্তরালে
কোন্ সাগরের তীরে,
ছবি তব আঁকছে কেবা
সংগোপনে ধীরে!

ভাঙ্গা বীণার ছিন্ন তারে
তোমার বাণী সাধা,
স্তব্ধ প্রাণের গোপন সুরে,
কণ্ঠ আমার বাঁধা।
যেথায় অসীম আকাশ পথে
শ্যামল মেঘের খেলা,
সেথায় তব করুণ বাণীর
নিত্য রূপের মেলা।

প্রাচীন ভারত

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল, পি এইচ্-ডি

সামাজিক অবস্থা

এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম বিষয়ে ভারত প্রাচীনকালে কতদূর উন্নত ছিল তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতে চারি প্রকার বর্ণ ছিল, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বৌদ্ধ সাহিত্যে ক্ষত্রিয়ের স্থান সর্ব্বপ্রথম। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধ সাহিত্যে আরও দুইটী জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—চণ্ডাল ও পুক্কুস। কতকগুলি বৌদ্ধসূত্র হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিত। বৌদ্ধদিগের মতে এই শ্রেণী-বিভাগ ন্যায়সঙ্গত। ধর্ম্মই শ্রেণী-বিভাগের একমাত্র ভিত্তি। ধর্ম্মগুণে ক্ষত্রিয়রাই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য বৌদ্ধগ্রন্থে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ভারতের জাতি সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে কেবল বৌদ্ধ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।[১] বুদ্ধ ও অম্বষ্ঠ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে বর্ণ সম্বন্ধে তর্ক হইয়াছিল এবং এই তর্কে অম্বষ্ঠ পরাজিত হয়।

বৌদ্ধজাতক হইতে জানা যায় যে প্রাচীন ভারতে জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহের প্রচলন ছিল। বারাণসীর জনৈক রাজা একজন অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চ বর্ণের লোকেরা নীচ বর্ণের লোকের সহিত আহার করিত না।

সেকালে জাতিধর্ম্ম অনুসারে বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত; তাহাতে তাহার মর্য্যাদার হানি হইত না। একজন ব্রাহ্মণ সামান্য ধনুর্ব্বিদ্যার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কোন একজন ব্রাহ্মণ সূত্রধরের কার্য্য করিত এবং অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আনিয়া যান নির্ম্মাণ করিয়া জীবন ধারণ করিত।

বৌদ্ধসূত্রে পেশার একটী বিশদ তালিকা পাওয়া যায়: —হস্তরেখার বিচার, শুভাশুভ লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলা, শরীরের চিহ্ন দেখিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করা, অঙ্গুলীর দ্বারা গণনা, ভাগ্য গণনা করা, গুপ্তবিদ্যা, অস্ত্রোপচার বিদ্যা, বৈরীভাব নিষ্পত্তি করা, গজারোহী, অশ্বারোহী, রথচালক, ধনুর্দ্ধর, ক্রীতদাস, পাচক, নাপিত, মোদক, মালাকার, রজক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, মালী, মূল্যনিরূপক, সূত্রধর, ধীবর, কৃষক, গায়ক, নাবিক, কর্ম্মকার, ওস্তাগর, ভেরিবাদক ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতে বহু সমিতি ছিল। যাহারা একই ব্যবসা অবলম্বন করিত তাহারা একত্র বাস করিত এবং যে স্থানে তাহারা বাস করিত সে স্থানের নামকরণ বৃত্তি অনুসারেই হইত, যথা—কর্ম্মকারদের গ্রাম, শিকারীদের গ্রাম, ব্রাহ্মণ গ্রাম ইত্যাদি। এই সকল সমিতি হইতে প্রাচীন ভারতের সমবায় জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক জীবন সংক্রান্ত কতকগুলি অনুষ্ঠান ছিল। শিশুদের নামকরণ প্রথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা নামকরণ পালি ভাষায় নামগহন বলিয়া পরিজ্ঞাত। গর্ভরক্ষার জন্য একটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল। বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া যখন কথাবার্ত্তা চলিত, তখন জন্ম অথবা বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইত। সাধুশীল জাতকে বহু-বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। নারীদের একের অধিক বিবাহ করিবার অধিকার ছিল। সহোদরসহোদরা ভাইভগিনী ভিন্ন অন্যান্য ভাইভগিনীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। অম্বষ্ঠ জাতক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিল। অবশ্য ইহা একটী স্বতন্ত্র ঘটনা; ইহাকে প্রাচীন ভারতের প্রচলিত প্রথা বলিয়া ধরা উচিত নহে। সেকালে স্বয়ম্বর প্রথাও চলিত ছিল। একজন কুমারীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত এবং উহাদের মধ্য হইতে উক্ত কুমারী আপন স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া লইত। এই প্রথা কেবল রাজবংশের মধ্যেই চলিত ছিল তাহা নহে, অন্যান্য জাতির মধ্যেও ইহার প্রচলন ছিল। একজন ধনী তাহার কন্যাকে আপনার মনের মত স্বামী নির্ব্বাচন করিতে বলিয়াছিল।[২]

প্রাচীন ভারতেও অবরোধপ্রথা বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্মপদট্ঠ কথার একটী অংশ পাঠে জানা যায় যে, এদেশে মুসলমানদের আগমনের বহু পূর্ব্বে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে অম্বট্ঠ সূত্র হইতে বিভিন্ন শিক্ষা-শাখার একটী তালিকা পাওয়া যায়। সেকালে ব্রাহ্মণ যুবকেরা গুরুগৃহে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষার বিষয় ছিল তিনটী: বেদ, ক্রিয়াপদ্ধতি, স্বরবিজ্ঞান, ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষ্য, পুরাবৃত্ত, বাক্‌পদ্ধতি এবং ব্যাকরণ। সে সময়ে তক্ষশিলায় একটী সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য বহু যুবক বহুদেশ হইতে তথায় আসিত। তখনকার নিয়মানুসারে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে বেতন দিয়া পাঠ করিত অথবা শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকের পরিচর্য্যা করিত। বারাণসীতেও একটী শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। বারাণসীর লোকেরা দরিদ্র বালকদিগকে প্রত্যহ খাদ্যদান করিয়া তাহাদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিত। সেকালের রাজারা পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহু দূরদেশে পাঠাইতেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে তাহারা জগতের রীতি নীতির সহিত পরিচিত হইতে পারিত।

সেকালে কিরূপ ভাবে শবদাহ করা হইত তাহার একটী বিবরণ পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের মৃতদেহ একটী সাধারণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইত। ঐ স্থানকে সিবথিকা অথবা আমকসুসান বলা হইত। উক্ত মৃতদেহ বন্য জন্তুরা ভক্ষণ করিত। উচ্চপদস্থ লোকের মৃতদেহ (যথা—সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক অথবা রাজন্যবর্গের মৃতদেহ) দাহ করা হইত এবং ভস্মের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মৃতদেহ-দাহের উল্লেখ আছে। নূতন বস্ত্রের দ্বারা মৃতদেহটী আবৃত করিয়া উহা একটী লৌহ পাত্রে রাখিয়া দাহ্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্তূপে শবদেহ রাখা হইত এবং কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করা হইত।

আর্থিক অবস্থা

অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। শিল্পকারগণ সমস্ত লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত এবং ব্যবসায়ীরা স্বদেশে ও বিদেশে ব্যবসা করিত।

সেকালে স্থলপথ ও জলপথ ব্যবসায়ী উভয়ই ছিল। স্থলপথ ব্যবসায়ীরা পাঁচ শত গোযানে মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে বিক্রয় করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইত। বহু বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের পথ ছিল। ঐ সকল স্থানে দস্যু, দানব, সিংহ এবং অন্যান্য বন্য জন্তুর বিশেষ ভয় ছিল। তথায় জলাশয়, ফলমূল অথবা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিরল। ষাট যোজনব্যাপি জলশূন্য মরুভূমির মধ্য দিয়াও ঐ পথ বিস্তৃত ছিল। বণিকগণ মরুভূমির মধ্য দিয়া রাত্রিকালে ভ্রমণ করিত। মরুভূমির কাণ্ডারীরা নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া দিক্‌নির্ণয় করিত। রাত্রি প্রভাত হইলে বণিকগণ পথে বাহির হইত না। তাহারা যানগুলিকে বৃত্তাকারে সাজাইয়া শিবিরের মত করিত এবং তাহার উপরে একটী চন্দ্রাতপ খাটাইয়া সমস্ত দিন তথায় বিশ্রাম করিত। সুপ্পারক (সোপারা) হইতে শ্রাবস্তী (সহেৎ মহেৎ) পর্য্যন্ত একটী বাণিজ্যপথ ছিল। উহাদের মধ্যে দূরত্ব প্রায় একশত বিশ যোজন ছিল।

প্রাচীন ভারতে সমুদ্রপথের ব্যবসায়ীও ছিল। বণিকগণ ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ব্যাবিলনের বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বারাণসী হইতে বাবেরু প্রদেশে লইয়া আসিত। সমুদ্রপথে দিক্‌নির্ণয় করিবার জন্য বণিকেরা জাহাজে কাক লইয়া যাইত। নাবিকেরা যখন মধ্যসমুদ্রে দিশাহারা হইয়া দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারিত, তখন তাহারা একটী কাককে উড়াইয়া দিত এবং উহাকে জাহাজে আর বসিতে দিত না।

১। এই সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে মৎপ্রণীত "Concepts of Buddhism," তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

১। এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ মৎপ্রণীত "বৌদ্ধ রমণী" শীর্ষক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং ঐ কাক অবতরণস্থান খুঁজিবার জন্য উড়িতে থাকিত এবং যদি উহা উড়িতে উড়িতে কোন স্থলে পৌঁছিতে পারিত, তাহা হইলে আর ফিরিয়া আসিত না। যদি সেরূপ অবতরণস্থান খুঁজিয়া না পাইত, তাহা হইলে আবার জাহাজে ফিরিয়া আসিত। এইরূপে নাবিকগণ দিক্‌নির্ণয় করিত এবং নিকটে কোন নঙ্গরস্থান আছে কি-না তাহা বুঝিতে পারিত। ভরুকচ্ছ (বর্ত্তমান ব্রোচ) এবং সুবর্ণ ভূমির (ব্রহ্মদেশ) মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। ভরুকচ্ছ সেকালকার একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। ভরুকচ্ছ হইতে সুবর্ণ ভূমি পর্য্যন্ত জলপথে বাণিজ্য চলিত। বণিকগণ চম্পা (অঙ্গদেশের রাজধানী) হইতে সুবর্ণ ভূমি পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। সমুদ্রপথে ব্যবসায়ীরা বঙ্গ, তক্কোল, চীন, সৌবীর, সুরাষ্ট্র, আলেক্‌জান্দ্রিয়া, চোলপট্টন এবং ব্রহ্মদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য যাইত।

প্রাচীন ভারতে ব্যাঙ্কের সুবিধা মোটেই ছিল না। লোকে মাটীর নীচে তাহাদের সঞ্চিত ধন পুঁতিয়া রাখিত এবং কখনও কখনও বিশ্বস্ত বন্ধুদের নিকট গচ্ছিত রাখিত। রাজা বলপূর্ব্বক ধন কাড়িয়া লয় অথবা চোরে চুরি করিয়া লয়, এই সকল আশঙ্কা করিয়া ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অথবা ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু সঞ্চয় রাখিবার জন্য উহারা মাটীর নীচে ধন লুকাইয়া রাখিত।

সেকালে বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। আমরা কতকগুলি মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাই, যথা,—কাকনিক, মাসক, অর্দ্ধমাসক, পদ, অর্দ্ধপদ, কহাপণ এবং অর্দ্ধকহাপণ। এইগুলি ছিল তাম্রমুদ্রা। রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন ছিল কি-না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মুদ্রা ব্যতীত অঙ্গীকার বা আদেশপত্রেরও প্রচলন ছিল। বড় বড় শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা পরস্পরের মধ্যে (মুদ্রাপ্রাপ্তির জন্য) আদেশপত্র ব্যবহার করিত। মধ্যে মধ্যে অঙ্গীকার-পত্রও ব্যবহার করিত।

সেকালের ধর্ম্মের অবস্থা

পণ্ডিতগণ বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভের পূর্ব্বে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই সময়ের সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অথবা বৈদিক ধর্ম্ম একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল।

অধিকাংশ লোকই যাদুমন্ত্র ও ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করিত। প্রেতেরা বৃক্ষে বাস করিত এবং লোকেরা বৃক্ষ-দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিত। পুষ্করিণী এবং হ্রদেও প্রেত ও যক্ষ বাস করিত।[১]

সাধারণতঃ এই কয়টী বিষয়ে লোকের গভীর বিশ্বাস ছিল :—হস্তরেখা দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলা, চিহ্ন দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলা, বজ্র এবং অন্যান্য নৈসর্গিক লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ, স্বপ্নব্যাখ্যা করিয়া ভবিষ্যৎ বলা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিবার জন্য জানু হইতে রক্ত বাহির করা, পিশাচ-বশীকরণমন্ত্র, ভূত-ঝাড়ানর সর্প-বশীকরণমন্ত্র, শান্তিলাভের আশায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে দান, চামচ হইতে লইয়া হোম দেওয়া এবং মুখ হইতে সরিষা বাহির করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ইত্যাদি। প্রাচীন কালে মৃত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে খাদ্যদান ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

সেকালে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের উল্লেখ পাওয়া যায়:—(১) অহেতুবাদ, (২) ঈশ্বরকারণবাদ, (৩) পূর্ব্বকর্ম্মবাদ, (৪) উচ্ছেদবাদ এবং (৫) ক্ষত্রিয়বীর্য্যবাদ।

যিনি হেতুবাদের বিরুদ্ধবাদী, তাঁহার মতে এই জগতের প্রাণীরা পুনর্জন্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্ববিষয়ের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার মতে এই জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। যিনি পূর্ব্বকর্ম্মবাদের সমর্থক, তাঁহার মতে সুখ অথবা দুঃখ মানুষের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল। যিনি উচ্ছেদবাদ বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার মতে এই জগৎ হইতে কেহ তিরোহিত হয় না; এই জগৎই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যিনি ক্ষত্রিয়বীর্য্যবাদী, তাঁহার মতে পিতৃমাতৃ হত্যা করিয়াও স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বুদ্ধের সমসাময়িক ছয় জন বিরুদ্ধমতবাদী ধর্ম্মপ্রচারকের উল্লেখ আছে :—

(১) পুরণ কস্‌সপ—ইনি অক্রিয়াবাদের সমর্থক। সৎকর্ম্মের ফলে পুণ্য হয় এবং অসৎ কর্ম্মের ফলে পাপ হয়, ইহা ইনি বিশ্বাস করিতেন না।

(২) মক্‌খলি গোসাল—ইনি বলিতেন, জন্মান্তর

১ মৎপ্রণীত "The Buddhist Conception of Spirits" (revised edition) দ্রষ্টব্য।

পরিগ্রহের দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয়। কর্ম্ম ও উহার ফল ইনি বিশ্বাস করিতেন না। ইঁহার মতে জ্ঞানী, মূর্খ সকলেই পুনর্জন্মের মধ্য দিয়া দুঃখ কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

(৩) অজিত কেস কম্বলী—ইনি উচ্ছেদবাদের সমর্থক। কর্ম্মের প্রভাব ইনি বিশ্বাস করিতেন না। ইঁহার মতে জ্ঞানী, মূর্খ, সকলেই দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না।

(৪) পকুধ কচ্চায়ন—ইনি শাশ্বতবাদী। ইঁহার মতে চারিটী উপাদান, স্বচ্ছন্দতা, কষ্ট এবং আত্মা স্বয়ংভূ বলিয়া পরিগণিত।

(৫) সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত—ইনিই প্রথমে জীবন ও বস্তু সম্বন্ধীয় প্রচলিত নিয়মের প্রতি নিরপেক্ষ ভাব ধারণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, জীবন ও বস্তুনিচয়ের সত্যতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অমূলক হইতে পারে না। ইনিই প্রথমে মানুষের চিত্তকে আসার মতবাদের দিক্ হইতে ফিরাইয়া আনেন।

(৬) নিগণ্ঠনাতপুত্ত—নিগণ্ঠ শব্দের অর্থ—যিনি জীবনের সমস্ত কণ্টককে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিগণ্ঠনাতপুত্তের মতে চারি প্রকার অসংযমের দ্বারা নিগণ্ঠেরা সংযত। জল, অশুভ, প্রভৃতি বিষয়ে ইহারা সংযত হইয়া বাস করে। চারি প্রকার অসংযমের দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া নিগণ্ঠকে গতত্তো, যতত্তো এবং ঠিতত্তো বলা হয়।

বিশাল পালি সাহিত্যের অন্তর্গত ব্রহ্মজাল সূত্রে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবাদের তালিকা পাওয়া যায় :—

(১) সস্‌সতবাদ (শাশ্বতবাদ)—যাঁহারা এই মতের পোষক, তাঁহারা বলেন আত্মা এবং জগৎ অবিনশ্বর। (২) একচ্চ-সস্‌সতিকা একচ্চ অসস্‌সতিকা (অর্দ্ধশাশ্বত-বাদ)—যাঁহারা এই মতের সমর্থক তাঁহারা বলেন, আত্মা এবং জগৎ অবিনশ্বর ও বিনশ্বর, (৩) অন্তানন্তিকা (অন্ত ও অনন্তবাদ)—এই মতের সমর্থকগণ বলেন, এই জগৎ সান্ত অথবা অনন্ত, (৪) অমরা বিক্‌খেপিকা—যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহাদিগকে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে দ্ব্যর্থবোধক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। (৫) অধিচ্চ সমুপ্পনিকা—যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন, আত্মা ও জগৎ কারণপ্রসূত নহে। এইগুলি অতীত সম্বন্ধে মতবাদ।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় মতবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

(১) প্রথম মতের সমর্থকগণ বলেন, মৃত্যুর পরও আত্মা সচেতন থাকে, (২) দ্বিতীয় মতের সমর্থকগণ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মার চেতনা থাকে না, (৩) তৃতীয় মতের পোষকগণ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা সচেতন অথবা অচেতন কিছুই থাকে না, (৪) চতুর্থমতবাদীরা বলেন, সমস্ত প্রাণীই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, এবং (৫) পঞ্চম মত পোষকের মতে এই প্রত্যক্ষ জগতেই সমস্ত প্রাণী নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে।

নাগরিকা

শ্রীচরণ দাসঘোষ

সাত

এক অক্লেদ অভিজাত-গৌরবে বাড়িয়া কঙ্কণ বড় হইয়াছে। তদুপরি আশেপাশে তার ঐশ্বর্য্যের দেউল। পিঠের উপর চাবুকের বালাই ছিলনা—সংসারে সে একা, আর তার বেতনভুক্ লোকজন।

হোক্ তা। তবু তার চরিত্রে ছিল এক সবিস্ময় স্বাতন্ত্র্য। আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের ভিতর যাঁহাদের বসবাস, লোকালয়ে চলিবার পথ তাঁহাদের স্বতন্ত্র—তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রথা ও প্রণালী পৃথক। কঙ্কণের পদক্ষেপ কিন্তু সে-দিকে বড় একটা পড়িতনা, বেশী করিয়া সে মিশিয়া থাকিত দরিদ্রের ভীড়ে—সাধারণের দলে। অধিকন্তু নিজেকেই চিনিত সে নিজে বেশী করিয়া, আত্মপরিচয়ের অনুগ্রহ অপরের কাছে সে গ্রহণ করিতনা। তাহার একরোখা জীবন এমনিই এক ছন্দের মুখে অকস্মাৎ আসিয়া ঠেকিয়াছিল—চিত্রা। ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্য-গৌরবে সেও কঙ্কণের অপেক্ষা খাটো নয়। অতঃপর কাণা-খোঁড়া যেমন খালবিল পার হইতে গিয়া রাস্তার পথিককে একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করে, তেম্‌নিই একদিন কঙ্কণ টের পাইল—তাহার চলাফেরা, গতিবিধির সমস্ত নির্দ্দেশ ও শাসন এই মেয়েটিরই হাতে। চিত্রাও ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছিল যে, এই মানুষটির নিশ্বাস-প্রশ্বাস সে-ই। সুতরাং, সেই কঙ্কণ দশের সম্মুখে চিত্রাকে ঝট্‌কা মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়া বুঝিবা অধিকতর এক আকর্ষণের দিকে ছুটিয়াছিল, তাহা তার নারীগর্ব্বে সহিবে কেন? কিন্তু, সে কথা এখন থাক্।

কঙ্কণ কোথাও দাঁড়ায় নাই। সটান গৃহে ফিরিয়া স্বীয় শয়ন কক্ষে অঞ্জনকে আনিয়া নামাইল। তখন তার নিজেরও পোষাক-পরিচ্ছদ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে—রক্ত আর রক্ত! কিন্তু, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই, আহতের সময়োচিত সেবা-শুশ্রূষায় সে আত্মনিয়োগ করিল। ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল, কিন্তু, তাহাদের উপর পড়িল মনিবের নিষেধ। বুঝিবা, তাহার অর্থ ইহাই যে, ও-দেহের বর্ত্তমান মালিক সে নিজেই—আর কেহই নয়। আনাড়ি হাত—তথাপি সেবায় খোঁচ নাই, কৌশলে ভ্রান্তি নাই।

এইভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই, এক সময়ে অঞ্জনের চেতনা হইল, চোখ মেলিয়া তাকাইল। মুখের কাছেই বসিয়াছিল কঙ্কণ; তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অঞ্জন তাড়াতাড়ি হাতে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। কঙ্কণ হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে কহিল—"আর একটু!"

কিন্তু অঞ্জনের দৃষ্টি নামিলনা। বিহ্বল নেত্রে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি?" বলিয়া কক্ষের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিয়াই উঠিয়া বসিয়া আকস্মিক উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "তুমি দেবদূত।"

"কঙ্কণ হাসিয়া জবাব দিল, "আপাততঃ আমি কঙ্কণ!"

কঙ্কণ?—আর এক অপরিমিত উচ্ছ্বাস! অঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর দেহের সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চেতনা যেন নিঙড়াইয়া চোখ দিয়া বাহির করিয়া সম্মুখের ওই লোকটির দিকে তন্ময় হইয়া তাকাইয়া রহিল, যেন প্রয়োজনের অতিরিক্তই সে সুস্থ। এক দুর্লভ তৃপ্তির আবেগে বলিয়া উঠিল, "তুমিই কঙ্কণ?"

"এইবার কঙ্কণ যেন এলোমেলো হইয়া পড়িল। বিস্ময়ের প্রশ্ন করিল, "আমাকে চেন?"

"আমি?—না! তুমিই চিনিয়ে দিয়েছ! সেবা নেবার দুর্ভোগ ভিক্ষুর ধাতে সয়না! কিন্তু, তুমি নিয়েছ আমার জাত!" বলিয়াই অঞ্জন একমুখে হাসিয়া উঠিল। তার পর আবার সেই চাহনি—সেই স্থির, পলকহীন নেত্রপাত। তার পর গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওই চোখ, ওই মুখ—কঙ্কণ! বলিয়াই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, যেন কি-এক কঠিন চিন্তায় হঠাৎ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। একটু পরে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বিদ্রোহী?"

"বিস্ময়ে কঙ্কণের চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিতেই অঞ্জন কথাটার অর্থ করিয়া দিল, "দেশের! সকলে মিলে যা

চায়, দেশের কল্যাণ ত তাই। আজ তুমি কিন্তু তার গলা টিপে ধরেছ!"

"বুঝ্‌লাম না!"

"ছাদে এসো—" বলিয়াই অঞ্জন বাহির হইয়া কক্ষ সংলগ্ন একটি ছাদের উপর গেল, কঙ্কণও তদনুসরণ করিল। তার পর অঞ্জন একটি দেব-মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "বল্‌তে পার, ও কি?"

"মন্দির!"

"তা জানি, কিন্তু কাদের?"

"আমাদের!"

তারপর দৃষ্টির সীমানায় অবস্থিত আরও কয়েকটি মন্দির দেখাইয়া অঞ্জন যেন এক কঠিন প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা করিয়া বলিয়া উঠিল, "মন্দির, ধর্ম্ম—এই সবের কল্যাণে ছিল আমার বলির প্রয়োজন!"

"কেন?"

"আমি নাকি শত্রু!"

"শত্রু?"—কঙ্কণ হাসিয়া উঠিল। অতঃপর হাসিমুখেই জবাব দিল, "তাই বুঝি পড়ে-পড়ে মার খেলে। বলি, যে শত্রু হয়, সে ত বেশী করেই পাল্টা হাত তোলে।"

"আমার ধর্ম্মের নিষেধ!"

"তোমার ভেতর তোমার নিজের নিষেধ নয়?"

"আমি বলে আমাদের কিছুই নেই—দেহও নয়, জীবনও নয়!"

কঙ্কণ চমকিয়া উঠিল। যেন মাটির উপর, তার চোখের সুমুখে, এক বজ্র পড়িয়া সহসা বাঁশির আওয়াজ ধরিয়াছে!

মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু! তোমার বাড়ী-ঘর আছে?"

"রাখতে নেই!"

"আত্মীয়-স্বজন?"

"তোম্‌রা!"

কঙ্কণের মুখখানা আবার ঝুলিয়া পড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কি এক সুস্থির চিন্তায় তন্ময় হইয়া গেল। তারপর এক সময়ে আচম্‌কায় মুখ তুলিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "নারী—?"

"মা!"

এইবার কঙ্কণের দুটি চোখই বড় হইয়া উঠিল। তারপর সে কি প্রশ্ন করিতে যাইবে, পারিল না—যেন আর প্রয়োজন হয় না, যেন বা ওই পরমাশ্চর্য্য আত্মীয়ের নির্ব্বাক্ মুখ মুহুর্মুহুঃ তাহার সারা প্রশ্নেরই মীমাংসা করিয়া দিতেছে!

এম্‌নি ভাবেই কঙ্কণ তাকাইয়া আছে, এমন সময় অঞ্জন আস্তে-আস্তে বলিয়া দিল, "আজ তোমার নব-জীবন!"

আকাশে মেঘ নাই, নীল রঙ্—তাহারই গায়ে অকস্মাৎ খেলিয়া গেল যেন এক বিদ্যুৎ চমক! অবশ কণ্ঠে কঙ্কণ কহিল, "আর একটু বুঝিয়ে বল না?"

"শাক্যঠাকুর, রাজার ছেলে, গৃহত্যাগী—তাঁরই পাশে আজ থেকে তুমি ভিক্ষু!"

"ভিক্ষু?"—এক ঝলক হর্ষ, এক ঝলক বিস্ময় কঙ্কণের কণ্ঠ দিয়া উপ্‌ছিয়া পড়িল।

অঞ্জনের সারা মুখ তখন এক অলৌকিক আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কহিল, "অসমাপ্ত মানুষ—তুমি নও!"

কঙ্কণ স্থিরনেত্র হইয়া অঞ্জনের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর যতদূর দৃষ্টি চলে নিজের দেহের উপর দৃষ্টি নামাইয়া সহসা আত্মহারা হইয়া উঠিল। মুখ দিয়া প্রবল এক উচ্ছ্বাস যেন তরল হইয়া নির্গত হইল, "আমিও—"

"ভিক্ষু!"—অঞ্জন এক কটাক্ষ করিল। তারপর হাতছানি দিয়া সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। কঙ্কণও মন্ত্রচালিতের ন্যায় তদনুসরণ করিল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—তাহার ঐহিক জীবন-যাত্রার পরিপূর্ণ এক সংস্থান!

—আট—

শাক্যসিংহের চক্ষে নাকি মানবের দুর্দ্দশা ও তাহার অন্তিম পরিণামের কয়েকটি বাছাই করা দৃশ্য পড়িয়াছিল—তাই তিনি বিবাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আসলে, তাহা নহে। তাহা যদি হইত, হাসপাতালের চিকিৎসকেরা প্রত্যেকেই এক-একজন করিয়া "বুদ্ধদেব" হইয়া পড়িতেন। জন্মান্তরবাদ লইয়াও তর্ক তুলিব না। সঠিক করিয়া এই কথাটাই বলি, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাটির যে রস তাঁর অঙ্গে ঠেকিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাণের বিষ! সেই বিষেই বিষিয়া বিষিয়া তিনি বড় হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁর জন্ম-

পত্রিকার এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে অকস্মাৎ টক্কর খাইয়া পড়িয়া গিয়াই তিনি বেহুঁস হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্নাম কিনিল, তাঁর চোখে-পড়া পৃথিবীর অতি সাধারণ, নিত্য-নৈমিত্তিকের কতিপয় ছবি! সুতরাং, কঙ্কণও এই যে এমন আচম্‌কায় গৃহত্যাগ করিয়া বসিল, পার্থিব হেতু তার কিছুই ছিল না। হেতু, একমাত্রই—ইহলোকে তাহার আবির্ভাব!

অগ্রে অঞ্জন, পশ্চাতে কঙ্কণ—উভয়েই নির্ব্বাক্। কোথায় যাইবে, গিয়া কি করিবে, কঙ্কণ তাহা প্রশ্ন করে নাই, যেন চলিতে হয় চলিয়াছে। বলিবার আর কিছু অঞ্জনেরও যেন নাই। যাহা বলিবার, বলিয়া-কহিয়া যেন সে সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে।

দ্বিতলের সোপানশ্রেণী যেখানে নীচে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটি হরিণ শিশু নিদ্রিত ছিল। পদশব্দে উঠিয়া পড়িয়া কঙ্কণকে দেখিয়াই তাহার সম্মুখে গিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পুলকের সীমা যেন তাহার আর নাই! কঙ্কণ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল এবং আচম্‌কায় নীচু হইয়া যেমন উহার মুখটা বুকে চাপিয়া ধরিবে, অঞ্জনের নিষেধ পড়িল—'আর নয়!'

ছাড়িয়া দিয়া কঙ্কণও সোজা হইয়া দাঁড়াইল—কতই না অপ্রতিভ! পুনশ্চ পা ফেলিল। দুয়ারের মুখেই প্রহরী—প্রভুকে দেখিয়াই সে সসম্ভ্রমে তাজা হইয়া দাঁড়াইল, মাথা নীচু করিয়া। চোখো-চোখী হইতেই কঙ্কণের চোখ দুটি ছল্‌ছল করিয়া উঠিল "এরা ত জানে না!"

অঞ্জনের চোখ এড়াইল না। হাসিয়া কহিল, "এসব পিছনের বস্তু—ছিঃ!"

কঙ্কণ একমিনিট কাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কহিল, "চলো!"—বলিয়াই পুনরায় যাত্রা সুরু করিল—তখন সম্মুখে কঙ্কণ, পশ্চাতে অঞ্জন।

বিস্তৃত অঙ্গণ—তাহারই বুক চিরিয়া রাস্তা। বেশী দূর যায় নাই, কঙ্কণের আবার গতিরোধ হইল। দেখিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে নন্দন ছুটিয়া আসিতেছে এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই, সে যেন পটে-আঁকা ছবির মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটিবার কঙ্কণের দিকে আর একটিবার অঞ্জনের দিকে তাকাইয়াই যেন ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'তোমরা মরনি!'

কঙ্কণের মুখে হাসির ঈষৎ রেখা পড়িল। কহিল, "নিশ্চয়ই।" বলিয়াই অঞ্জনকে দেখাইয়া কহিল, "ইনি আগেই—আমি আজ!"

"তা হ'লে, তোমরা ভূত?"

এবার জবাব দিল অঞ্জন। সহাস্যে কহিল, "কাছা-কাছি! ভয়ের কোঠায়—ভিক্ষু!"

"ভিক্ষু—কঙ্কণ?"—নন্দন চমকিয়া উঠিল, যেন সহসা এক ব্রহ্মাণ্ড ভাঙিয়া চুরমার হইয়া তাহার চোখের উপর একাকার হইয়া গেল।

কঙ্কণ ধীরপদে অগ্রসর হইয়া নন্দনের হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "আজ ডাক পড়েছে কি-না!"

নন্দন হাত ছাড়াইয়া একটু পিছাইয়া গিয়া আপনমনে বলিয়া উঠিল, "হুঁ, বুঝিছি!" বলিয়াই অঞ্জনের দিকে এক রোষতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়াই তাহার কাছে আসিয়া মার-মুখ হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভাল চাও তো সরে পড়ো! নইলে—" বদ্ধ মুষ্টি উঠাইয়া কথাটা শেষ করিল, "তোমার একদিন, কি আমার একদিন!"

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি উভয়ের মাঝখানে আসিয়া নন্দনের দিকে ফিরিয়া মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "অপরাধ হবে!"

"শ্রাদ্ধ হবে আমার!"—নন্দন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তারপর অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া অঞ্জনের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মন্তর ঝেড়ে মানুষ ধরতে এসেছ—মুণ্ডুপাত—"

মানবের এ আবার এক পাশবিক উত্তাপ! কঙ্কণ শিহরিয়া উঠিল, যেন তাহার বুকে হাতুড়ির আঘাত পড়িয়াছে। নন্দনের হাতদুটা ধরিয়া ফেলিয়া অস্থির কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মানুষের পাপ অনেক জমা হয়েছে! এ আর বাড়িও না, ভাই! রব মুখথেকে বেরুলেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে—নোংরা কথায় পৃথিবীকে বিষিয়ে আর তুলো না! অঞ্জনকে নির্দ্দেশ করিয়া অপরাধীর ন্যায় কহিল, "ইনি নিরপরাধ! ভিক্ষার ঝুলি আমি নিজেই নিয়েছি!"

অতঃপর কঙ্কণ যেমন অঞ্জনকে সঙ্কেত করিয়া পুনশ্চ রাস্তা ধরিবে, নন্দনের পিঠে যেন বেত্রাঘাত পড়িল। লণ্ড-ভণ্ড হইয়া কঙ্কণের সম্মুখে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

কঙ্কণ স্থির অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "জানিনে! শুধু এই জানি—ও আমার জান্‌বার নয়!

এইবার নন্দনের চোখদুটি হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, "আর ফিরবে না?"

প্রশ্নটার জবাব দিল অঞ্জন! মৃদুকণ্ঠে কহিল "না ভাই! কেউ আর ফিরতে চায় না!"

"তুমি মহাপুরুষ! আমাকে মাপ করো!"—বলিয়াই নন্দন অঞ্জনের পাদুটি জড়াইয়া ধরিল।

অঞ্জন তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া দুই হাতে নন্দনকে তুলিয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া কহিল, "পাগল তুমি! মানুষকে চালান্ আর একজন! তিনি কাউকে পায়ে হাত দেবার অধিকার দেন নি!" বলিয়াই কঙ্কণের হাতে একটা টান দিয়াই অগ্রসর হইল।

নিশ্চল নিস্পন্দবৎ দাঁড়াইয়া রহিল—নন্দন! কি মনে করিয়া, কে জানে!

ইহারা বেশি দূর যায় নাই নন্দনের চমক ভাঙ্গিল—যেন তাহার চারিদিকে শ্মশান, তাহারই মাঝে দাঁড়াইয়া সে—এক মাত্র প্রাণী! দূর বিস্তৃত পৃথিবী—তাহারই বুকে নেত্র পাত করিতেই দেখিল,—ওই ত কঙ্কণ চলিয়াছে! ওই সেই চিরদিনের 'অন্তর্ধান'! কিন্তু—

চম্‌কিয়া উঠিল, যেন কি মনে পড়িয়াছে। এবং তৎক্ষণাৎ এক লাফ দিয়া ওই ওদেরই দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কাছে আসিয়াই সুমুখে পড়িয়া কঙ্কণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত, স্খলিত, ত্রস্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও! এক পল—"

আবার এক পিছনের বাধা! কঙ্কণের মুখখানা শুকাইয়া গেল। ম্লান মৃদু কণ্ঠে কহিল, "বল—"

"তোমার বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি?"

মুহূর্ত্তেই কঙ্কণ জবাব দিল, "তুমি নেবে?"

নন্দনের বুকের ভিতরে এ জিজ্ঞাসা কি ভাবে পৌঁছিল, জানি না, কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়-মান হইল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িয়াছে—আস্তে আস্তে দৃষ্টিনত করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিয়া কহিল, "নেব।"

"দিলাম।"

"টাকাকড়ি, দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন—"

"সমস্ত।"

"সমস্ত?"

সংকল্প-কঠিন মুখে কঙ্কণ একটু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, যা কিছু—সব!"

নন্দনের ব্যস্ততার যেন সীমা নেই! তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তবে দাঁড়াও একটুখানি—কাগজ-কলম নিয়ে আসি—"

পিছন ফিরিতেই কঙ্কণ হাসিয়া কহিল, "সাক্ষী আমি নিজেই, সুতরাং ও-সবের প্রয়োজন নেই!"

নন্দন একটু যেন অপ্রতিভ হইবার ভাণ করিয়া কহিল, "মোটেই না! তবে ওই যে একটা রাক্ষুসে গোলযোগ আইন!"

কঙ্কণের মুখখানা হঠাৎ বিকৃত হইয়া উঠিল, যেন আগুনের ফুল্‌কি পড়িয়াছে—আইন! পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "নিয়ে এসো—"

নন্দন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। এক দৌড়ে একখণ্ড কাগজ ও কলম আনিয়া কঙ্কণের সম্মুখে ধরিল। কঙ্কনও আর দ্বিরুক্তি করিল না; নিরুদ্বেগে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া এক খানি 'দানপত্র' লিখিয়া নন্দনের হাতে অর্পণ করিল।

দানপত্রখানা আদ্যন্ত একবার পড়িয়াই নন্দন মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "উঁহু, হয়নি—বাদ পড়েছে!"

কঙ্কণ প্রবল সংশয়ে প্রশ্ন করিল, "কি?"

কাগজখানার উপর মনোনিবেশ করিয়া নন্দন কহিল, "তুমি কি আমাকে দান করেছ—সমস্তই?"

কঙ্কণ সহাস্যে জবাব দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমার বল্‌তে—"

নন্দন বাধা দিয়া পশ্চাদ্দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, "চেয়ে দেখ, কঙ্কণ, পিছনের পানে—আর কিছুই কি তোমার নেই?—কোন বস্তু, কোন রত্ন, কোন মানুষ—"

"যদি থাকে, তাও—তোমার!"

"চিত্রাও!"

"চিত্রা?"—কঙ্কণ চমকিয়া উঠিল।

নন্দন মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ও বুঝি তোমার পিছনে ফেলে-যাওয়া সব কিছুর মধ্যে নয়?"

নির্ব্বাণের পথ, সেই পথের যাত্রী!—কঙ্কণের মুখখানা ঝুঁকিয়া পড়িল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া কহিল, "আমার অধিকার?"

"সে কার?"

কঠিন প্রশ্ন! কোনও দিন কঙ্কণ চিত্রার কাছে জানিয়া লয় নাই—সে কার? তার দেহ আছে, মন আছে! কোনও দিন কোনও কথায় সেও ত বলিয়া রাখে নাই, ও—সব কার? * * * * হঠাৎ কি ভাবিতে গিয়া কঙ্কণ শিহরিয়া উঠিল; সম্মুখে নন্দন, যে তার বুকে হাত দিয়াছে। পার্শ্বেই আর একজন—সে অঞ্জন! তার মনে ছোঁয়া দিয়াছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। চোখ তুলিতেই দেখিল—সম্মুখেই এক দুর্লঙ্ঘ্য বিভীষিকা, অতীতের দুর্দ্দান্ত তৃপ্তি! যেন এক জনহীন কুসুমিত ধরিত্রী, তাহারই উপর স্পষ্ট দিবালোক, তাহারই মাঝে মাত্র দুইটি প্রাণী—একটি নর, একটি নারী! উভয়ে তারা একাত্ম—সে আর চিত্রা!

কঙ্কণের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে দিকটায় হাত চাপা দিয়া নিজেকে টানিয়া ছিঁড়িয়া পিছন করিয়া নন্দনকে কহিল, "সে আমার!"

নন্দন রীতিমত গম্ভীর হইয়া কহিল, "তবে?"

কঙ্কণের মুখে আর চাঞ্চল্য নাই, উদ্বেগ নাই, বিস্ময় নাই। হাত ছড়াইয়া 'দানপত্রখানা' টানিয়া লইয়া পুনশ্চ লিখিয়া দিল, "আমার চিত্রা—তোমাকে দান করিলাম!"

তারপর এক মুহূর্ত্ত—এক মুহূর্ত্ত পরেই অঞ্জনের হাতে একটা টান দিয়া অঙ্গনের বাহির হইয়া গেল।

—নয়—

নন্দনের মুখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, এই যে 'রামায়ণ', ইহা রচনা হইবার পূর্ব্বাহ্ণেই তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটা যেন জানা ছিল—কঙ্কণটা এমনিইভাবে একদিন মাটি হইয়া যাইবে। সুতরাং, এই আকস্মিক দুর্দ্দৈব অধিকক্ষণ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না। উহারা দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই, 'দানপত্রখানা' একবার সে পাঠ করিল, করিয়াই কি মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, তার পর মুখ ফিরাইয়া পায়ে জোর দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। তখন আর রাত নাই।

স্তব্ধ অন্ধকার, আকাশ ও মৃত্তিকা স্তব্ধ। এ বাড়ীতে পদার্পণ নন্দনের আজ প্রথম নহে, কিন্তু আজ তার মনে হইল—এক দুর্লভ স্বপ্নের আবেশে দেবলোকে গিয়া সে হঠাৎ এক অমর নিকেতনে আসিয়া পড়িয়াছে! কঙ্কণের সংসারটি ছিল দাস-দাসী লইয়া, কিন্তু আজ উৎসবের রাত্রি, তাহাদের ছুটি। ছিল মাত্র প্রবেশদ্বারে প্রহরী, সেও এখন নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত—প্রভু বাহিরে, তদুপরি শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া! নন্দন এক ধাক্কা মারিতেই সে চমকিয়া লাঠি উঁচাইয়া মারিতে গিয়াই নন্দনকে চিনিয়া ফেলিল এবং আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, "সীতারাম, সীতারাম—"

নন্দনের যেন ক্রোধের অবধি নাই। বলিল, "তোমরা জবাব!"

"কসুর মাফ্ কী জিয়ে! মালিককো মৎ বোল্না—"

"মালিক?—আজ থেকে আমিই তোমার মালিক!"

মুহূর্ত্তে প্রহরীর মুখ হইতে আতঙ্কের ছায়াটা সরিয়া গেল। লাঠি গাছটা উঠাইয়া কাঁধে ফেলিয়া বিদ্রূপকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপ্ বাউরা হো গিয়া!"—বলিয়াই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নন্দন এইবার এম্‌নিভাব দেখাইল যেন দুর্জ্জয় ক্রোধে সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বলিয়া উঠিল, "নিকালো, তোমরা জবাব—আভি জবাব—"

ভোরের ঠাণ্ডায় বে-এক্‌তার—প্রহরীর তখন একটু 'নেশার' ইচ্ছা হইয়াছিল। আপন খেয়ালেই একটু শুখা তৈরী করিয়া মুখে ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "আরে, সাত-পুরুষ এহি মোকাম্‌মে নক্‌রি করতা হ্যায়—কাম্ লেনেকা আয়া কোন্ শ্বশুরাকা লেড়কা?"

"গালাগাল?"

"মিঠা বাত বল্‌নে হোগা—জরুর! কাঁহেনা—হামরা সাত্-সাত্ পুরুষকা মালিককো আপ্ আজ ঠানে আয়া!"

নন্দন দেখিল, গতিক সুবিধা নয়—পথ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে! গলায় আওয়াজ নরম করিয়া কহিল, "বাবা, বংশধর—"

"কেয়া, বংশোধর?"

"তা নয়? অমন একখানি বংশ ধরে রয়েছ, বাবা?"

প্রহরীর বুঝি-বা পুলক হইল। হাসিয়া কহিল, "ঠিক হ্যায়! আচ্ছা—"

নন্দন একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল, তার পর একটু দূরে লইয়া গিয়া আদ্যন্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া 'দানপত্রখানা' তাহাকে দেখাইল।

প্রহরীর তখন সেদিকে চাহিবার প্রবৃত্তি ছিল না। হঠাৎ

অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া মাটীতে সজোরে লাঠি ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল, "বহুৎ আচ্ছা, চলিয়ে—"

"কোথায়?"

"বেরাগীকো মঠ্‌মে!"

নন্দন সভয়ে তাহার শ্রীমূর্ত্তিটার দিকে চাহিতেই প্রহরী বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌তা কেয়া? এহি ডাণ্ডামে মঠ্ তোড়কে হামরা কলিজাকো আভি হিঁয়া হাজির করেগা! চলিয়ে—"

"তা হলে কঙ্কণ আত্মহত্যা করবে!"

প্রহরী আঁতকিয়া উঠিল। কহিল, ঠিক বাত্—এভি ঠিক। তব্ কেয়া হোগা—মালিক আউর আবেগা নেহি? তার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল।

নন্দন একবার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়াই গলা ঝাড়িয়া কহিল, "আসবে বৈকি!"

প্রহরী লাঠির উপর ভর দিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ ক্ষেপাইয়া উঠিল। কহিল, "জরুর! লেকেন, এহি একঠো মোকামকে নেহি! হাজার মোকামকো, হাজার আদমীকো, হাজার কলিজাকো অন্দরমে—" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

ভোরের বাতাস! নন্দনের বুঝিবা ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। নাক ঝাড়িয়া কহিল, "তোমার আমার কলিজাতে আগে!" একটু থামিয়াই যেন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ! আমি ওপরে যাচ্ছি। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার—মাইজি যদি আসে—"

প্রহরী শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "উন্‌কা দুস্ ছুট্ যায়েগা—"

"আহা-হা! সেই জন্যেই ত বল্‌ছি, কথা শোনো—এনে, তুমি কিছু বোলোনা, শুধু বোলো—'বাবুজি ওপরে।' তার পর, ওপরে গেলেই আমি বুঝিয়ে দেব! বুঝ্‌তা হ্যায়?"

প্রহরী কিন্তু কথাটা বুঝিলনা। নন্দনও আর অপেক্ষা করিলনা, উপরে উঠিয়া গেল।

উন্মুক্ত কক্ষ। ঢুকিয়া নন্দন চারিদিকে তাকাইতে লাগিল; দেখিল—বিছানা এলোমেলো, এখানে-ওখানে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা, ছড়ানো জল, রক্তের দাগ। বুঝিতে পারিল, এইখানে আহতের সেবা চলিয়াছিল। ভৃত্যেরা তখন কেহই ছিলনা, নন্দন নিজেই সে-সমস্ত উঠাইয়া পরিষ্কার করিতে গেল এবং এক টুকরা কাপড়ে হাত দিতেই ঘুমকিয়া পিছাইয়া আসিল—না থাক্। এমনিই সময় সিঁড়িতে কার পদশব্দ হইতেই সে তাড়াতাড়ি খাটের উপর আসিয়া একখানা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। তার পর এক মুহূর্ত্ত! এক মুহূর্ত্ত পরেই চঞ্চল পদে একটি অস্থির নারী মূর্ত্তি আসিয়া প্রবেশ করিল—চিত্রা। তাহার মাথার চুল এলোমেলো, বিশৃঙ্খল বেশভূষা, চোখে আতঙ্ক! ঘরে পা দিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল—ছেঁড়া কাপড়, জল, রক্ত! আর—

পা দু'টা বুঝি ভাঙিয়া গিয়াছে, নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়াই খাটের কাছে দাঁড় করাইয়া শায়িত ওই বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির দিকে স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া আস্তে-আস্তে গায়ে হাত দিল।

নিথর!

চিত্রার বুকটা উড়িয়া গেল! মুখখানা বিবর্ণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল—যেন সে জানে সহস্র সর্ব্বনাশ হইলেও এইবার সাড়া মিলিবেই মিলিবে!

কিন্তু, না! নিস্পন্দ ওই নরদেহ! * * * চিত্রা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলনা। থর-থর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর ভিতর মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল।

শেষ! তাহার জীবনের যাহা কিছু উৎসব, যাহা কিছু গৌরব, যাহা কিছু ভ্রান্তি—সবই কি তবে শেষ? অজস্র আশ্বাস—তাহার কি ছাই কোন মূল্যই নাই? তরুণ দেহ—ইহার বিচিত্র সফর, নির্ম্মুক্ত বুক—ইহার সাজানো ফলফুল, কাহাকে দিয়া তবে সে আত্মহারা হইবে? জীবনের কল্পতরু—এম্‌নি করিয়াই সে কেন হেলিয়া ভাঙিয়া শুকাইয়া যাইবে?—কেন? কঠিন শপথ—'তুমি আমার!' ইহাও কি—

চিত্রা চমকিয়া উঠিল এবং ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর একবার বস্ত্রাবৃত মুখের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই মুখের আবরণটা খুলিয়া ফেলিল—

এ কে?

একটু পিছাইয়া আসিয়া চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নি?"

নন্দনের যেন কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। ঘন-ঘন হাই তুলিয়া গা ভাঙিয়া বার কয়েক এপাশ-ওপাশ করিয়া বলিল, "তাইত!"

"তিনি কোথায়?"

নন্দন এইবার উঠিয়া বসিল। তার পর সুবিধা ও

অবসর মত স্বীয় বুকের উপর আঙুল রাখিয়া কহিল, "এই ত!"

চিত্রা অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যগ্রব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলুন—"

চিত্রা খাট হইতে নীচে নামিয়া মেঝের উপর এক অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আকাশ হইতে পড়ন্ত বজ্রকেও হাতুড়ি মারিয়া সায়েস্তা করিতে চিত্রা প্রস্তুত! তাই সে আজ নিজেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিলনা। অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "তবে তিনি নেই?"

"যা বোঝো!"

প্রয়োজন মিটিয়াছে। চিত্রা দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইল, তার পর পা উঠাইয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, নন্দন ডাকিল, "শোনো—"

চিত্রা মুখ ফিরাইল।

নন্দন কহিল, "কি বল্‌ছিলাম—হ্যাঁ, তুমি চলে যাচ্ছ?"

এ প্রশ্নের বুঝিবা জবাব নেই। তাই, পুনশ্চ ফিরিয়া চিত্রা পা বাড়াইল।

নন্দন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মাটী করলে! আরে, না—না! সবটা সে মরেনি।"

কলের পুতুলের ন্যায় চিত্রা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন নন্দনের মুখে হাসি আর ধরেনা।

চিত্রা যেন তাহার বুকের খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নন্দনের পায়ে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনার পায়ে পড়ি! বলুন—তাঁর কোন অকল্যাণ হয়নি ত?"

"রাম বল! তিনি স্বশরীরে স্বর্গে গেছেন?" বলিয়াই নন্দন চিত্রার কাছে গিয়া কানের গোড়ায় মুখ নামাইয়া কহিল, "এই আজ থেকে—বুঝেছ, এই অদ্য হইতে—তুমি আমার—মমস্য!"

দাবানল! চিত্রার চারিদিক ঘিরিয়া যেন এক দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মুখ সংযত করবেন! বুঝিছি, তিনি নেই—সেই সুযোগ পেয়েছেন আপনি!"

নন্দন তখন মুখটিপিয়া হাসিতেছিল। পলকেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বেয়াড়া লোকত? কথাটাই ছাই শোন আগে?—শুধু তুমি নও—ঐ দারোয়ান পাঁড়েজি পর্য্যন্ত আমার!"

এইবার চিত্রার বুকের ভিতরটা খানিক এলো মেলো হইয়া গেল—যেন এক পরিচিত সন্দেহ হঠাৎ মূর্ত্তি ধরিয়া উঁকি মারিয়াছে। মূঢ়ের ন্যায় নন্দনের দিকে তাকাইতেই নন্দন বলিয়া উঠিল, "শুধু পাঁড়েজি নয়—ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, চাকর চাকরাণী—মায় হরিণ ছানাটাও!"

চিত্রার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল! কহিল, "কারণ?"

"আইনের কাব্য—কঙ্কণ হাত বদ্‌লে হয়েছে নন্দন!" বলিয়াই নন্দন চিত্রার দিকে এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল। কহিয়াই আবার সুরু করিল, "বুদ্ধদেব, মঠ,—বিবাগী! এতক্ষণ মঠে গিয়ে মন্ত্র পড়ছেন!"

ভূমিকম্পের সময় মানুষের মুখের চেহারা যেমন হয়, চিত্রারও মুখখানা তদ্রূপ হইয়া গেল। যেন তার চোখের উপর সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া, ভাঙিয়া, চৌচির হইয়া রসাতলে যাইতে বসিয়াছে! পা দুইখানা ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কোনরূপে নিজেকে খাড়া রাখিয়া এক পল্‌কা সাহসকে আশ্রয় করিয়া অস্থির বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা হোতে পারে না! আমাকে লুকিয়ে রাজসিংহাসনেও বস্‌তে তিনি পারেন না!"

"কথাইত তাই! ওই—সব পারে না বল্‌লই ত গেরুয়া নিয়েছে!"

"মিথ্যে কথা

"যদি সত্যি হয়!"—এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই নন্দন 'দান পত্রখানা' বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখ—" বলিয়াই সরিয়া আসিয়া উহা চিত্রার হাতে ফেলিয়া দিল; দিয়াই একান্ত নিরীহের ন্যায় কহিল, "ভাল করে অম্‌নি দেখে নিয়ো—তুমি এখন কার!"

'দানপত্র' তাহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষর—তাহার উপর চোখ পড়িতেই চিত্রার মুখখানা ছাই হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিয়া উঠিল, যেন পিঠের উপর আচম্‌কায় কোথা হইতে তীর আসিয়া বিঁধিয়াছে! তারপর—পুণশ্চের দিকটায় চোখ পড়িতেই ক্রোধে তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল এবং 'দানপত্র'খানা ছিঁড়িয়া

খণ্ডখণ্ড করিয়া মাটীতে নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া যেমন বাহিরের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, নন্দন যেন চোখ মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা—হা, করলে কি?"

চিত্রা সর্পিনীর ন্যায় ফিরিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কঠিন কণ্ঠে কহিল, "পুরুষ জাতির সৎকার!" বলিয়াই হাউয়ের ন্যায় বাহির হইয়া গেল।

নন্দনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। তারপর দানপত্রের কুচিগুলা কুড়াইয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "এঁদের নাম—বলে দিলে—অবলা!" তারপর নীচে নামিয়া গেল।

দশ

বাহির হইয়া চিত্রা যখন রাজপথে পা দিল তখন চারিদিকেই প্রভাতের প্রথম নমস্কার।

উৎসব ভাঙিয়াছে—রাস্তার কোন অংশে অতিরিক্ত ভিড়, কোন অংশ জন-বিরল। সেই পথ ঠেলিয়াই চিত্রা চলিয়াছে। একস্থানে——ঠিক রাস্তার উপর কতকগুলা লোক অচৈতন্যভাবে পড়িয়াছিল, অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া। চিত্রা তাহাদের সুমুখে পড়িয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া পার হইয়া আবার চলিতে লাগিল। খানিকদূর গিয়াছে, দেখিল একটা ছাউনির ভিতর একটি তরুণ, একটি তরুণী—মেয়েটি ছেলেটির বুকে মাথা রাখিয়া—উভয়েই নিদ্রায় অচেতন, যেন বা তাহাদের হুঁস্ নাই—রাত্রির পর এক রাক্ষুসে দিন আসে! চিত্রা পায়ে জোর দিল। বেশিদূর যায় নাই, দেখিল এক পুষ্পোদ্যান হইতে একদল তরুণী বাহির হইতেছে—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ফুলের সাজ, মুখে প্রভাতী গান—সে-গানে ইহারই আভাস যে, পথ চলিয়া বর-প্রেমিকের কাছে হাজির হইতে দেরি হইবে বলিয়া গানের রেশের মুখে কল্পনায় স্বীয় মূর্ত্তি গড়িয়া ঠেলিয়া লইয়া অগ্রেই নিজেদের উপহার দিয়াছে! কাছাকাছি হইতেই চিত্রাকে দেখিয়া তাহারা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। একজন চিত্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তুমিও রাজবাড়ীর দাসী নাকি?"

চিত্রা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ার ন্যায় মেয়েটির দিকে তাকাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "অবাক্ হয়ে রইলে?"

চিত্রা ধীরকণ্ঠে কহিল, "রাজবাড়ী?—না। তোমরা যাচ্ছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

মেয়েটি গালে আঙুল ঠেকাইয়া কহিল, "অবাক্ করলে! আমরা যে কুমারী—জাননা তুমি?"

অতিকষ্টেও চিত্রার মুখে হাসি আসিল। কহিল, "না।"

মেয়েটি চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিল, "এই, কাল উৎসব গেছে কিনা—উৎসবের পরদিন, রাজা 'বউ' বেছে নেন—এক বছরের খোরাক!"

"তারপর?"

মেয়েটি কি বলিতে যাইতেই আর একটি মেয়ে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই থাম্! এইবার আমি বলি—"

এই অবকাশে অপর একটি মেয়ে মুখস্থ বলার মত তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "তারপর, ফিরে বছরে এম্‌নি দিনে—আবার! হ্যাঁ ভাই, তুমি যাবে না?"

কাতর-মলিন মুখে ঈষৎ হাসিয়া চিত্রা কহিল, "না।"

"বাঁচলুম! যে রূপ!"—বলিয়াই মেয়েটি সঙ্গিনীদের ডাক দিয়া ছাড়া-গানটি আবার ধরিয়া চলিয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল—একি পাশবিক আচার! শুনিবার কেহই নাই, তত্রাপি সে যেন নিজেকেই নিজে শুনাইয়া কহিল, "এই পুরুষ, এই তার 'বলি'!"

চিত্রা অধিকতর দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কতদূর গিয়াছে, তাহা তাহার হুঁস্ নাই, রাস্তায় এক বাঁকের মুখে পড়িয়াই চম্‌কিয়া উঠিল—সুমুখেই একখানা গাড়ি! তৎক্ষণাৎ গাড়িখানার গতিরোধ হইল এবং চিত্রাও তাড়াতাড়ি নিজেকে হিঁচ্‌ড়িয়া আনিয়া রাস্তার একপাশে ঠেলিয়া গুঁজিয়া ধরিল। গাড়ির ভিতরটায় চিত্রার লক্ষ্য পড়ে নাই, কিন্তু গাড়ির ভিতর হইতে আর একজনের লক্ষ্য পড়িল চিত্রার উপর—সে সেই গতরাত্রির নাগরিকা। নাগরিকা ত্বরিদ্বেগে নামিয়া আসিয়া চিত্রার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি?"

বিস্ময়ে ও আনন্দে চিত্রার চোখদু'টা বড় হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমিও যে—হঠাৎ ?"

নাগরিকার মুখে একমুখ হাসি। কহিল, "এইত সকলের মন কুড়িয়ে ফির্‌ছি!" গাড়িতে বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়া একটি যুবককে দেখাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ওই দেখনা ?"

চিত্রা গলা চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে—তোমার স্বামী ?"

নাগরিকা তাড়াতাড়ি চিত্রার মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "চুপ্! ও-সব বালাই আমার নেই! মালা আমি নিই—দিইনে!"

আবার সেই বিষ! গত রাত্রির প্রথমক্ষণে এক বিষ-দর্পণে এই মেয়েটির প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেও পরক্ষণেই তাহার কথাবার্ত্তায় চিত্রার বুকের ভিতর এক মৃদু-সমীরণের স্পর্শ পড়িয়াছিল, তাই সে নিজের অনেকখানিই উহাকে ধরিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আজ আবার তাহার সমগ্র মন ঘৃণায় বিষিয়া উঠিল—ছি, ছি! * * * অস্পৃশ্যার নিশ্বাস—চিত্রা মুখ ফিরাইল; ফিরাইয়া যেমন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে, নাগরিকা দুই হাত বাড়াইয়া বাধা দিয়া কহিল, "তা হয় না! এইবার তোমার কথা—এক্‌লাটি কোথায় ?"

আপদকে এড়াইতে হইবে, অথচ মিথ্যাবাক্য তাহার মুখে আসেনা। কাজেই তাহাকে বলিতে হইল, "মঠে।"

এক পরিচিত বিস্ময়! যেন এক পরিচিত বিস্ময়ের বাষ্পে নাগরিকার চোখদুটি ভরিয়া উঠিল। পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "মঠে—কেন ?"

"তিনি গেছেন, তাই!"

নাগরিকা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তারপর চিত্রার পানে এক ক্ষোভ কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "মাটি করবে নিজেকে ?" বলিয়াই ফিরিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। চিত্রাও রেহাই পাইয়া আবার পথ ধরিল।

অদূরেই নগরের তোরণ, তারপরই প্রান্তর—দূর-বিস্তৃত। তাহারই ওপারে—মঠ! নগর ছাড়িয়া চিত্রা মাঠে পড়িল—বিশ্রী পাথুরে রাস্তা। মাথার উপর চম্‌চমে রোদ। চিত্রা এক নিঃশ্বাসে নিজেকে যেন জোর করিয়া খানিকটা ঠেলিয়া লইয়া যায়, আবার থামে। এম্‌নি করিয়াই চলিতে লাগিল। কোনোও দিন সে হাঁটিয়া পথ চলে নাই, কিন্তু আজ যেন সে বাজী রাখিয়াই নিজেকে উপহাস করিয়া চলিয়াছে—পৃথিবীর কোনোও বাধা সে মানিবে না। বুঝিবা এই সত্যই বড় হইয়া তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার দেহের মূল্য নাই—মহাপ্রাণ এই পথই ভাঙিয়া গিয়াছে। সুতরাং, ইহাই তার পথ! কিয়দ্দুর গিয়াছে, হঠাৎ একখানা পাথরে জোর আঘাত লাগিয়া পা কাটিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু, সে এক মুহূর্ত্ত! তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থানে খানিক ধূলা চাপা দিয়াই আবার চলিতে সুরু করিল। বেলা যখন অপরাহ্ণ তখন সে মাঠ পার হইল। এইবার মঠ! চিত্রার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, দেহটা অবশ হইয়া গেল—ওই মঠ! কয়েক পদ গিয়াই হঠাৎ তাহার গতিরোধ হইল—পায়ের নীচেই এক খরস্রোতা! অপর পারেই—মঠ!

চিত্রা চাহিয়া দেখিল, ওপারে একখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। হাতছানি দিয়া ডাকিতেই মাঝি এ-পারে নৌকা আনিল এবং উঠিবার জন্য নৌকায় চিত্রা পা বাড়াইতেই, মাঝি বাধা দিয়া হাত পাতিল—'ভাড়া ?'

তাইত! চিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল—নাই ত কিছুই! মনে করিল, একখানা অলঙ্কার দিবে, কিন্তু পরক্ষণেই হুঁস্ হইল—তাহাও সে গত রাত্রে নাগরিকাকে সমস্ত খুলিয়া দিয়াছে। চুপ করিয়া রহিল।

মাঝি তাড়া দিল।

চিত্রা শুষ্ক মুখে কহিল, "হাতে কিছুই নেই!"

"নেই, তবে রূপ দেখিয়ে পার হবে নাকি ?" বলিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া উঠিল। তারপর এক বিশ্রী কটাক্ষ করিয়া কহিল, "নগরে গিয়ে কিছু উপার্জ্জন করে এনে পার হতে এসো—হয়রাণ!" বলিয়াই নৌকার মুখ ঘুরাইয়া আবার ও-পারে চলিয়া গেল।

ও-পারে—ওই মঠ, তাহার উপর অপরাহ্ণের রক্তিম-রাগ পড়িয়াছিল, সঙ্গে-সঙ্গে উহা যেন সরিয়া গিয়া অন্ধকারের এক কালো ছোপে রূপান্তর গ্রহণ করিলল। চিত্রা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, পা দুটা ভাঙিয়া পড়িল, তারপর অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল—সুমুখেই কালো জল, ও-পারে—

উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার দেহে কে এইমাত্র এক মুঠি শক্তি গুঁজিয়া দিয়া গিয়াছে। তারপর লাফ দিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর—তারপর যখন সে সাঁতার দিয়া পার হইয়া ও-পারে গিয়া উঠিল, তখন টের পাইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ গড়াইয়া জল পড়িতেছে—টস্, টস্, টস্!

পড়ুক্! সেদিকে তাহার দৃক্‌পাত করিবার সময় ছিল না। মুখের উপর কতকগুলা ভিজা চুল আসিয়া পড়িয়াছিল, সেগুলা মাথার উপর ঠেলিয়া তুলিয়াই নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়া মঠের মুখে দাঁড় করাইয়া দিল।

দ্বার খোলাই ছিল—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি প্রিয়দর্শন তরুণ ভিক্ষু। চিত্রাকে দেখিয়াই সে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই সেদিকে চিত্রার। বিশ্বব্যাপী এক এলোমেলো ঝড়ের ন্যায় যেমন ভিতরে প্রবেশ করিবে, ভিক্ষু তাহার সুমুখে পড়িয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল—'নিষেধ!'

চিত্রা চম্‌কিয়া ভিক্ষুটির দিকে তাকাইল, তখন তাহার বুকটা উড়িয়া গিয়াছে—নিষেধ ?

সেই চাহনি—ভিক্ষুর নিকট গোপন রহিলনা। তৎক্ষণাৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "স্ত্রীলোক!"

নিস্পন্দের ন্যায় মিনিটখানেক ভিক্ষুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া চিত্রা কহিল, "মানুষ—স্ত্রীলোক কি মানুষ নয় ?"

"নিয়ম!"

চিত্রার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমাদের নিয়ম—আমাদের এই অপমান ?"

ভিক্ষুর চোখদুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল, "তা কেন—আপনি মা!"

"তবে ?"

"আপনি ফিরে যান ?"

ফিরিয়া যাইতে চিত্রা আসে নাই। কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া কহিল, "যাবো না—পথ ছাড়ো—"

"না, মা! তা হয় না! এ মঠ, আর আপ্‌নি গৃহস্থ-লক্ষ্মী—এর ভিতর যাবার আপনার অধিকার নেই!"

এইবার চিত্রার সর্ব্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহার সর্ব্বস্ব যে ইহারই ভিতর! ব্যগ্র-কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার সন্তান—"

"আমি মাতৃহীন!"

চিত্রা পিছাইয়া আসিল, যেন তাহার মুখে এক চড় পড়িয়াছে। অতঃপর তাহার ভিতর যে সুস্থপ্রকৃতি অবশিষ্ট ছিল, তাহা নিমেষেই কর্পূরের মত উবিয়া গেল। বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমরা পাপিষ্ঠ!"

ভিক্ষু আস্তে-আস্তে মাথা নীচু করিল, যেন ওই পরিচয়হীনা মায়ের তিরস্কার সে নতশিরেই গ্রহণ করিয়াছে—আশীর্ব্বাদ!

চিত্রা কণ্ঠে ঈষৎ জোর দিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "ছাড়বে না পথ ?"

ভিক্ষু নিরুত্তর হইয়া রহিল, তেম্‌নি করিয়াই।

দলিতা সর্পিনীর ন্যায় ব্যর্থরোষে এদিক-ওদিক শূন্য-দৃষ্টিতে বারকয়েক তাকাইয়া আকাশের দিকে চোখ তুলিতেই চিত্রা শিহরিয়া উঠিল—আর যে বেলা নাই! তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া ভিক্ষুকে অস্থিরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কথার একটা জবাব দেবে ?"

ভিক্ষু শান্তকণ্ঠে কহিল, "প্রতিশ্রুতি দিতে আমাদের নেই—বলুন ?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, "কেউ আজ 'বলি' হয়েছে এখানে—বলিদান ?"

কথাটা বুঝিবা ভিক্ষু বুঝিতে পারিল না। বিস্মিতনেত্রে তাকাইতেই চিত্রা তেম্‌নি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "কাউকে কপ্‌নি পরিয়েছ ?"

ভিক্ষু হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তাই বলুন—ভিক্ষু ?"

শ্লেষকণ্ঠে চিত্রা সায় দিল, "হ্যাঁ! তাঁর কাছে তোমরা দাঁড়াতে পার না—'রাজার ছেলে ?"

এম্‌নি সময়ে মঠের ভিতর ঘণ্টাধ্বনি হইতেই ভিক্ষু ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "উপাসনার ডাক পড়েছে—নমস্কার!" বলিয়া দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই চিত্রা যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, "এও—না ?"

"ভেতরের কথা বাইরে প্রকাশ—এও না!" বলিয়াই ভিক্ষু হাতদুটি জড় করিয়া একবার মাথায় ঠেকাইল, তারপর চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পায়ে জোর দিয়া চিত্রা আর দাঁড়াইতে পারিল না। ঝরে-পড়া পাতার ন্যায় কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। তাহার চলিবার পথে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কি অবরোধ!

কতক্ষণ বসিয়া আছে তাহা তার হুঁস্ নাই, এক সময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল—এই মঠ, ইহারই ভিতর তাহার অন্তরাত্মা

রহিয়াছে ! উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় অগ্রসর হইয়া প্রাচীর গাত্রে হাত দিল—কি তৃপ্তি ! ইঁট-পাথর—ইহার ভিতর রক্তমাংসের দেহের স্পন্দন যে ! প্রাচীর ধরিয়া উহার গায়ে-গায়ে অগ্রসর হইতে লাগিল, কেন যে তাহা সে জানেনা—যেন ইহাই তাহার উপস্থিতকার যাত্রা। খানিক যায়—আকস্মিক আবেগে প্রাচীর গাত্র চুম্বন করে, পরক্ষণেই আবার অবশ হইয়া তাহার উপর মাথা দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ! এম্‌নিভাবে কতদূর গিয়াছে তাহা সে জানে না, হঠাৎ গতিরোধ হইল—গাছ !

গাছটা বেশি বড় নয়—গোড়া হইতেই ঘন-ঘন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। চিত্রার মুখখানা এক অপ্রতিহত উৎসাহে আবার সতেজ হইয়া উঠিল—সেই সন্ধ্যায় আকাশে যে চাঁদ উঠিবার কথা, তাহা যেন তাহারই মুখে অন্তরের মেঘ ঠেলিয়া উঁকি মারিয়াছে। মাথায় বিক্ষিপ্ত কেশরাশি—তাহা গোছা করিয়া গাঁট বাঁধিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া একবার গাছটার দিকে তাকাইল, তারপরেই বাজীকরের ন্যায় উহার উপর উঠিয়া পড়িল। অনুচ্চ প্রাচীর—দেখিতে-দেখিতে সে প্রাচীরের উপর পা দিল। সেই চিত্রা ! তখন মুছিয়া গিয়াছে তাহার পশ্চাতের পৃথিবী, সম্মুখের যাহা-কিছু একমাত্র তাহাই তাহার বর্ত্তমান ইহলোক !

চিত্রার পায়ের নীচেই মঠের ভিতর—দূর-বিস্তৃত প্রস্তরবেদী, তাহার একধারে সারি দিয়া বসিয়া ভিক্ষু, বিপরীত দিকে তদ্রূপ বসিয়া ভিক্ষুণী—উপাসনায় তন্ময়। উভয় শ্রেণীর মাঝে বসিয়া ত্রিবর্ণ—এক প্রান্তে। সকলেই মৌন, সকলেই স্তব্ধ—ইহজগতের মৃত্তিকার সহিত তাহাদের যেন পরিচয় নাই। চিত্রা একবার সেইদিকে নেত্রপাত করিল, করিয়াই বেদীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ হইতেই ভিক্ষুরা ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং সহসা এক নারীকে ভূপতিত দেখিয়া সকলেই যুগপৎ আতঙ্কে ও বিস্ময়ে চম্‌কিয়া উঠিল। তখন চিত্রার জ্ঞান ছিল না। ত্রিবর্ণের আসন একটু দূরে ছিল, তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া একটি মেয়েকে ইঙ্গিত করিতেই সে যেন উড়িয়া আসিয়া চিত্রার কাছে বসিয়া তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইল। সে কৌমুদী। অপর ভিক্ষুণীরাও মাতিয়া উঠিল—কেহ লইয়া আসিল জল, কেহবা তালপত্র, কেহবা শুধুই বিবর্ণমুখে চিত্রার মুখের দিকে তাকাইয়া।

এই সমারোহের অনতিদূরেই দাঁড়াইয়া—কঙ্কণ। তখন তাহার পুরাতন জীবনের অবসান হইয়াছে—সেও ভিক্ষু। তাহার পদদ্বয় নগ্ন, পরিধানে হরিদ্রাবস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তকে হরিদ্রার প্রচ্ছাদন—পিঠ লতাইয়া। সে আজ নির্ম্মম, নির্ব্বিকার—স্বমুখেই যে পৃথিবীর এক স্তোকবাক্য, ইহজন্মের ‘দিলেশা’ ! কঙ্কণ আর চিত্রা, চিত্রা আর কঙ্কণ—এই সে, সেই এ !

ক্ষণেক পরেই চিত্রার চেতনা ফিরিল। ফিরিতেই কৌমুদীর সারা মুখ হর্ষে চক্‌চক করিয়া উঠিল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—‘আর একটু !’

শত্রুপক্ষ ! ইহাদের নিষেধ মানিতে চিত্রা আসে নাই। দেহটা অবশ হইয়া গিয়াছিল, তত্রাপি সে বুকে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল।

এতক্ষণ আর-সকলেই মূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া ছিল। এইবার সেই দ্বার-রক্ষী ভিক্ষুটি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, “আপনি ?”

ত্রিবর্ণ তাহার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন, “তুমি এঁকে চেন ?”

ভিক্ষু বিনীত কণ্ঠে জবাব দিল, “একটু আগেই এঁর সঙ্গে দেখা, মঠের মুখে—প্রবেশ পথ চাইছিলেন !”

“প্রয়োজন জেনেছিলে ?”

“না ! তবে, উনি নিজেই আভাস দিয়েছিলেন—”

ত্রিবর্ণের দৃষ্টি পুনশ্চ সপ্রশ্ন হইয়া উঠিতেই ভিক্ষুটি কহিল, “কোন ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ !”

ত্রিবর্ণ চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ! কে ?”

একপার্শ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ এক নির্ভীক কণ্ঠের উত্তর আসিল—“আমি।”

চমকিত হইয়া সকলেই সেইদিকে চাহিয়া দেখিল—নতমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া কঙ্কণ ! (ক্রমশঃ)

সঙ্গীত

কথা ঃ—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু

মিশ্র-দেশ—দাদ্‌রা

এই বারি ঝরা বাদলে
কত কথা পড়ে মনে গুরু মেঘ মাদলে।
মেঘের গভীর নাদে থেকে থেকে প্রাণ কাঁদে
আঁখি জলে ভ'রে আঁখি ধরে রাখি কি ছলে ॥
বিজলী চমকি চায় হাহা রবে ডাকে বায়
বিরহী ডাহুক বঁধূ কাঁদে আজি উভরায়।
দিশি দিশি ঘন ঘোর
আঁধার এ গৃহ মোর
শূন্য পরাণ মনে প্রবোধিব কি বলে ॥

II রা -ণা ণা | ধা পা ধা I গা পা মা | গা রা -া I
এ ই বা রি ঝ রা বা ০ দ লে ০ ০

I মা পা মা | গুরা রগা গরা I সা -ন্‌া সা | মা রা মা I
ক ত ক থা প ড়ে ম ০ নে গু রু মে

I পা না র্সা | না র্সা -া I পনা -র্সর্রা ণা | ধা পা -া I
ঘ মা ০ দ লে ০ মা ০ ০ দ লে ০ ০

I মা -পধা গা | গা রা -সা II
মা ০ ০ দ লে ০ ০

II { মা মা ধপা | -া -ধা ধা I না র্রা র্সা | -না না -া I
মে ঘে র ০ ০ ০ গ ভী র না ০ দে ০

I র্সা র্সর্গা র্রা | র্সা ধনা না I র্রা -া র্সা | র্সা -া -া } I
থে কে ০ থে কে প্রা ০ ণ ০ ০ কাঁ দে ০ ০

I পা না র্সা | র্রা র্সা না I ধা পা -া | মণা ণা ধা I
আঁ খি জ লে ভ রে আঁ খি ० ধ० রে রা

I পা গা -পা | মা গা -রা II
খি কি ० ছ লে ०

II {রা রপা পধা | পা মপমা গা I গা রা -া | -া -া -া I
বি জ লী० চ ম०० কি চা ० ० ० য়্ ०

I রা গা মা | পধপা মগা রগা I রা -া -া | সা -া -া I
হা হা র বে०० ডা० কে० বা ० ० ० য়্ ०

I মা মরা মা | পা পধা ধা I ধা পধা -র্সণা | -া -ধণধা -পা I
বি র० হী ডা হু० ক বঁ ধু० ० ० ० ००० ०

I পা -মপধা -পা | -া মগা রসা I রা রপা পা | -া -া -া I
কাঁ ०० ०দে ० আ० জি० উ ভ० রা ० য়্ ०

I {না না ধা | পধা না র্রর্সা I না -া -া | -া -া -া I
দি শি দি শি ঘ ন ঘো ० ० ० ० র্

I র্সা র্সর্গা র্রা | র্সা নধা না I না -া র্রা | র্সা -া -া I
আঁ ধা० র এ গৃ० হ মো ० ० ० ० র্

I পা -না র্সা | র্রা র্সনা র্সা I ণধা পা -া | মা মণা ধা I
শূ ० ন্য প রা० ণ ম० নে ० প্র বো ধি

I -পা গা পা | -মগা গরা -া II II
ব কি ० ব० লে० ०

এই গানটী লেখিকার অনুমতিক্রমে রেকর্ডের জন্য সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত। অতএব অন্য কেহ গান রেকর্ড করিতে পারিবেন না।

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যষ্ঠ স্তবক

অর্চনা দিদি,

তোমার চিঠিতে তোমার মনের সদাকৃতজ্ঞ ভাবটি এমন ফুটেছে! বড় সুন্দর ক'রেই তুমি বলেছ যে, যখন দুঃখ আসে তখন মানুষ প্রায়ই ভোলে যে সে চিরদিন কিছু দুঃখকেই পথের পাথেয় ক'রে চলে নি। এ আলো-আঁধারী জীবনপথে শুধু মরুই নেই সরোবরও আছে, শুধু কাঁটাই নেই, ফুলেরও দেখা মেলে।

খুব সত্য কথা। কিন্তু একথা আমরা প্রায়ই ভুলি কেন জানো দিদি? কারণ মানুষের মনোরাজ্যে একটা সহজ ঝোঁক আছে অকৃতজ্ঞতার দিকে। ৺পিতৃদেবের প্রতাপসিংহে ইরা শক্তসিংহকে বলছে এক জায়গায়:

ডালহ্রদ

"পিতৃব্য, সংসারে উপকার-গুলো কি কিছুই নয় যে অকাতরে ভুলে যেতে হবে, শুধু অপকারগুলোই রাখতে হবে চিরস্মরণীয় ক'রে?"

নিজের নানা ক্ষোভ দুঃখের সময় একথা কে না উপলব্ধি করেছে বলো, যে আমরা বেশি মনে রাখি সেই নিশ্বাসটির কথা যা টানতে ব্যথা লাগে—ভুলি দিনের পর দিন অগুন্তি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি কত আনন্দে। আরব সাধিকা প্রাতঃস্মরণীয়া রাবেয়ার জীবনী তুমি পড়েছ? না প'ড়ে থাকলে পোড়ো। সংসারে আমরা প্রতিপদে ভুলি ভগবানের নানা করুণা। মনে রাখি স্বকৃত কর্মফলের দুঃখটুকুই বেশি ক'রে। রাবেয়া তাই বলেছিল:

প্রতি দীরঘশ্বাসে
বহে মলয়-প্রীতি,
হায় দুখ-বিলাসে
তারি হারাই স্মৃতি।
যবে জলদ কালো
ঢাকে আকাশ-আলো
মোরা তারি তরাসে
ভুলি ওগো অতিথি,
তুমি মেঘ মায়া ছলে
আনো নীলিমা নিতি।

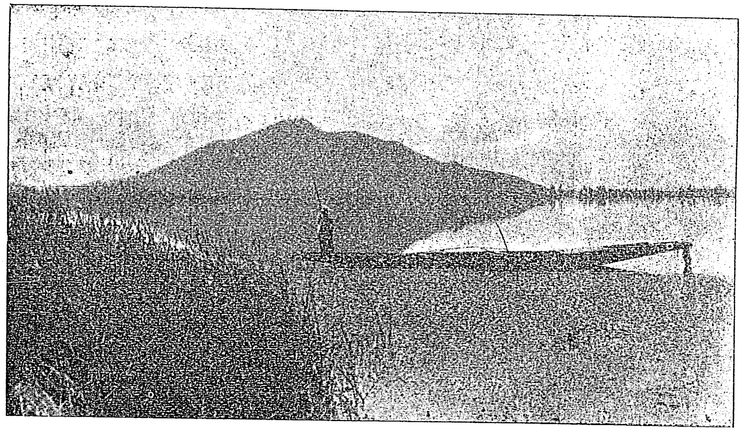

সত্যি আজো মনে পড়ে, রাবেয়ার জীবনী পড়তে পড়তে কৈশোরে বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠত, আশ্চর্য হ'য়ে মুগ্ধ হ'য়ে ভাবতাম: শুনি হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভগবৎভক্তির আলো নামলে কাঁটাকেও কাঁটা মনে হয় না, একথা কি সত্যি? যদি হয় তা হ'লে দাঁড়ায় যে, এ ধূলিবাস্তব দীন যন্ত্র-জগতে এমন চেতনা মানুষ লাভ করতে পারে যার প্রসাদে তীব্র বেদনাও গভীর আনন্দে রূপান্তরিত হয়। একথা অনেক দিন সম্ভব মনে হয় নি। কিন্তু পরে জেনেছি যে, এ সত্যিই সম্ভব। শুধু মানসিক বেদনাও নয়—তীব্র দৈহিক

বেদনাও নিবিড় আনন্দের অনুভবে রূপান্তরিত হ'তে পারে —শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন আমাকে একবার। এ তাঁর কাছে কথার কথা নয়, পরীক্ষাপ্রত্যক্ষ।

জীবনে বেদনা আনে একটা মস্ত সমস্যা। মানুষ যদি স্বভাবে আনন্দময়—অমৃতের সন্তানই হবে তা হ'লে বেদনা আসে কোন্ পথ দিয়ে? ধাঁধা লাগে বৈ কি প্রথমটায়! কিন্তু তবু এ-ও সত্য যে ক্রমে এই বেদনার মধ্যে দিয়েই আমরা বেশি ক'রে চিনে নিই শুধু আনন্দের মাধুর্যমন্ত্রই না, করুণার মর্মবাণীটিও। শুধু কল্পনায় নয়—জীবনের অনুভবলোকেও। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে, দুর্বিনীত উদ্ধত মানুষও ভগবানের চরণে সহজে নত হয় বেদনারই মন্দিরে। তাই তো যোগী সাধক মহাত্মা ঋষিরা সবাই

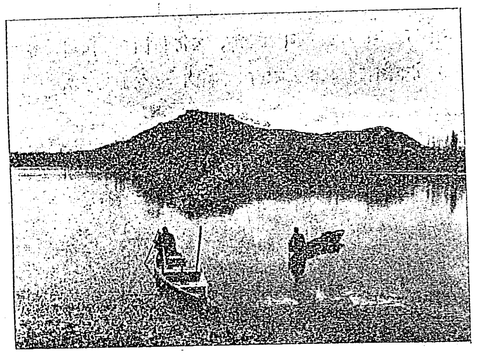

উলার হ্রদ—কাশ্মীর

বলেছেন: ভগবানের করুণা চাইতে হয় অশ্রুজলে। কারণ নিবিড় চাওয়াটাই হ'ল হৃদয়ের দুয়ার খোলা। অবিশ্বাসীরা বলে প্রায়ই—যদি ভগবানের করুণা আলো হাওয়ার মতনই আমাদের চারদিকে প্রবহমান, তবে চাইতে হবে কেন?—আমরা সেটা অনুভব করি না কেন? শ্রীকৃষ্ণপ্রেম এ প্রশ্নের বড় চমৎকার উত্তর দিয়েছেন তাঁর গীতা-ভাষ্যে: "একথা সত্য বটে যে বিধাতার করুণার আলো চির সমারোহে চলেছে আমাদের চারদিকেই, কিন্তু অন্ধকার গুহার মধ্যে ব'সে থাকলে তো সে-আলোর দেখা মিলবে না। বেরিয়ে আসতে তো হবে আমাদের কামনা বাসনা অহঙ্কারের তামস গুহা থেকে।" *

* The Yoga of Bhagabadgita.

সত্যি, দিদি, কাশ্মীরে যেন নতুন ক'রে চাক্ষুষ করেছিলাম বিধাতার এই করুণা—তাঁর রূপরাজ্যের প্রসাদে। কাশ্মীরের শোভা আমার চোখকে খুশি করেছিল মানি এবং এটা একটা কম লাভ নয় এ জগতে যেখানে প্রকৃতির রূপমঞ্জুষা প্রায়ই ঢাকা পড়ে শহুরে জীবনের মালিন্যে। কিন্তু কাশ্মীরের রূপরাজ্য আমাকে আনন্দ দিয়েছিল বেশি ক'রে এই জন্যে যে, তারই প্রসাদে জীবনের অনেক অসঙ্গতির বেদনা দূর হয়েছিল মুহূর্তে।

এ আমার একটা গভীর অনুভূতি। তাই বলতে চেষ্টা করি একটু।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির ভঙ্গি বদলায়—কে না জানে? কিন্তু কী ভাবে বদলায় এবার কাশ্মীরে গিয়ে যেন নতুন ক'রে টের পেলাম নরওয়ে ও কাশ্মীরের তুলনায়।

আমি এ পর্যন্ত যত সুন্দর দেশ দেখেছি তার মধ্যে রূপ-সম্পদে সেরা বলব দুটি দেশকে: নরওয়ে ও কাশ্মীর। নরওয়ের একটি ফিওর্ড ও কাশ্মীরের ঝিলমের ছবি পাশাপাশি ছাপতে পাঠাচ্ছি দেখো। ছবি থেকে অবশ্য বোঝা যাবে না এ দুটি দৃশ্যের মহিমা। কিন্তু এছাড়া তো আর বর্ণনার উপায় নেই। তাই ছবি দুটির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি কী বলো?

যা বলছিলাম। নরওয়েতে মনে আছে এক দিন একলা ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম আট মাইল। সে আনন্দের বাষ্পগোত্র হয় না। দুধারে—সময়ে সময়ে চারধারে—পাহাড়ের সহস্র শীর্ষে ঝল্‌কে উঠেছে অগণ্য সোনার মুকুট—প্রাতঃসূর্যের ছোঁওয়ায় জলে স্থলে লেগেছে আগুন। মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশ নীল মন্ত্র জপছে। নীচে ফিয়োর্ড তার নাগপাশে স্বর্ণনেত্রে দেখছে সে শোভা থর থর ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠে

বাড়ি যখন ফিরলাম মনে ঘোর লেগেছে। মানুষ যে একটা অন্য চেতনা। কিন্তু তবু সে চেতনার মধ্যে ছিল না তো অন্তরের কোনো প্রার্থনার সাড়া! মনে নি তো—এ বিধাতার করুণা! হয়ত তখন উচ্ছল যৌবনে মাদকতা রক্তে রথ চালিয়ে চলত ব'লেই এ আনন্দ আমার প্রাপ্য মনে করতে বাধে নি। সংসারে আমার কত পাওয়াই ব্যর্থ হয়, আমরা সে সবকে আমাদের প্রা ভাবি ব'লে—সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করি না ব'লে?—যি যা বলছিলাম, নরওয়েতে সেদিন আবেশ জেগেছিল, প্র

না। কিন্তু কাশ্মীরে মনের মন্দিরে প্রায়ই বেজে উঠত শাঁকঘণ্টা। এক একটা দৃশ্য দেখতাম আর মনে হ'ত এত আনন্দ পাবার আমি অযোগ্য। করুণার অনুভবের মধ্যে ফোটে এই দীনতার দিব্যদৃষ্টি, যেমন ফোটে যখন মানুষ গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে। শিখর ও গহ্বর যে হাত ধরাধরি ক'রে চলে সে এই করুণারই প্রসঙ্গে। গৌরবের সঙ্গে তাই তো আসে দীনতা, উল্লাসের সঙ্গে আসে নিজের অযোগ্যতার মধুর অনুভূতি। গভীর ভালোবাসার মুহূর্তেও তাই তো সব আগে মনে হয়—এর আমি যোগ্য নই, এ আমি পেতে পারি না—কেন না, এরই নাম বিধাতার বরদান। কাশ্মীরের উলার হ্রদে যেদিন সদলবলে অভিযান করেছিলাম সেদিনও এম্‌নি মনে হয়েছিল আমার। কৃতজ্ঞতায় মন যেন নুয়ে পড়েছিল। ব্রাউনিঙের কবিতার একটি চরণ মনে গুনগুনিয়ে উঠেছিল গানের সুরে: This earth's heart-choking magic. সত্যি ভাব লাগে।

মনে পড়ে ঝিলমে নৌকায় সেদিন পাড়ি দেওয়া। শ্রীনগর থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল মোটরযোগে গিয়ে ফের ঝিলমে ধরতে হয় মোহানার কাছে। এ পথটুকুরও তুলনা নেই। আকাশে আলোর রাগালাপের সঙ্গে নদী চলেছে তাল দিয়ে। দুপাশে চেনার উইলো আর কত ঝিকমিকে গাছ সুরু করেছে সবুজের জয়ধ্বনি, আর উপরে নীল আকাশ রয়েছে চেয়ে। ধরণীর আনন্দে অধরারও সায় উঠেছে বেজে সোনার মৃদঙ্গে। মনের কোলে বিছিয়ে গেছে গৌরব ও শান্তি। মনে পড়ে লায়নেল জনসনের:

Could we but live at will upon this
perfect height!
Could we but always keep the passion
of this peace!

মনটার চারিপাশে যেন জড়িমার লেশও নেই আর। হঠাৎ দেখা যায়, একটা বিরাট সমতল হ্রদ। জলে জলময়। নদী গিয়ে মিশেছে হ্রদে। হ্রদের ওপারে শুভ্র তুষার মুকুট ও পিঙ্গল তনু পর্বতশ্রেণী ঢেউ খেলে নেমেছে। এধারে খোলা মাঠ ও গাছপালা। সে যে কী দৃশ্য দিদি—ব্যাপ্তি তার মন্ত্র—যেও একবার। তোমার আর ভাবনা কী বলো—চলো বললেই লোকলস্কর নিয়ে যেতে পারবে। যা দেখবে ভুলবে না কোনো দিন। দেখতে দেখতে মনে হয় কেবলই ব্লেকের আক্ষেপ:

If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as infinite. For man has closed himself up, till he sees all things through narrow chinks of his cavern.

হৃদয়-দুয়ার খুলে দাও—খুলে দাও।
দেখ—প্রতি ধূলিকণা অনন্ত-উধাও।

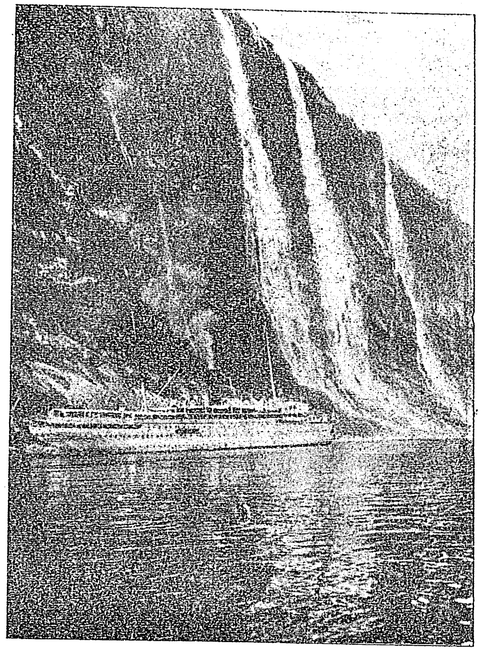

নরওয়ের ফিওর্ড

গৃহকারাবন্দী রহি' মানি' পরাজয়
ভুলি মোরা—বিশ্বলীলা আনন্দ-তন্ময়।

কাশ্মীরে এ-অনুভব প্রায়ই হ'ত। নরওয়েতেও হ'ত, কিন্তু ঠিক এভাবে না। তাই কাশ্মীরে আমার প্রথম প্রথম দিনগুলো কাটত যেন মণি কুড়িয়ে। প্রতি দৃশ্যই শিহরণ জাগিয়ে চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরত যেন নব নব আনন্দলোক। মনে পড়ে একদিন প্যাট্রিক নিয়ে

গেল আমাদের পরীমহলের পাহাড়ে। লীলা, এষা, হাসি ও আমি সঙ্গে উঠলাম চূড়ায়। এখানে আগে ছিল একটি প্রাসাদ। তার ধ্বংসশেষ রয়েছে। কিন্তু এ স্থানটির মাহাত্ম্য এর ঐতিহাসিকতায় নয়—যদিও পরিমাণ নাকি ঐতিহাসিক স্থান—কী সব কাণ্ডকারখানা আমি শুনতে শুনতেই ভুলেছিলাম। মনে যার রেশ রইল সে হচ্ছে এখান থেকে নীচের দৃশ্য। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের শিখর থেকেও শ্রীনগরের দৃশ্য দেখা যায়—তবে সে আরো উদার ব্যাপ্তি। পরীমহল থেকে ডাল লেকের দৃশ্য তেমন মহীয়ান নয়, তবে কোমল। উদার নয়, তবে মনোহর। কি রকম জানো? শ্রীনগরের রূপতনুর একটা দিকের চমক—একটা

নরওয়ের ফিওর্ড

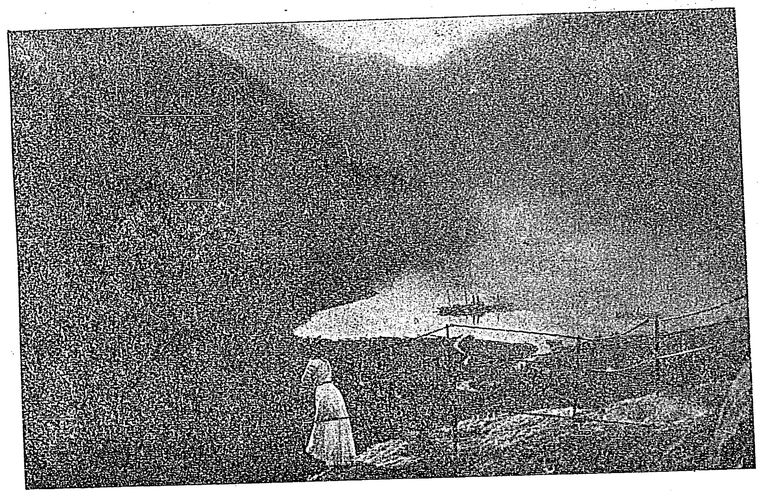

পাশের আত্মপ্রকাশ। এক একটি সুন্দরী মেয়েকে এক একটি কোণ থেকে ভালো লাগে, তার এক একটা বিশেষ ভঙ্গিই তখন ফুটে ওঠে। পরীমহল থেকে কাশ্মীরের এম্‌নিতর একটি ভঙ্গি ফুটেছিল। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের শিবমন্দিরের বিস্তীর্ণ গাম্ভীর্য না—এ যেন—কি বলব—তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী? হ্যাঁ, অনেকটা ঐ রকমই।

কিন্তু চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। তাই দুঃখও পেয়েছি বৈ কি ওদেশে। যেমন সেদিন গেলাম রেনাব ওখানকার চশমোশাহি, নিষার ও শালিমার বাগান দেখতে। দুঃখের চেয়েও বেশি হ'ল অনুতাপ: যে সেদিন নাহক ছুটোছুটি ক'রে সব হারালাম।

দিদি, তোমার কেমন লাগে—এই যা কিছু দেখবার আছে দেখ-দেখ-দেখ-ভাবটা? এই I have done it মনোভাব? আমার যে কী যন্ত্রণা হয় বলতে পারি না। বলো তো, দেখি আমরা কী জন্যে? ভোগের জন্যে তো? কিন্তু যখন টুরিষ্ট হই তখন দেখি একেবারে উল্টো উদ্দেশ্যে: স—ব দেখেছি এই ডাক ছাড়তে জাঁক করতে। সেদিন যদি একটি বাগানে চুপ ক'রে ব'সে থাকতাম মন উঠত কানায় কানায় ভ'রে। কিন্তু বাসে ক'রে তিন তিনটে অপরূপ সুন্দর বাগানে বিত্তবান্ প্রত্যাশীর মতন নমো নমো ক'রে পূজা সাঙ্গ ক'রে ফের —উঃ, নিজের উপর সেদিন যা ধিক্কার হয়েছিল কী বলব! এর নাম দেখা? বাড়ি ফিরে সত্যি অনুতাপ হ'ল। মনে হ'ল, জাপানীদের কথা। ফুলের কেউ অনাদর করলে তারা বিষণ্ন হয়, সত্যি সত্যি মনে করে এতে ক'রে সুন্দরের অপমান করা। আমরা সেদিন কাশ্মীরের বাগান তিনটিকেই এইভাবে অমর্য্যাদা ক'রে যেন পর পর কাণ ম'লে বাড়ি ফিরে ভাবলাম—আঃ, কী বাহ ছুরিই না ক'রে এসেছি—যা দেখবার স—ব দেখে নিয়েছি নক্ষত্রবেগে।

মনের কোণে এ-বাহবা এখনো ওঠে সলজ্জে ক... করছি। কিন্তু মন খুশি হ'লে হবে কি—অন্তর একেবারে ছি ছি ক'রে ওঠে যে। একেই বলে মার্কিন যাযাবর নোটবুক হাতে ক'রে টুকে রাখা—স্বগত হাঁক দে... জন্যে—অমুক দেখলাম তমুক দেখলাম। পরীমহলে গি... ফিরেছিলাম আত্মপ্রসাদ নিয়ে। কাশ্মীরের বাগান তি... দেখে ফিরলাম গভীর আত্মধিক্কার নিয়ে: সুন্দর জিনিস সত্যি অপমান ক'রে ফিরলাম। হুড়োহুড়ি ক'রে মজা ক...

এলাম—ভুলে গেলাম এদের প্রণামী দেওয়াটাই পড়ল বাদ। অন্তর ছি ছি করবে না তো কি গাইবে—"দেখেছ তুমি শুনিয়া ধন্য ধন্য ধন্য হে?"

নিশার বাগ—শ্রীনগর

তবে জীবনে অনুতাপ তো সব সময়ে সাজা হ'য়ে আসে না দিদি—অনেক সময়েই আ... বর হ'য়ে। কারণ আত্মগ্লানির আলোতে আসে চিত্তশুদ্ধি। আমারও এল: আমি সেদিন মনে মনে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করলাম—টুরিষ্ট-বৃত্তি আর না—তাতে যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব। এল প্রলোভনের পরীক্ষা: সবাই ধরল—পাহালগাঁ যেতে হবেই হবে। শ্রীনগর থেকে যাট মাইল দূরে এই শ্রীমন্তিনী বিরাজমানা। আমি বললাম, যদি যেতে হয় তো সেখানে রাত কাটাব—বাসে হৈ হৈ ক'রে গিয়ে সাততাড়াতাড়ি পাহালগাঁ চক্র দিয়ে তক্ষণি ফেরা—ওতে আমি নেই—তবে যার অভিরুচি যাক, আমি বজরায় ব'সে পরমানন্দে গান বাঁধব একেবারে একলা। শুধু তাই নয়, পরে পেশোয়ারে গিয়েও এ-প্রতিজ্ঞা ভাঙি নি—দেখি নি খাইবার পাস—মোটরাদির হাজারো সুবিধা থাকা সত্ত্বেও। বললাম—কী হবে খাইবার পাশ দেখে? তার চেয়ে যাই মহাত্মাজীর কাছে। তবে না আমার হারানো আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছিলাম দিদি। তুমি আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো আর যেন কখনো এভাবে হৈ হৈ ক'রে সুন্দরের অপমান না করি। সুন্দরকে দেখতে চাই যেন জীবনে রূপেশ্বরের প্রসাদ পেতে। টুরিষ্টবৃত্তির কর্মভোগ হে চতুরানন, অতঃপর শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

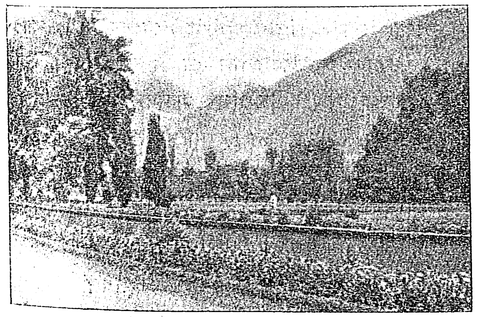

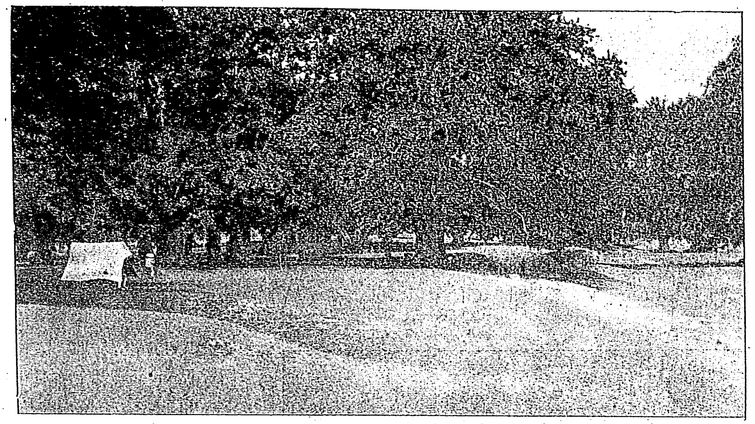

নিশার বাগ—শ্রীনগর

এ থেকে আরো একটা মস্ত লাভ হ'ল। আমি বুঝতে পারলাম—এ দশ বৎসর নির্জনবাসে কত বদ্‌লে গেছি। এখন আর ভালো লাগে না এ ধরণের হট্টগোল। যাদের ভালোবাসি তাদের স্নেহসঙ্গ ভালো লাগে, হাসির গান ভালো লাগে, এষার নাচ ভালো লাগে, লীলার প্রফুল্লতা ভালো লাগে, ধরণীদার ভ্রমণ-প্রতিভা ভালো লাগে, মায়ার কলহাস্য ভালো লাগে, প্রভাদির স্বভাব-মাধুর্য ভালো লাগে, মানুদার রসিকতা ভালো লাগে—কিন্তু ভালো লাগে না আর এই ভিড় ক'রে হৈ হৈ করা। সুন্দর দৃশ্য এখন দেখতে চাই নির্জনে—প্রণাম করতে। তার মধ্যে পেতে চাই ধ্যানের স্পর্শ—বাঘের সিংহনাদ না। এক কথায় জীবনে অসুন্দরতাই চোখে পড়ে বেশি—কাশ্মীরের মতন সৌন্দর্যনিকেতনে চাই তারই ক্ষতিপূরণ, কিন্তু কলরবে কোলাহলে না—ভগবানের করুণাকে গভীর ভাবে পেতে। শ্রীঅরবিন্দের কথা কেবলই মনে হ'ত কল্পলোকে ভগবানের বিভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ রূপে। রূপের

মধ্যে দিয়ে তাই তাঁকে আরো বেশি পাবার কথা—সেইখানেই না রূপের পরমতম সার্থকতা। কিন্তু এ সার্থকতার আস্বাদ পাওয়া যায় কি পিকনিকে পার্টিতে বাসে বিদ্যুৎগতি ব্যস্ততায়? এ আনন্দের জন্যে চাই যে সমাহিতি, নীরবতা, অবসর। বেশি দেখতে আর সাধ নেই—তাতে লাভও নেই লোভও না। তবে যেটুকু দেখব তার আশে পাশে যেন অবকাশের অলস শান্তি থাকে।

এসব হট্টগোলের পরে গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম (বোধ করি, অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত যথোচিত হয়েছিল ব'লে) কাশ্মীর থেকে বিদায় নেওয়ার আগের দিনে সন্ধ্যায়। পরদিন ছাড়ব কাশ্মীর—পাড়ি দেব পেশোয়ারে, মনটা ছিল সকরুণ। না, ভুল বলেছি। সে ভাবকে ঠিক করুণ

শালিমার বাগান—শ্রীনগর

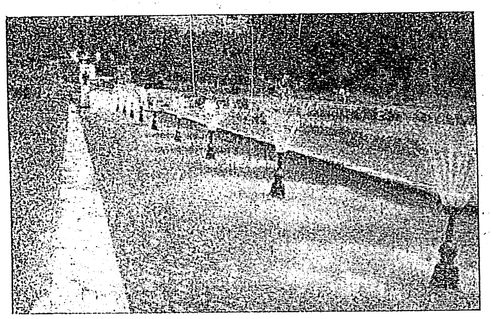

বলাও যায় না—আসন্ন বিরহের লগ্নে যে উদাস ভাব ঘনিয়ে আসে অনেকটা তারি সুর। সন্ধ্যাবেলা নৌকা ছেড়ে বেরুলাম একলা যেমন প্রায়ই বেরুতাম। আমার একলা বেড়াতেই ভালো লাগে, বিশেষত সুন্দর রাজ্যে। সুন্দরকে আমার মনে হয় প্রেমাস্পদ, জনতার কল্লোলে তার সঙ্গে লেন-দেন চলে না। সে-শুভদৃষ্টি নিঃসঙ্গ লগ্নের অপেক্ষা রাখে যে-লগ্নে আবছায়া বিষাদের সুর মনে বিছিয়ে যায় আলোর মতন। কেবল তখনই প্রকৃতির শান্ত চাহনি খুলে বলে তার মনের কথাটি। বড় লাজুক তার বাণী শুভ্রা কুমারী মেয়ের অন্তরের কথাটির মতন। তাকে দিয়ে বলাতে হয়—অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে—নইলে সে ধার দেবে কেন? আমার বড় ভালো লাগে দিদি, তন্ত্রের কুমারী-পূজা। কৌমার্যের মধ্যে যে পরম সুন্দর পবিত্রতা রয়েছে তার স্পর্শ আমাদের বড় দরকার। বিবেকানন্দ একবার এই কাশ্মীরেই কুমারী পূজা করেছিলেন মন্দিরে। যাকেই আমরা পূজা করি, তার সত্তার কিছু না কিছু ছোঁয়াচ লাগে আমাদের সত্তায়। তাই আমি আজও সর্ব্বান্তঃকরণে পৌত্তলিক—বিবেকানন্দের কথায় আমার সমগ্র প্রাণমন সাড়া দেয় যে: "প্রতিমাকে ভগবান্ বলবে বৈ কি—কেবল ভগবানকে প্রতিমা বোলো না।" পরমহংসদেবের বাণীও আমার হৃদয়ে শিহরণ তোলে: "মাটি কেন গো—চিন্ময়ী প্রতিমা!" দিদি, সত্যের পরখ না-মনগড়া থিওরিতে না-ডগমাতে, সত্যের কষ্টিপাথর হ'ল অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি—experience. লক্ষ লক্ষ নরনারী সাধুসন্ত ভক্তযোগী মহাত্মারা প্রতিমা পূজায় পেয়েছেন ভাবের আবেশ; ভক্তির উচ্ছ্বাস, প্রেমের আনন্দ। শ্রীঅরবিন্দ বছর তিনেক আগে আমাকে একটি পত্র লিখেছিলেন জহরলালের সম্বন্ধে:

"I do not take the same view of the Hindu religion as Jawaharlal. Hindu religion appears to me as a cathedral-temple half in ruins, noble in the mass, often fantastic in detail, but always fantastic with a significance—crumbled and wearisome in places, but a cathedral-temple in which Service is still done to the Unseen and Its real Presence can be felt by those who enter with the right spirit."

কত সত্যি কথা। যাঁরা নরপূজা, প্রতিমা পূজাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাঁরা এ-পূজাকে ঠিক চোখে (in the right spirit) দেখেন না। কারণ, এ আমি প্রত্যক্ষ অনুভবে জানি যে গুরু, প্রতিমা, ছবি, বিগ্রহ প্রভৃতির পূজা চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে—এ সবে শুষ্ক মনে নামে প্রেমের ঢল। নামে—কেন না ভগবান ভাবগ্রাহী, তার্কিক থিওরি নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। কুমারী পূজায়ও তাই পূজারী প্রত্যক্ষভাবে পায় (যদি ঠিক মতন চায়) চিরকৌমার্যের পবিত্রতার স্পর্শ—যেটা হ'ল কুমারীপূজার অন্তর্বাণী। ভাবছ এ উচ্ছ্বাস? না। এ আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাই নাস্তিক্যবুদ্ধি একথায় হাসলে আমি আরো হাসি। কল্পনাই ভয়তরাসে—পাছে

লোকে তাকে বিশ্বাস না করে। সত্য উপলব্ধি অকুতোভয়।

সত্যি, সেদিন অস্তগোধূলির স্বপ্নালোকে আমার মনটা এসেছিল গাঢ় হ'য়ে। ঝিলমের সর্পতনু চলেছে এঁকে বেঁকে প্রতি বাঁকে নতুন নতুন দৃশ্য, ঝলকে তুলে: এখানে তুষারাবৃত শিখর মহিমা, ওখানে মন্দির, সেখানে তরুবীথিকা। আর পায়ের নীচে নেচে চলেছে অশ্রান্ত-নটিনী ঝিলম তার সুষমার নূপুর প'রে ধীরচ্ছন্দে—স্ব-প্নালোকে। এখানে ওখানে পাহাড়ের বাঁকে তন্দ্রালসা মেঘনারীর এলানো দেহ। গোধূলির আলোতে মন ভ'রে এল এ উদাস পরিবেশে। এক একটা দৃশ্য আছে যারা আয়নার মতন কামনা

গুলমার্গ

নিজেকে মেলে ধরে—তার পটে ফুটে ওঠে নিজের বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নভঙ্গের ছবি। বিদায় সন্ধ্যায় কাশ্মীরের এই রূপভঙ্গিটি তেম্‌নি আয়নার মতন চিকিয়ে উঠেছিল যেন। তাই হঠাৎ মাটিতে ব'সেই লিখলাম:

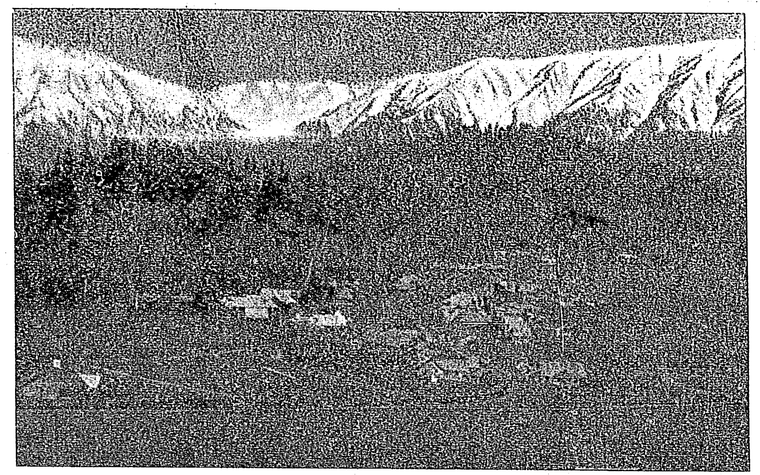

ঝিলমের বাঁকা-নদী-আঁকা ছবিখানি ধীরে ধীরে
ম্লান হ'য়ে আসে আধজাগরণে স্বপ্নসম ফিরে
ফিরে চাই শৈলশিখরের পানে—যেথা ঢেউ হ'য়ে
মেঘের অসাঙ্গ দোলা অফুরন্ত তরঙ্গের লয়ে
নব নব রূপ ধরে।
দীর্ঘচ্ছায়া তরুবীথিকার
কায়া ফলি ছায়া-জল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বার বার।
বিদায়লগ্নের বেলা মনে হয়—জীবনের পথে
সৌন্দর্যের কত রাগ বেজে গেছে আলোছায়াব্রতে
এমনি অস্তাভ ছন্দে। উন্মুখ আগ্রহে মর্ম্মপুরে
বরণ করেছি যারে—এমনিই স'রে গেছে দূরে।
সুষমা! তোমারে আমি জীবনে চেয়েছি প্রতিদিন।
কামনার গাঢ়বন্ধে রাখিতে পারিনি ধ'রে। লীন
হ'য়ে গেছে অঞ্জলির বন্দীজলসম তব সুধা,
দেখা দিয়ে মরীচিকা সম শুধু বাড়ায়েছে ক্ষুধা—
অধরা দেয়নি ধরা। চুম্বনের পেয়েছি আভায
অধরবঞ্চিত ভালে। সুনিবিড় হয়েছে পিয়াস।
শুধায়েছি—"প্রশ্নপথে আছে কি নির্ঝর-অঙ্গীকার?
আকুল আশার দোলে জ্যোতির্ময়ী করে কি বিহার?"
কে যেন গেয়েছে গান—"চাওয়ার মন্ত্রেরি মাঝে প্রিয়
বাঞ্ছিত ঝঙ্কারে কাঁপে।" শুধু হায়, নেয়নি আজিও
সে-ঝঙ্কার সঙ্গীতের পূর্ণধ্বনি-সার্থকতা। তবু
এনেছে সে বহি' আলোকের পূর্বরাগ কভু কভু
অন্তরের অঙ্গুরীয়-অঙ্গীকারে। হয়েছে বাগ্দান,
মিলেনি মিলনসিদ্ধি। তবু জানি—মিলেছে সন্ধান
বেদনারি আন্দোলনে বারবার।
আজি এ-প্রণতি
সুরে তাই প্রার্থি: "ওগো প্রার্থনীয়, তোমার আরতি
দীপখানি রেখো মোর বেদনার মন্দিরে জাগায়ে
লক্ষ রূপোৎসব মাঝে। কলোচ্ছ্বাসে রূপেশ্বর পায়ে
রেখো মোরে ধ্যানমৌন। রেখা রঙে গানে আলাপনে
তোমার স্মরণশিখা জ্বলে যেন অনির্বাণ মনে।
যত আকর্ষণলীলা বাহিরের দিকে যায় নিয়ে
কোরো তব কেন্দ্রমুখী। অচিহ্নিত পথে চিহ্ন দিয়ে

কোরো ধ্রুবসুখী এজীবন। উদ্‌ভ্রান্তির ঢেউদোলে
নিয়ে যেয়ো গভীরের অকল্লোল শান্তিস্নিগ্ধ কোলে।

*　*　*　*　*

ওখানে ভারি অভাবনীয় ঘটনা ঘটল যেদিন উলার হ্রদে যাচ্ছিলাম। বলেছি, নদীপথে নৌকা ক'রে পাড়ি দিচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ঘাটে দেখি একটা প্রকাণ্ড বজরা বাঁধা। মনে হ'ল কে এ রসিক পুরুষ যে এমন সুন্দর ঘাটে নৌকা রেখেছে—

যেথা সুষমা নয় ক্ষণ-অতিথি, দুঃখসুখসাথী,
যেথা তটিনী আলোছায়ার গান গায় দিবসরাতি,
যেথা এপারে ডাকে শ্যামল শোভা, ওপারে ডাকে গিরি,
যেথা তুষার-চূড়া আকাশ ছোঁয় মেঘের ব্যূহ চিরি',

পাহাল গাঁ

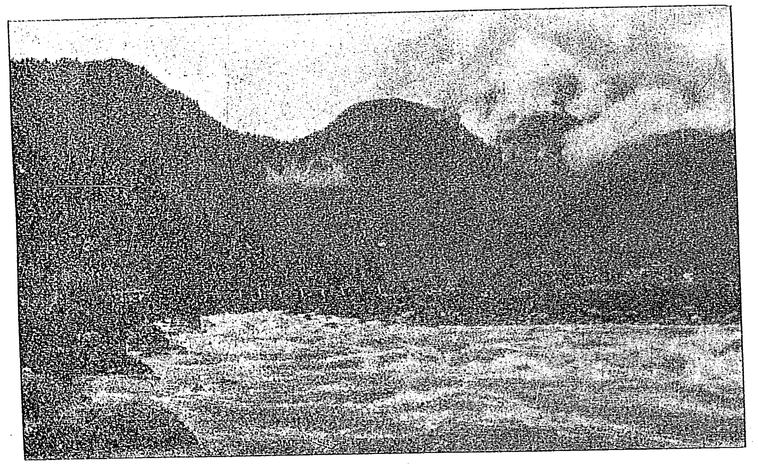

যেথা বীথিকা দোলে সবুজ লতাপাতার শাড়ি পরি'
যেথা জীবন ভোলে ধূলিবেদনা ফুলচেতনা বরি'!

এমন সময় দেখি, একটি সুদর্শন যুবক সেই নৌকা থেকে আমাদের নৌকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। দ্রষ্টা—পুরুষ, কাজেই ভাবলাম বুঝি এরা কিম্বা মায়া কিম্বা প্রভাদির পরেই তার অখণ্ড অভিনিবেশ। কিন্তু দেখি কি—তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিবাণ আমাকেই করছে নিশানা! কিমাশ্চর্যমতঃপরম!! আমি তাকাতেই সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল: "Isn't that Dilip Ray?"

চমকে গেলাম। একটু প্রীত বোধ করেছিলাম বললেও আশা করি ক্রটি নিজগুণে মার্জনা করবে দিদি—যেহেতু তুমি ভক্তিমতী হ'লেও রসজ্ঞা।

নামতে হ'ল তার ওখানে। না "পধারলে" ছাড়েন না। বন্ধুর নাম জ্যোতিপ্রকাশ। মস্ত জমিদার। লক্ষ্ণৌ ও সাজাহানপুরে বিপুল সম্পত্তি। (সেখানেও সবাইকার নিমন্ত্রণ হ'ল দেখতে দেখতে) কাশ্মীরেও জমিদারী যথেষ্ট। বললেন: "ঘাটে ডিঙা লাগায়ে সবাই পান খায়ে যান।"

পান ব'লে পান! তাজা সাজা পান—যথাবিধি সুরভিত
স্নিগ্ধ আদর হাসি-সিঞ্চিত—কে না হ'ল পুলকিত!
তবে পুলকেও সবাই কিছু এ-ভুবনে সমান নয়
"ক"-য়ে প্রহ্লাদ শোনেনি ক-কার, শুনিল "কৃষ্ণজয়।"

কাজেই তাম্বুলানন্দে লীলার প্রাথর্যের সঙ্গে আমাদের আনন্দ যে উপমিত হ'তে পারত না এ আশা করি বলতেও হবে না। রেণীদা আমাকে বলল ফিশ্‌ ফিশ্‌ ক'রে: "দিলীপ, ভাই লক্ষ্মীটি, একটু চোখ রেখো—মূর্ছা না যায়। একেবারে অথই জল এখানে।"

দিদি, তুমি খানিকটা দার্শনিক। তাই জানো মানুষ তার আনন্দের প্রকৃত পরিচয় পায় আনন্দবৈষম্যের মাঝে। অর্থাৎ তুলনা ক'রে তবে। লীলার তাম্বুলানন্দ দেখলে বোঝা যায় সে এ-আনন্দের স্বরূপ আরো জেনেছিল কাশ্মীরী সৌন্দর্যের মাঝে। কাশ্মীরের রূপরাস সে সত্যিই ভালোবাসত। কিন্তু সে ভালোবাসা কেমন? না, নিঃসন্তান বধূ যেমন পরের শিশুকে ভালোবাসে। কিন্তু যখন তার কোল জুড়ে আসে নতুন অতিথি, তখন সে বোঝে না কি আর যে—

অভ্র যদিও করে ঝিকিমিকি—লাগে বড় বিস্ময়!
কিন্তু বিজলি ধাঁধিলে নয়ন কে গাহে জোনাকি-জয়?

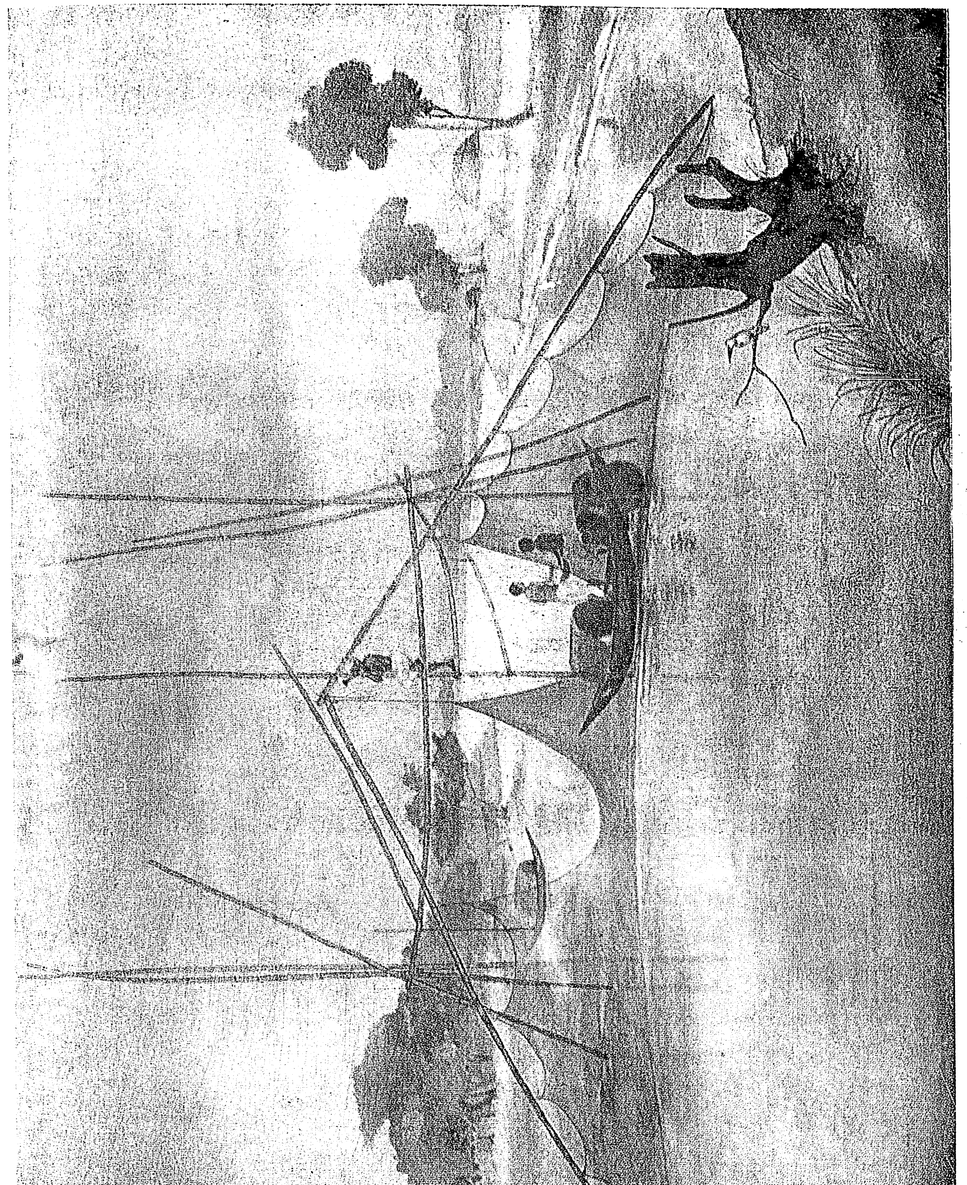

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

মৎস্য শিকার

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর নাগ

"অথ, লহ পাঠ," উছসিয়া লীলা বলিল, "কি জানো ভাই ?
আপন যে কত আপন জানিতে পরকেও জানা চাই ।"

* * * * *

কিন্তু লীলা বাদে আমরা বাকি সবাই মুগ্ধ হ'লাম বেশি জ্যোতিপ্রকাশ-জায়াকে দেখে। সত্যি এমন পরমাসুন্দরী বধূ কদাচ চোখে পড়ে। আর মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে—এ-ই তার পরিবেশ।

আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে দিদি, যে প্রতি রূপসী মেয়েকেই দেখতে হয় তার নিজের পরিবেশে। জ্যোতিপ্রকাশিনীকে যেন হঠাৎ দেখলাম ওর সহজ পরিবেশে। তাই সবারই যেন কি রকম চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমার জ্যোতিমুগ্ধতায় লীলা যে কী খুশি! গানের শোধ তুলল এবার চুটিয়ে। যা ক্ষেপাতে লাগল! সলজ্জে স্বীকার করতে হ'ল মুগ্ধ হয়েছিলাম শ্রীমন্তিনীর অসামান্য রূপজ্যোতিতে। কিন্তু শুধু রূপই নয়। তার হাসি, অতিথিবৎসলতা, তার চাহনি, সহজ অথচ লাজুক অভ্যর্থনা—কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই, অথচ জাহিরিপনারও লেশ না—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন মেয়েলি মাধুরী ওরফে হ্লাদিনী মূর্তি। সব জড়িয়ে সে উঠেছিল ছবিখানি হ'য়ে, ছবির পরিবেশে ছবি :

রঙটি যাহার ফলে শুধু মেঘে, মনের আকাশে যেই
রঞ্জিতে যাও—অমনি উধাও, এই ছিল—এই নেই!
'চিনি চিনি' করি মাধুরীমেলায় করি বিকিকিনি যেই :
খুশি প্রাণ বলে : "পেয়েছি", অমনি গান বলে : "কই, নেই!"

রাজদম্পতি পরে শ্রীনগরেও এলেন বৈ কি। বলাই বেশি, আমাদের বজরায় শিকারায় তখন গানবাজনা শুধু জ'মে উঠল না—উঠল জমাট হ'য়ে। ষোলোকলা সম্পূর্ণ একেই বলে। কারণ ওরা যে শুধু অমায়িক সুদর্শন ও মিশুক তা নয়, তার ওপর গানভক্ত—লক্ষ্ণৌয়ের লোক খানিকটা সমজদারিয়ানাও আছে রক্তে মিশে। জ্যোতিপ্রকাশকে বলা চলে গানপাগল। কী রকম গান ভালোবাসে একটা দৃষ্টান্ত দেই। বলল আমাকে কবে লক্ষ্ণৌয়ে শুনেছিল আমার মুখে একটি গজল বার বৎসর আগে। কোন্ গানটি জানো ?—যেটি গ্রামোফোনে শুনে তোমার চোখে জল আসে ব'লে তোমার মেয়ে ফাঁশ ক'রে দিল—সেই—

তু নে ক্যা কিয়া মুঝে বতা তো সহি
মেরা টেন গয়া মেরি নিদ গয়ি হো।

গান শুনতে শুনতে জ্যোতিপ্রকাশের মুখ চোখ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। প্রকাশিনীরও। কাজেই বুঝতে পারছ ভাব হ'তে খুব দেরি হয় নি। কাশ্মীর থেকে পেশোয়ার রওনা হওয়া একদিন পিছিয়ে গেল—ওরা না খাইয়ে কিছুতে ছাড়বে না। ওদের বজরা ছিল প্রায় চৌদ্দমাইল দূরে, ওরা আসত মোটর যোগে। ঠিক হ'ল পেশোয়ারের পথে ওদের বোটে প্রাতরাশ সেরে তবে পাড়ি দেওয়াই বিধি—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে সুখায়।

বলা বাহুল্য এতে আমরা কেউই খুব ম্রিয়মান হই নি। তাই লিখেছিলাম দিদি—স্বভাব সম্পর্কে—যে, স্বভাব শাসন করলে হবে কি, সৌন্দর্যময়ী যখন বলেন আমি কিছু দিতে চাই নেবেন ?—তখন খুব বর্বর না হ'লে "বিলক্ষণ" ব'লে হাত পাতা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। থাকে কি ? তুমিই বলো না ভাই। আনাতোল ফ্রাঁসের একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়—পুরুষরা স্বভাবতই একটু মোলায়েম ভাষায় বললে বলা যায় "বেদরদী", খাঁটি ভাষায়—বর্বর, মেয়েদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে তবেই সে শেখে সভ্য হ'তে।

আমি আর একটু জুড়ে দিই : সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে পুরুষের সভ্য সংস্কৃত হবার ভেলসিটি আরো বাড়ে। জ্যোতি প্রকাশিনীর আবির্ভাবে একথা সবাই অনুভব করল। আমরা সবাই প্রায় দেবদূতের মতন অনিন্দ্য ব্যবহার করতে সুরু করলাম। এমন কি, অমন গম্ভীর শিভুর মুখেও ফুটে উঠল সুধামাখা হাসি। দেখেশুনে রসিক মান্নুদা বলল :

ওগো শীতাংশু চন্দ্রমা-হাসি কোথা রেখেছিলে গুপ্ত ?
হেন প্রীতিপাখি বৈরাগ্যের কোন্ নীড়ে ছিল সুপ্ত ?
রোজ বলো তুমি—আপিস আপিস, এখন কোথা
সে রইল ?
একদিন দেরি হ'ল—তবু হাসি ঝর্ণা কেমনে বইল ?

কিন্তু আমি শীতাংশুর দিকে—শুকদেবদের দিকে যে থাকে থাকুক। সেদিন কি একটা বইয়ে পড়ছিলাম যে, যে রূপের চমক সহজ নয়—সে শুধু নিজেকে জানান দিতে না দিতে চায় সাড়ার নজর। আর চাইতে না চাইতে সবাই শশব্যস্ত হ'য়ে হাজিরি দেয়। না দিলে রক্ষে আছে ?

বাস্তবিক কাশ্মীরে গিয়ে এই কাশ্মীরী সুষমাময়ীর রূপপূর্ণা ও অন্নপূর্ণা মূর্তি একত্রে না দেখলে মনে হয় কোথায় একটা ফাঁক থেকে যেত।

* * *

সত্যি, কাশ্মীর থেকে বিদায়ের পালা সুরু হ'তে কষ্ট হ'য়েছিল বৈ কি। শুধু নিসর্গ সৌন্দর্যই তো নয়—কত সুন্দর ব্যবহার, কত সুন্দর কথাবার্তা, কত সুন্দর নাচগানের স্মৃতি জড়িয়ে রইল কাশ্মীরের সঙ্গে। হঠাৎ এত রকম আনন্দ যে একসঙ্গে পাব ভাবি নি। বিশেষ ক'রে ধরণীদাদের জন্যে। এত আনন্দে কাটত দিনগুলি। কাশ্মীরে দল বেঁধে যেতে হয় তো এম্‌নি বন্ধুর সঙ্গেই যাওয়া চাই। সবাই স্নেহ পরিচর্যায় আমাদের যেন ঘিরে রেখেছিল—শুধু ধরণীদা, প্রভাদি, লীলা হাসিরাই নয়—দুনিচাঁদ, তন্দ্রা দেবী, মেরি, প্যাট্রক, জ্যোতিপ্রকাশ, প্রকাশিনী, আরো কত লোক।

সময়ে সময়ে ভারি কৃতজ্ঞ মনে হ'ত জীবনদেবতার কাছে। মনে হ'ত এত শত পাই তাঁর কাছে নিত্যই, তবু কেন ভুলি বেদনার মুহূর্তে! (তুমি বলেছ একেবারে লাখ কথার এককথা দিদি, জয় তোমারি জয়।)

ভুলি। অথচ ভুলিও না। কেমন করে ভুলব? যে-পরশে যে-প্রলেপে অন্তরে স্নিগ্ধতা গেছে বিছিয়ে সে কি ইচ্ছা করলেও ভোলা যায়? হারীনের একটি অপরূপ কবিতায় আছে—যে-বাতি একবার জ্বলে সে নিভেও নেভে না। মানে, তার আলো প্রভাতী রবিরাগের মতন মনের গোপনে কিছু না কিছু ফুল ফুটিয়ে তবে যায়। তাই সে আলো নিভলেও তার দান হ'য়ে থাকে চিরন্তন। কোনো সুষমার অনুভব, কোনো স্নেহের উপলব্ধি, কোনো আনন্দের আবেশই তাই ক্ষণজীবী নয়। তবে—ব্লেকের কথা ফের মনে হয়—চেতনা খানিকটা না জেগে উঠলে এধরণের কথা ঠিক বোঝা যায় না—কেন না, চেতনার দীপ্তি একটু গভীর না হ'লে খুব স্পষ্ট দেখা যায় না মনের কত বালুচরে বইল কত ঢেউ, প্রাণের কত আঁধার গুহায় জাগল কত জ্যোতি।

* * *

তাই তো আমি আরো দুঃখ পাই দিদি, যখন বন্ধুদের মুখে শুনি তারা চায় রকমারি চীজ—কিন্তু ভগবানকে না। ভগবানকে না-চাওয়া মানে চেতনায় অসীমের দীপ্তিপরশ না চাওয়া, অর্থাৎ নিঃসম্বল হ'য়েই থাকতে চাওয়া দিনের পর দিন দিনগত পাপক্ষয় ক'রে। অথচ যারা চায় না তারা জানেও না কী জিনিষকে তারা রোখ ক'রে প্রত্যাখ্যান করছে। যে-আলো অনুক্ষণ পথ চেয়ে থাকে আমাদের আঁধার ঘরে সন্ধ্যা দিতে, যে শুধু চায় আরো মনের জানলা খুলি, তাকেই কি-না আমরা বাহাদুরি ক'রে বলি "খুলব না জানলা, থাকব রুদ্ধ ঘরেই বদ্ধ হ'য়ে!" ওয়র্ডসওয়ার্থের কথা ফের ভেসে ওঠে স্মৃতিতে :

যে-কারা আপনি করি বরণ স্বেচ্ছায়
মৃত্যুরূপ তার চোখে পড়ে না তো হায়।

* * *

অথচ সবচেয়ে দুঃখ এই যে, একথা বোঝাবারও উপায় নেই। আরো দুঃখ এই যে, করুণাময়ের যে-করুণার স্পর্শে মনের জানলা খোলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই যে-করুণার কথা বললেও কেমন যেন অবাস্তব শোনায় তাদের কানে যারা এসব বিশ্বাস করে না বা চায় না।

তবু মনে হয় এসব শোনা ভালো। তোমার মনে হয় না? মনে হয় না—কে জানে কখন কার কানের মধ্যে দিয়ে কোন্ গভীর কথা মরমের ছাড়পত্র পাবে? আমরা প্রায়ই যে চাই না, চাইতে শিখি না, সে তো শুধু জানি না ব'লেই—চেতনা অসাড় হ'য়ে রয়েছে ব'লেই। তাই তো দিনের পর দিন এই রসরাসের পূর্ণকুম্ভ মেলায় চাক্ষুষ করি কেবল ছাই আর জটা আর নাগা সন্ন্যাসীদেরকে। তাকাই না একটিবারও আমাদের অন্তরের অতলে মণিবাসরটির পানে—যেখানে সঞ্চিত রয়েছে পরম অনুভবের পরশমণি, যার ছোঁওয়ায় অন্তরের প্রতি জমাট আঁধার হ'য়ে ওঠে তরল সোনা, অশ্রু কুয়াশা হ'য়ে ওঠে আলোর হাসি।

অথচ তবু দেওয়া যায় না—পেলেই বিলোনো যায়। যা বিলিয়ে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি :—এই অনুভবের অমল ঐশ্বর্য। শ্রীঅরবিন্দকে সামনা সামনি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে—কেন এমন হয়? তিনি বলেছিলেন "মানুষ চায় না যে। ভগবান জোর করেন না। আদায় পাওয়ার সর্ত—চাইতে হয়।" এই কথাই বলেছিলেন খৃষ্ট সে কবে: "Seek and thou shalt find, ask and it shall be given unto you, knock and the door will be open."

অথচ তবু এধরণের কথা বলতেও বাধে। তুমি ভক্তিমতী ব'লেই তোমাকে বলতে পারলাম—নৈলে নিশ্চয় শুধু "ঝোপেঝাপে ঘা মেরেই চলতাম"—আসল কথাটিই উহ্য রেখে—যেটা আজকালকার দস্তুর। ভগবানের কথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা একটু দুঃসাহসের কাজ বৈ কি—it is not done!

* * *

তুমি হয়ত বলবে: বেশ ভালো ভালো কথা হচ্ছিল, হঠাৎ আবার ক্ষোভের সুর কেন? তোমার মধ্যে আছে একটি স্নিগ্ধ সুষমা—দুঃখের মধ্যেও তুমি তাই আনন্দময়ী। এতে মেয়েদের খানিকটা জন্মস্বত্ব, কিন্তু তোমার মধ্যে এ-গুণটির কিছু প্রাচুর্য আছে সেটা বুঝতে দেরি হয় না। তাই তুমি দিদি, সময়ে সময়ে বুঝতে পারো না যে পুরুষরা এসব বিষয়ে অনেক সময়েই মেয়েদের সমান নয়। আমার অনেক পুরুষ বন্ধু আছেন যাঁরা খুব জাঁক ক'রেই বলেন যে, তাঁরা মেয়েদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় কোনো গুণই দেখতে পান নি। এঁদের জন্যে আমার ঠিক তেম্‌নিই দুঃখ হয় যেমন দুঃখ হয় তাদের জন্যে—যারা জাঁক ক'রে বলে ভগবানকে তারা চায় না ভগবানকে তাদের কোনো দরকার হয় নি ব'লে। সেদিন একটি ইংরেজ লেখিকার লেখা একটি উপন্যাস পড়ছিলাম। তাতে লেখিকা বড় সুন্দর দেখিয়েছেন এক আমেরিকান স্ত্রীর অতৃপ্তি—যেহেতু তাঁর স্বামীর অজস্র টাকা ও স্নেহ থাকলেও ভালো ব্যবসায়ী (salesman) হওয়া ছাড়া আর কিছুরই দরকার ছিল না। মানুষের সারবত্তা মাপি তো তোর তৃষ্ণা দিয়ে—সে কী কী চায় তারই হিসেব খতিয়ে? পাওয়া তো ঢের পরের কথা—মানুষের মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান তো চাওয়া।

হয়েছে কি, আমরা যে সব জিনিষ খুব বেশি ভালোবাসি বা বরণীয় মনে করি, চাই যে প্রিয়জন সবাই তাকে ভালোবাসুক। রুচির ক্ষেত্রেও এ নিয়ে মানুষের বেদনার অন্ত নেই। তা-ও তবু সওয়া যায়—মনকে বুঝিয়ে যে মানুষ কখনই যা চায় তার সবটা পায় না। কিন্তু যেখানে খুব বড় আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন নিয়ে বাধে সেখানে এ সান্ত্বনায় মন মানে না কিছুতেই। সেখানে যদি টানও থাকে, ক্রমে ক'মে আসে। আমি তাই মনে করি না দিদি, যে, ভগবানকে যে সর্বান্তঃকরণে চায় আর ভগবানকে যে সর্বান্তঃকরণে পরিহার ক'রে চলতে চায়—মানে ভগবানে ভক্তিকেও যে বর্জনীয় ব'লেই মনে করে তাদের মধ্যে স্নেহবন্ধন অটুট থাকতে পারে। তোমরা অনেক সময়েই দুঃখ করো যে, সাধুসন্তরা কেন সংসার থেকে দূরে চ'লে যায়। যেতে বাধ্য। কারণ, সংসার যে সব বস্তুকে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় মনে করে, যথা—স্বজন, ধন, দেহ, সুখ, মান, বিলাস প্রভৃতি, সাধুসন্তরা সেসব আদৌ চায় না। তাই পরমহংসদেব জগন্মাতার কাছে কেঁদেছিলেন এই ব'লে: "মা, ভক্তরা কই কেউ তো আসছে না, কাদের সঙ্গে কথা কইব তা হ'লে?" গভীরে মিল না থাকলে কি সত্যিকারের মেলামেশা সম্ভব?

রাগ কোরো না দিদি, বোলো না ঠোঁট ফুলিয়ে যে, এই-ই তো পারলৌকিকতা—otherworldliness. তা নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা সত্য সম্বন্ধ আছে—সে সম্বন্ধ সেই অনুপাতেই তৃপ্তিকর হয়, যে-অনুপাতে স্বার্থের খাদ থেকে সে উত্তীর্ণ হয় শুদ্ধিলাভ ক'রে। কিন্তু ভাবো কি দিদি, স্নেহ সম্বন্ধে স্বার্থগন্ধ কাটিয়ে ওঠা মুখের কথা? বলবে কি যে, যে-ভালোবাসা যত চকচকে সে তত খাঁটি সোনা! তাই যদি হ'ত তাহ'লে সংসারে কি মানুষ সবচেয়ে হাহাকার করত ঐ ভালোবাসারই কাঁটাবনে? কাঁটাবন বলছি ব'লে আমাকে ভুল বুঝো না—আমি এখানে বিশুদ্ধ ভালোবাসার কথা বলছি না যে-নন্দনে শুধু পারিজাতই ফোটে, বলছি যে-ভালোবাসার এত নামডাক তারই কথা—অর্থাৎ যার জপমন্ত্র হ'ল আদায় করা। কিন্তু চোখ চেয়ে বলো তো, সংসারে যারা এই ভালোবাসার জয়ঢাক সবচেয়ে বেশি বাজায়, তারা একে সত্যি সত্যি চেনে?

তা ছাড়া, আরো দেখ, ভালোবাসা স্নেহ-প্রীতির ঠিক ছন্দটি প্রায়ই আমরা ধরতে পারি না। পারলে সবচেয়ে বেশি অতৃপ্তি পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠত কি ভালোবাসারই এলাকায়? যুগে যুগে মানুষ যে ভগবানকে এত ক'রে চাইল তার মূলে এই অতৃপ্তির বেদনা কি নেই বলতে চাও? না, বলবে যে-শান্তির জন্যে আমরা চিরতৃষিত সে-অমৃত মানবিক স্নেহপ্রীতিতে নিত্যই উপছে পড়ে? তা যদি পড়ত তাহ'লে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মহাত্মারা কি সবাই চাইতেন

TIGHT BINDING

এর বেশি কিছু ? কেউ কি ভুলেও চাইত সেই অমৃততরুকে (গীতার ভাষায়) যার মূল আকাশে, শাখা মাটিতে !

যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষরা সবাই অনুভব করেছেন যে, মানব-প্রেম নিটোল নিখুঁৎ হয় তখনই—যখন প্রতি মানুষের মধ্যে দেখি আমরা ভগবানকে, নৈলে নয়। এ সার্বজনীন শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিটি ভুল হ'তেই পারে না। কারণ এ শুধু আমাদের গীতা-উপনিষদ তন্ত্র-পুরাণের বাণী নয়, এ হ'ল জ্ঞানগরিষ্ঠদের চিরন্তন অনুভূতি—ঠেকে-শেখা উপলব্ধি। তাই তো যখনই মানুষ এ-অমৃতের স্বাদ একটুও পায় তখনই সে এ-স্বাদ দিতে চায় তার স্নেহাস্পদকে, চায় যে তারাও ভালোবাসুক ভগবানকে। কাজেই তারা দুঃখ পায় যখন তারা দেখে যে তাদের স্নেহাস্পদরা আর যা-ই চাক না কেন ভগবানকে চায় না।

অবশ্য এ জন্যে দুঃখ করা অনুচিত না হ'লেও নিষ্ফল, এ আমি মানি। কিন্তু তবু দুঃখ তো দুঃখই থাকে—বেদনা তো বেদনাই থাকে, অন্তত ততদিন যতদিন না ভগবানের একান্ত সান্নিধ্য অন্য সব দূরত্বের ক্ষতিপূরণ করেছে। তাই এ-দুঃখকেও তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কোরো।

কাশ্মীরে বহুবার উপলব্ধি করেছি এই নিঃসঙ্গতার বেদনা। শুধু কাশ্মীরে কেন—অন্যত্রও। বিশেষ ক'রে আত্মীয়দের মধ্যে। আর এ শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও নয়, এ-ও একটি সার্বভৌম সত্য যে আত্মীয়রা প্রায়ই তাদের আত্মীয়তার অভিমানে স্নেহাস্পদের শ্রেষ্ঠ সত্তাটুকু বুঝতে পারে না! রবীন্দ্রনাথ আমাকে বছর বারো আগে বোলপুরে বলেছিলেন যে, তাঁর আত্মীয়রা চিরদিনই তাঁকে এত নগণ্য মনে করত যে, তাঁর কোনো দিন বিশ্বাসই হয় নি যে তাঁর মধ্যে কোনো কিছু সার থাকতে পারে। বলেছিলেন যখন প্রথম তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে যান তখনই তাঁর সর্বপ্রথম পরিচয় হয় নিজের আসল সত্তাটির সঙ্গে। আমি বহুবার ঠেকে শিখে তবে এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছি যে আত্মীয়দের সম্বন্ধের অভিমান প্রায়ই তাঁদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে, যার ফলে তাঁরা পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলেন স্নেহাস্পদের সম্বন্ধে। অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম আছে—(সংসারে কোন্ কথারই বা নেই ?)—তবু এ কথা তুমিও নিশ্চয় মানবে যে, মানুষ সত্যিকার আপন হ'য়ে ওঠে তখন যখন সে খানিকটা পরিমাণে স্বত্বাধিকার ছাড়ে। ফুলকে যে মুঠোয় বড় বেশি চেপে ধরে সে-ই যে ফুলের ফুলত্ব সম্বন্ধে বেশি জানল এ কথা তো সত্য নয়। কাউকে সত্যি চিনতে হ'লে চাই (খানিকটা অন্তত) শ্রদ্ধার অবকাশ : মনস্ত্ববোধের অতি-ঘেঁষাঘেঁষি সত্য পরিচয়ের মস্ত অন্তরায়।

কিন্তু এটুকু বললেও সব বলা হ'ল না। আত্মীয়ের চেয়ে বন্ধু আমাদের বেশি আপনার—একথা অপ্রতিপাদ্য। কিন্তু বন্ধুও পারে না আমাদের অন্তরের অতৃপ্ত তৃষ্ণা মেটাতে। বন্ধুর জানায় যে স্নেহ প্রীতির মধ্যে অমৃতের আভাষ আছে—কিন্তু এ অমৃততৃপ্তি পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে না যদি না বন্ধুত্বের ভালোবাসার মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ স্পর্শ থাকে। এই স্পর্শকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন সাইকিক (psychic) : এর রেশ যত গাঢ় হ'য়ে ওঠে প্রীতি স্নেহ ততই আনন্দময় হ'য়ে ওঠে। মানুষ যত মহৎ হয় যত নিঃস্বার্থ হয় তার স্নেহস্পর্শে সে ততই এ-আনন্দের স্বাদ দেয় বটে, কিন্তু এ-আনন্দও পুরোপুরি কৃতার্থ হ'তে পারে না ভগবানের মধ্যস্থ বিনা। তাই বহু বন্ধুর মধ্যেও মানুষ যে একলা সেই একলা। ও বছর সুভাষও আমাকে বলছিল, সে সময়ে সময়ে এত একলা বোধ করে যে—!

কে না করে দিদি ? নিজেকে দিয়েই তো জানো। আর তুমি আমি তো কোন্ ছার, যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষরা সবাই একলা হ'য়ে এসেছেন এই জন্যে। রবীন্দ্রনাথ কত বার আমাকে বলেছেন তিনি কত একলা! অথচ তাঁর কিসের অভাব ছিল বলো ? ডি. এইচ. ল্যরেন্সের মর্মন্তুদ জীবনেরও বাদী সুর এই একান্ত একাকিতা।

প্রতি মানুষ এসেছে একলা, যাবে একলা। এক ভগবান ছাড়া তার সাথী আর কে আছে ? জীবনের তুফানে চরম গতি আর কোন্ ধ্রুবতারার বন্দরে বলো ?

কাশ্মীরে এত স্নেহ এত বন্ধুত্ব মিলেছিল ব'লেই বোধ হয় এ একাকিত্ব আরো প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল। অস্ত সূর্যের আলোয় মন্দগামিনী ঝিলমের শ্রান্তকাকলি শুনতে শুনতে, মেঘে-ঢাকা শিখরমন্দিরের ছায়া-আচ্ছন্ন চন্দ্রালোকে ধূসরাভ শৈলমালার বিবাগী শোভায় কেবলই যেন বেজে উঠত কানে—এ বিশ্বে সবাই কত একলা! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠির কথা:

"মানুষের নিসঙ্গবোধ ঘুচতে পারে না মানবিক স্নেহসঙ্গে—একমাত্র ভগবানের মিলনেই লুপ্ত হয় এ ভেদবুদ্ধি।" শ্রীমার একটি প্রার্থনার কথা মনে পড়ে :

"Without the Divine life is a painful illusion, with the Divine all is bliss."

তাঁরে বিনা হায় জীবনে ঘনায়
আলেয়ামায়ায় বেদনা কালো
সে-মিলনময় এ-জীবন হয়
আনন্দময় চেতনা-আলো।

সত্যি দিদি, আমি কাশ্মীরে প্রায়ই শুনতাম এ-বাঁশির আবছা রেশ যে-বাঁশি বাজে শুধু বিজনে। তাই একদিন অস্তসূর্যের আলোয় শ্রীনগরে লিখেছিলাম এই পূরবীটি :

একেলার পথে বাজায়ো তোমার বাঁশি
তাহ'লে মনের বনে জানি নাথ,
ফুটিবে হারানো হাসি।
কালো বুকে তুমি জ্বালো
তোমার অকূল-আলো
বিলাস-দুলালও তারি ডাকে হয়
যুগে যুগে বনবাসী।
বনবেদনায় বাজে তব ফুলবাঁশি।

সবে চায় সুখ-সাথী,
ঘনায় নিরালা রাতি,
মিলনের মেলা ভাঙে অবেলায়
বিরহ ওঠে উছাসি'।
শুধু একেলার পথে বাজে নীল বাঁশি।

বিনা তব চিরসুধা
মিটে কি প্রাণের ক্ষুধা ?
আজ শুধু করো চিরবৈরাগী
অমৃতের অভিলাষী।
ব্যথা দিয়ো—শুধু বাজায়ো বিজন বাঁশি।

ইতি

সমুদ্রের খেলা

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার এম-এ

মাটীর বুকেতে বসি' মনে আজি জাগে,
হে জলধি, লক্ষ কোটি বরষের আগে
যে দিন ছিল না মাটী কঠিন কোমল
ধরণীর বুকে, বিশ্বব্যাপী শুধু জল—
বায়ুর প্রবাহ গলি' নবপ্রাণ ধারা—
অস্পষ্ট আভাস তারি—বাধাবন্ধহারা
সেদিনো কী ছিলে তুমি অশান্ত উচ্ছল ?
গগন বিদারী কলরোলে অবিরল
ঝাঁপায়ে পড়িতে তুমি আজিকার মত
মহাশূন্য মাঝে ? অনন্ত তরঙ্গব্রত
সেদিনো কী ছিল তব ? অন্ধ ব্যাকুলতা
গুমরি' মরিত সদা অর্থহীন ব্যথা
অন্তরে তোমার ? বন্ধন-বেদনা জ্বালা
দুলায়ে দিত কী কণ্ঠে ফেনপুঞ্জমালা ?

চেয়ে আছি দিগন্তের পানে। সীমাহীন
ব্যগ্র দুই বাহু মেলি' তুমি রাত্রিদিন
আকাশে বাঁধিতে চাও আকুল আবেগে
নভোনীল বক্ষে তব। ওঠে মনে জেগে
সুদূরের পানে চাহি'—তোমার নীলিমা
হারায়ে গিয়াছে যেথা, লভিয়াছে সীমা
সুনীল গগনে—তব কম্বুকণ্ঠ হ'তে
পাই যেন সাড়া আজি। ওই জলস্রোতে
ভাসিয়া উঠিছে যেন বালিকা বসুধা
বারিময়ী স্থির অচঞ্চলা। যেই ক্ষুধা
বক্ষে জ্বলে নিরন্তর, তাহার প্রকাশ
নাহি যেন কোনখানে। প্রচণ্ড প্রয়াস
তরঙ্গবন্ধনে তব লভিয়া মূরতি
দেশে দেশে নাহি করে প্রলয়-আরতি।

TIGHT BINDING

জঙ্গম

'বনফুল'

৩

শঙ্কর এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

সামান্য চা-খাওয়ানো ব্যাপারটা যে এতদূর কবিত্বময় করা সম্ভব, সদ্য-মফঃস্বল-আগত শঙ্করের তাহা ধারণাতীত ছিল। কি পরিপাটি আয়োজন।

গৃহসংলগ্ন উদ্যান প্রাঙ্গণে ছোট ছোট কয়েকটি টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে সুদৃশ্য আস্তরণ। তাহার উপর এক একটি ফুলদানী, প্রত্যেকটিতে দেশী বিদেশী নানারকম ফুল। ইহা ছাড়া প্রতি টেবিলে সিগার, সিগারেট, ছাই ফেলিবার পাত্র ও ছোট ছোট কাচের জলপূর্ণ বাটি। বাটিগুলির পাশে পাটকরা পরিষ্কার ছোট ছোট তোয়ালে। প্রত্যেক টেবিলে দুইটি করিয়া বেতের চেয়ার। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহার মন এই মার্জ্জিত-রুচি পরিবারটির উপর সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

শঙ্কর একটু আগেই গিয়াছিল। তখনও অন্যান্য অতিথিবর্গ আসিয়া পৌছান নাই। এমন কি, প্রফেসর মিত্র তখনও পর্য্যন্ত কলেজ হইতে ফেরেন নাই। শঙ্কর গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উদ্যানে সজ্জিত টেবিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে সলজ্জকণ্ঠে কে বলিল, এই যে আপনি এসে গেছেন—আসুন, নমস্কার।

শঙ্কর পিছন ফিরিয়া দেখে রিণি।

একটা ট্রেতে অনেকগুলি খালি পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পিছনে একজন বেয়ারা, তাহার হাতেও একটি ট্রে এবং তাহাতেও পেয়ালা, দুধ রাখিবার পাত্র, চিনির পাত্র, ছাঁকনা প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম। শঙ্কর প্রতি নমস্কার করিয়া আগাইয়া গেল এবং রিণির হাত হইতে ট্রে-টা লইবার জন্য হাত বাড়াইল—দিন আমাকে দিন—

রিণি মৃদু হাসিয়া লজ্জায় মুখটি একটু নত করিল, ট্রে কিন্তু শঙ্করের হাতে দিল না। তাড়াতাড়ি নিজেই গিয়া তাহা একটি টেবিলের উপর রাখিল এবং বেয়ারাটার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুই এগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখ্ ততক্ষণ। দেখিস্ আবার যেন ভাঙিস না কিছু। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আসুন।

শঙ্কর রিণির পিছন পিছন চলিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কাউকে দেখছি না।

বৌদি, সোনাদি সব ওপরে। দাদা এখনও ফেরেনি কলেজ থেকে—

ইহার পর আর কি বলিবে শঙ্কর ভাবিয়া পাইল না। নীরবে রিণির দোদুল্যমান বেণীভঙ্গিমা দেখিতে দেখিতে তাহার পিছন পিছন আসিয়া সে ড্রয়িং রুমে ঢুকিল। বেণীদোলানো রিণি আর স্টেশনে-দেখা রিণি দুইজনে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রসাধনের সামান্য ইতরবিশেষে মানুষটাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। অতি সাধারণ একটা আটপহুরে রঙীন শাড়ি, কাঁধের কাছে সাধারণ রকম এব্রয়ডারিকরা একটা ব্লাউস, হাতে দুগাছি করিয়া গাতলা সোনার চুড়ি, কানে দুল, পায়ে স্যাণ্ডাল, মাথায় দোদুল্যমান বেণী।

এই অতি সাধারণ বেশেই রিণিকে অত্যন্ত অসাধারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকিয়া রিণি বলিল, আপনি বসুন। আমি এগুলো ফেলে দি ততক্ষণ।

কি ফেলে দেবেন?

এই যে—

শঙ্কর দেখিল একটা ভাঙা পোর্সিলেনের বাসনের টুকরা চতুর্দ্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে।

রিণি বলিল, বেয়ারাটার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল টি-পটটা।

রিণি টেবিল হইতে একটা খবরের কাগজ লইয়া টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল। শঙ্করও হেঁট হইয়া কুড়াইতে সুরু করিল।

রিণি বলিল, আপনি বসুন না।

সেটা ভাল দেখায় না।

রিণি কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রতিবাদ করিল না। দুজনেই কুড়াইতে লাগিল।

কুড়ানো শেষ হইলে রিণি টুকরাগুলি খবরের কাগজটাতে মুড়িয়া বলিল, আপনি তাহলে বসুন একটু। আমি বৌদিদিদের খবর দি।

রিণি চলিয়া গেল।

শঙ্কর একা বসিয়া বসিয়া ড্রয়ংরুমের আসবাবপত্রাদি নিরীক্ষ্য করিতে লাগিল। সুন্দর দামী 'সেটি', মেঝেতে কার্পেট পাতা। সামনের দেওয়ালে একটি ছোট কিন্তু দামী ওয়াটার কালার। সেই দেওয়ালেই দুইখানি বড় বড় অয়েল-পেন্টিং ছবি, দুইখানিই নারীমূর্ত্তি, এলিজাবেথান যুগের পোষাকপরিহিতা স্বাস্থ্যবতী তরুণী দুইটি। চোখের নীলিমা ও গালের লালিত্য মুগ্ধ করে। অপর একটি দেওয়ালে বিরাট একখানা দেওয়ালজোড়া ছবি, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য। সেকালের যুদ্ধক্ষেত্র। নানাভাবে উত্তেজিত অশ্ব ও অশ্বারোহীর দল একটা নিষ্ঠুর সংঘর্ষকে যেন মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। ভিতর হইতেই দেখা যাইতেছে বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট হ্যাট-র‍্যাক এবং তাহার সঙ্গেই ছড়ি রাখিবার র‍্যাক। ঘরের এক কোণে ছোট একটি গোল শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর কালো পাথরের নটরাজ, আর এক কোণে অনুরূপ টেবিলের উপর একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, পাথরের নয় পিতলের। আয়নার দুইপাশে ছোট ছোট দুইটি সুদৃশ্য কাঠের ব্রাকেট। ব্র্যাকেটের উপর উন্মুক্ত-বক্ষা বঙ্কিমতনু প্রস্তরময়ী দুইটি রমণী। অজন্তা শিল্পের নিদর্শন। দেওয়ালে একটি বড় ঘড়ি। পাশের ঘরেই টেবিলের উপর 'ফোন' দেখা যাইতেছে। হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করিয়া ফোনটা বাজিয়া উঠিল। কাছেপিঠে বোধহয় কেহ ছিল না, অন্ততঃ ফোনের ডাকে কেহ সাড়া দিল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শঙ্কর অবশেষে উঠিয়া গিয়া ধরিল।

হ্যালো, কে আপনি?

আমি? আমি অপূর্ব্ব। আপনি কে?

আমাকে চিনবেন না, চা খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছি, আমার নাম শঙ্কর।

ও, আমারও যাওয়ার কথা, কিন্তু আই অ্যাম সো সরি, মিস্ রিণি দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু আই কান্ট হেল্‌প। এইটে জানাবার জন্যেই ফোন করছি।

আচ্ছা, ওঁরা কেউ এখন নীচেয় নেই, এলে আমি বলে দেব। শঙ্কর রিসিভারটা রাখিয়া দিল।

কে এই অপূর্ব্ববাবু! মেয়েমানুষের মত গলার স্বর।

তাহার একা ড্রয়িংরুমে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আদি সাজানো প্রায় শেষ করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সে বিনীতভাবে বলিল, বসুন, হুজুর। দিদিকে ডেকে দি—না, ডেকে দেবার দরকার নেই। বাগানটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখি, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

বেয়ারা ভিতরে চলিয়া গেল।

শঙ্কর এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নানা-জাতীয় মরশুমি ফুলের বাহার দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া সে গেট দিয়া আবার সদর রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ তাহার মনে কৈশোরের একটা স্মৃতি ভাসিয়া আসিল। শৈলদের বাড়ীতেও ঠিক এমনি একটা গেট ছিল। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে প্রতি অপরাহ্নে শৈল গেটে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়িতেছে একদিন শৈলকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কার জন্যে তুই রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস শৈল? আমার জন্যে নাকি?

ভারি বয়ে গেছে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার! দাদাদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি আমি—

শৈলর দুইটি দাদা পঙ্কজ ও উৎপল শঙ্করের সহপাঠী ছিল। পঙ্কজ বেচারা মারা গিয়াছে। শৈলও কি বাঁচিয়া আছে? সেই দুরন্ত বালক-স্বভাব শৈল, কোথায় আজ সে? সে স্বচ্ছন্দে পেয়ারা গাছে চড়িত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়িত, প্রাচীর ডিঙাইয়া মিত্তিরদের বাগান হইতে ফলসা চুরি করিয়া আনিত, কথায় কথায় খামচাইয়া কামড়াইয়া খেলার সাথীদের অস্থির করিয়া তুলিত—সেই শৈলও ত আর বাঁচিয়া নাই। সে-ও মরিয়াছে। যে তরুণী আজ বোস সায়েবের পত্নী সে অন্য লোক, অতিশয় নকল একটা আনন্দকে সে যেন জোর করিয়া চোখে মুখে ফুটাইয়া

রাখিয়াছে। শঙ্করের কবিমন এই গেটটাকে উপলক্ষ করিয়া বিগত কৈশোর-জীবনের স্মৃতি-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। অতীতকালে যে প্রশ্ন সে বহুবার নিজেকে করিয়াছে, সেই প্রশ্নটাই আবার তাহার মনে জাগিল—শৈল কি তাহাকে ভালবাসিত? কই কোনদিন ত তাহাকে বলে নাই। কিন্তু সে ত তাহার কবিতার খাতাখানা চুরি করিয়াছিল। কেন? যখন তখন লুকাইয়া সে তাহার পড়ার ঘরে আসিয়া হাজির হইত। কেন? সে বহুবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে কোন উত্তর পায় নাই; একটা না একটা ছুতা করিয়া শৈল প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। শঙ্কর কি তাহাকে ভালবাসিত? বাসিত বই কি! কমলা রঙের শাড়িটি পরিয়া শৈল যেদিন শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল শঙ্করের রাত্রে ঘুম হয় নাই। ইহা কি ভালবাসার লক্ষণ নয়? কিন্তু শঙ্করও ত শৈলকে কোনদিন কিছু বলে নাই। বরং শৈল শ্বশুরবাড়ি যাইবার আগে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার জন্যে মন কেমন করবে, শঙ্করদা? ছদ্ম বিদ্রূপের সুরে সে উত্তর দিয়াছিল—ঘুম হবে না আমার! সত্যই ত ঘুম হয় নাই। অনর্থক বিদ্রূপ করিতে গেল কেন তবে? মনখানি মেলিয়া ধরিলে ক্ষতি কি ছিল? কিশোরকালের প্রথম প্রেম এমন ভাবে নষ্ট হইয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর নাই। পৃথিবীর বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে ইহাও একটি।……শৈলকে ভুলিতেও দেরি হয় নাই ত। খল্‌সি আসিয়াছিল। শৈলর দূরসম্পর্কের বোন খলসি। শৈল চলিয়া গেলে খলসিই হইয়াছিল তাহার সঙ্গিনী। সেই একদিন অন্ধকারে রাত্রে পিছন দিকের বারান্দার সিঁড়ির ধারে দুজনে দুজনের হাত ধরিয়া বসিয়া থাকা অপূর্ব্ব অনুভূতি!……তাহার পর আর একদিন রাত্রে, সেদিনও ঘন গাঢ় অন্ধকার। শঙ্কর শ্মশানে বসিয়া ছিল—সম্মুখে খল্‌সির চিতা। খলসিও থাকে নাই। শঙ্করের আনন্দ-অনুসন্ধিৎসু অমৃত-পিপাসী কবি-মন সুধার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আজও মিলিল না। জ্যোৎস্না-স্নাত সাগরে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে তাহার মুগ্ধ মন মাতিয়া ওঠে। জ্যোৎস্না কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না, চাঁদ ডুবিয়া যায়। নববর্ষার মেঘোদয়ে তাহার মনের ময়ূর পেখম মেলে, কিন্তু মেঘ কতক্ষণ থাকে? বৃষ্টি নামে, মেঘ মিলাইয়া যায়। সব আসে কিন্তু থাকে না।

চাই কমলালেবু, ভালো কমলালেবু—

শঙ্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

সে অকারণে কমলালেবুওলাকে ডাকিয়া কমলালেবু কিনিতে লাগিল। সুন্দর বড় বড় কমলালেবু। তাহার পকেটে ও হাতে যতগুলা আঁটিল সে কিনিয়া লইল। তাহার পর গেট দিয়া সে আবার ভিতরে গেল। সহসা তাহার মনে হইল এমনভাবে চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই, কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া দ্বিতলের একটা খোলা জানলা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল অসম্বৃতবসনা একটি নারীমূর্ত্তি, তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জানালা হইতে সরিয়া গেলেন—প্রসাধন করিতেছিলেন বোধহয়। শঙ্কর চোখ নামাইয়া লইল—ছি, ছি, সে ওপরের দিকে তাকাইতে গেল কেন! কি মনে করিলেন উনি। দেখিতে পাইয়াছেন কি? সে দ্রুতপদে আসিয়া ড্রয়িংরুমে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আশ্চর্য্য লোক আপনি শঙ্করবাবু! এত আগে এলেনই বা কেন, আর এলেন যদি বেরিয়েই বা গেলেন কেন?

শঙ্কর কহিল, এত আগে মানে? আমি এসেছি সাড়ে চারটের সময়—

সাড়ে তিনটের সময়—

শঙ্কর নিজের হাতঘড়িটা দেখিল—তাইত! সাড়ে তিনটাকে তাহার সাড়ে চারটে বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। একটু অপ্রস্তুতভাবে সে বলিল, আরে-সাড়ে তিনটেকে আমি সাড়ে চারটে ভেবে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাজির হয়েছি!

তাতে আর কি হয়েছে। ভালোই ত, আসুন না একটু গল্প করা যাক—

সোনাদিদির মুখে একটা চাপা হাসি চিকমিক করিতেছিল।

কমলালেবু কোথায় পেলেন?

কিনলাম, রাস্তায়!

কিনলেন? খিদে পেয়েছে বুঝি আপনার! কলেজ থেকে সোজা এসেছেন বুঝি?

শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রত হইল। মুখে কিন্তু সে হটিবার পাত্র নয়। বলিল, কেমন সুন্দর দেখতে বলুন ত। দেখলে কি খাওয়ার কথাই মনে হয়? আমার ত কমলা-

লেবু খাওয়ার চেয়ে হাতে করে বসে থাকতেই বেশী ভাল লাগে।

সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

আমাকে একটা দিন, খাই—

শঙ্কর তাঁহাকে একটা কমলালেবু দিল এবং প্রশ্ন করিল, মিষ্টিদিদি কোথায়, তাঁকে দেখছি না!

তিনি এইমাত্র স্নান করে এলেন, আসচেন এখুনি—

চকিতে শঙ্করের উন্মুক্ত বাতায়নের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সোনাদিদি লেবুটি ছাড়াইয়া শঙ্করের হাতে কয়েকটি কোয়া দিয়া বলিলেন, নিন, খেয়ে দেখুন, আপনি খান আগে।

রিণি আসিয়া প্রবেশ করিল। কাপড়জামা বদলাইয়া বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। কমলালেবু দেখিয়া সে কৌতূহল প্রকাশ করিল না। সোনাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে টেবিলগুলো ঠিক সাজানো হয়েছে ত? দেখেছ তুমি সোনাদি?

আমি বাইরে যাইনি, তুই দেখ না গিয়ে—

শঙ্কর বলিল, অপূর্ব্ববাবু ফোন করেছিলেন, তিনি আসতে পারবেন না।

এই বার্ত্তায় রিণির মুখখানি সলজ্জ হইয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

সোনাদিদি কমলালেবুর কোয়াগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কখন ফোন করেছিলেন অপূর্ব্ববাবু?

এই একটু আগে। আপনারা কেউ নীচে ছিলেন না তখন—

ও, বাক বাঁচা গেল—নিন্ খান দুটো কোয়া।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, আপনি খান আগে—

আচ্ছা, এক-গুঁয়ে লোক ত আপনি!

মিষ্টিদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মিষ্টিদিদি আসিতেই সোনাদিদি অনুযোগ মিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, শঙ্করবাবুর কথা শুনেছ মিষ্টিদি। কমলালেবু নাকি ওঁর হাতে করে ধরে থাকতেই ভাল লাগে, খেতে ভাল লাগে না।

মিষ্টিদিদির আগমনে শঙ্কর মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, খোলা জানালার কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। মিষ্টিদিদির দিকে তাহার চাহিতেও সঙ্কোচ হইতেছিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া উত্তর দিলেন, ঠিকই ত বলেছেন উনি! কবির মত কথাই বলেছেন।

সোনাদিদি বলিলেন, হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়েছে, আপনার কবিতা এনেছেন, কই দেখি!

না, আজ আনিনি, আর একদিন আনব এখন। কলেজ থেকে সোজা চলে এসেছি কিনা—

অভিমান-ভরা সুরে সোনাদিদি বলিলেন, কাল অত করে বললাম আপনাকে—

মিষ্টিদিদি ফোড়ন দিলেন, কবির মন অত সহজে পাওয়া যায় না সোনা—

এই স্বল্প পরিচিতা নারী দুইটির প্রগল্‌ভতা শঙ্করের ভাল লাগিতেছিল না; আবার ভাল লাগিতেও ছিল। তাহার ভদ্র মন এই ধরণের কথাবার্ত্তায় সঙ্কুচিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরবাসী বন্য বর্ব্বরটা ইহা উপভোগ করিতেছিল। শঙ্কর ভাবিতেছিল, কেমন মানুষ ইহারা।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন, না? বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?

শঙ্কর একটু সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আপনাদের ফুলগুলো।

এবার ডালিয়াগুলো তেমন ভালো হয় নি—

শঙ্কর এবার মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া দেখিল, এতক্ষণ সে সঙ্কোচে তাঁহার দিকে তাকাইতে পারে নাই। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই ভদ্রমহিলা প্রসাধনশিল্পে নিপুণা। চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখাটি কি সুন্দর মানাইয়াছে। পীতাভ জরিপাড় শাড়িটি পরিবার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী, সর্ব্বাঙ্গে তাহা যেন আবেশভরে স্বপ্ন দেখিতেছে। শঙ্করের কবিমন প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

মিষ্টিদিদি বলিতে লাগিলেন, ডালিয়াগুলো তেমন সুবিধে হয় নি যদিও, পিটুনিয়াগুলো কিন্তু খু—ব ভালো হয়েছে। দেখেছেন আপনি ওই দিকের কোনটাতে?

শঙ্কর সত্য কথা বলিল।

বিলিতি ফুল, একটাও চিনি না আমি।

তাই নাকি? আসুন এক্ষুণি চিনিয়ে দিচ্ছি আমি। চলুন যাই, আয় সোনা!

সোনাদিদি কিন্তু অভিমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা যাও, শঙ্করবাবু আমার একটা কথাও যখন রাখলেন না, তখন আমার সরে থাকাই ভাল!

মিষ্টিদিদি অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত দুইটি উলটাইয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, নিন, সামলান এখন!

শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিল, সে কি! কোন কথা রাখলাম না আপনার?

সোনাদিদি নীরব।

আচ্ছা দিন নেবু খাচ্ছি! আপনিও ত আমার কথা রাখলেন না। একটা কোয়া যদি আগে খেতেন, কি এমন ক্ষতি হত তাতে?

শঙ্কর হাসিয়া সোনাদিদির হাত হইতে কয়েকটি কোয়া লইয়া মুখে পুরিল। সোনাদিদি যেন বিগলিত হইয়া গেলেন। অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে মৃদু হাস্যসহকারে তিনি বলিলেন, আমার জন্যেও রাখুন দুএকটা! সব খেয়ে ফেলছেন যে—

এই যে নিন না! চলুন, বাগানখানা এইবার দেখা যাক। মিষ্টিদিদি আপনিও নিন—

তিনজন লেবু খাইতে খাইতে ড্রয়িংরুম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে রিণি চায়ের টেবিলগুলি সাজাইতেছিল।

মিষ্টিদিদি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবা রে বাবা, রিণির মত খুঁতে মেয়ে আর যদি দুটি দেখেছি আমি! সেই আড়াইটে থেকে মেয়ে লেগেছেন চায়ের টেবিল সাজাতে, এখনও পর্য্যন্ত পছন্দমত সাজানো হল না।

হয়ে গেছে আমার—

এই বলিয়া রিণি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

রিণি চলিয়া গেলে সোনাদিদি মৃদুস্বরে বলিলেন, আহা, বেচারির এত যত্ন আজ সব পণ্ড হল। অপূর্ব্ববাবু আজ আসবেন না ফোন করেছেন!

বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

ছদ্মবিস্ময়ে মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি! আহা, বেচারি!

শঙ্কর এ বিষয়ে মনে মনে কৌতূহলী হইলেও মুখে কিছু বলিল না। তিনজনে মিলিয়া বাগানের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শঙ্কর মরশুমি ফুল সম্বন্ধে যতটা না হউক, মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করিল। 'সুইটপি'র বর্ণ, বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, রোপণ ও লালন করিবার প্রণালী ও কৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে মিষ্টিদিদি বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রফেসার মিত্রের মোটর গেটে প্রবেশ করিল। শঙ্কর একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কোন প্রকার চঞ্চলতা দেখা দিল না। তিনি সুইটপির সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যেন স্বামীর আগমন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সচেতন হওয়াটা অতিথির সম্মুখে অশোভন! অবিচল ভাবটা বেশীক্ষণ কিন্তু টিকিল না। সোনাদিদি টিকিতে দিলেন না। সোনাদিদি বিস্মিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—ওমা, অপূর্ব্ববাবু যে এসেছেন দেখছি।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি?

সকলে তখন মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রফেসার মিত্র ব্যতীত মোটর হইতে আরও তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিয়াছিলেন। একজন অপূর্ব্ববাবু এবং অপর দুইজন অবাঙালী। অবাঙালী দুইজন প্রফেসার মিত্রের প্রাক্তন বন্ধু, বিলাতে অবস্থানকালে ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। একজন মাদ্রাজি মিষ্টার পিলে এবং অপরজন পাঞ্জাবি সরদার প্রতাপসিং। দুইজনেই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং দুই জনেই ছুটিতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইহাঁদেরই সম্বর্দ্ধনা-কল্পে এই টি-পার্টির আয়োজন। মিষ্টিদিদি সস্মিতমুখে ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিলেন। কথায় বার্ত্তায় বোধ হইল ইতিপূর্ব্বেই ইহাঁদের আলাপ পরিচয় ছিল। কারণ পাগড়ি-মণ্ডিত শ্মশ্রু-গুম্ফ সমন্বিত প্রতাপ সিং মিষ্টিদিদির সহিত কি একটা রসিকতা করিয়া দরাজ গলায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মিষ্টার পিলে মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারও হাস্যদীপ্ত ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি এই আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া যখন ব্যস্ত, সোনাদিদি তখন অপূর্ব্ববাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে কি যেন বলিতে লাগিলেন।

প্রফেসার মিত্র আসিয়াই বন্ধুদ্বয়কে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন। শঙ্কর সুইটপির বেডগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বেড়াইতে

করিতে এই সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি সে মিষ্টিদিদির নিকট এইমাত্র শুনিয়াছিল সেইগুলিই রোমন্থন করিতে লাগিল।

বেশীক্ষণ অবশ্য নয়। একটু পরেই সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আসুন শঙ্করবাবু, অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, ইনিই ফোন করেছিলেন—

পরিচয় হইল।

শঙ্কর দেখিল অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত সত্যই একটি দেখিবার মত বস্তু। খর্ব্বকায় ক্ষুদ্র মানুষটি, কিন্তু সাজসজ্জা ছোট নাগের মত। পায়ে জরিদার নাগরা, পরণে মিহি কোঁচানো ধুতি, গায়ে মিহি ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। সমস্ত মুখখানি একেবারে যেন চুণকাম করা স্নো এবং পাউডারে, কিন্তু তাঁহার অক্ষৌরীকৃত গণ্ডদেশের কর্কশতা ঢাকিতে পারে নাই। মুখখানি গোল, নাকটি খাঁদা খাঁদা, নাকের নিম্নে সামান্য একটু গোঁফ। চক্ষু দুইটিতে বুদ্ধির জ্যোতি আছে, কিন্তু লাজুক। অপূর্ব্ববাবু কাহারও মুখের দিকে বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারেন না।

সোনাদিদি অপূর্ব্ববাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন।

শঙ্কর শুনিল যে অপূর্ব্ববাবু লোকটি বিদ্বান, সাহিত্য-রসিক, মার্জ্জিতরুচি ও প্রগতিবাদী। সরকারি আপিসে চাকুরি করেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া অপূর্ব্ববাবু চুপ করিয়া রহিলেন। বলিবার মত কথা তাঁহার জোগাইল না। চোখ দুটি নীচু করিয়া সস্মিত মুখে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনারা দুজন আলাপ করুন ততক্ষণ, আমি রিণিকে ডেকে নিয়ে আসি—সোনাদিদি চলিয়া গেলেন। ইহাদের আলাপ কিন্তু তেমন জমিল না। শঙ্কর মামুলি ভদ্রতাসূচক দুই চারিটি কথা বলিল এবং অপূর্ব্ববাবু 'হাঁ' 'না' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই বিব্রত হইতে লাগিলেন। অপরিচিত লোকের কাছে অপূর্ব্ববাবু বড়ই অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হয়, হয়ত এমন কিছু অনবধানতাবশতঃ বলিয়া ফেলিবেন যাহা অসঙ্গত। সুতরাং অপরিচিত লোকের সম্মুখে তিনি সাধারণত চুপ করিয়াই থাকেন।

শঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, আপনার কতদিন আলাপ এঁদের সঙ্গে?

বছর দুই হবে।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবেই কেন জানিনা অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, মিস্ মিত্রকে পড়াতাম আমি।

ও।

শঙ্কর সহসা চুপ করিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ঠিক কি যে মনে হইতে লাগিল তাহা ঠিক বর্ণনীয় নয়। কিন্তু একটা পোকা একটা মর্ম্মর প্রতিমার গা বাহিয়া উঠিতেছে দেখিলে একটা শিল্পীর যে ধরণের ক্ষোভ উপস্থিত হয় শঙ্করের তাহাই হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর আকস্মিকভাবে অপূর্ব্ববাবুকে আবার একটি প্রশ্ন করিল, প্রশ্নটির অসৌজন্যে শঙ্কর মনে মনে সঙ্কুচিত হইলেও প্রশ্নটি না করিয়া সে পারিল না। তখন আপনি ফোন করলেন যে আসতে পারবেন না, আবার এসে পড়লেন যে—

প্রশ্নটি শুনিয়া অপূর্ব্ববাবু নারীসুলভ লজ্জায় শির অবনত করিলেন এবং পরে অতি কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, বড়-বাবু ছুটি দিতে চাননি প্রথমে, শেষটা অনেক বলা কওয়ার পর ছুটি দিতে যখন রাজি হলেন তখন দেখি আর আসবার সময়ও নেই—শেষে শঙ্কর বলিল—আপনি এলেন ত প্রফেসার মিত্রের সঙ্গে দেখলাম—

অকারণে লজ্জিত অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, হ্যাঁ উনি গাড়ি নিয়ে ভাগ্যিস্ আমার মেসে গিয়েছিলেন তাই আসতে পারলাম।

কোথায় থাকেন আপনি?

নেবুতলায় একটা মেসে।

প্রফেসার মিত্র কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রিণি ও সোনাদিদিও আসিলেন। মিষ্টিদিদি সরদার প্রতাপসিং ও মিষ্টার পিলেকে লইয়া হাস্য পরিহাসে মশগুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রফেসার মিত্র কাছে আসিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইতেই তাঁহার শঙ্করের সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। তিনি অভিভাবকী সুরে শঙ্করকে ডাকিয়া বলিলেন, আসুন না শঙ্করবাবু, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

সুইটপিণ্ডলো দেখছিলাম আর একবার। অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গেও আলাপ হল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের সঙ্গে সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রফেসার মিত্রকে শঙ্কর ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই, নাম শুনিয়াছিল। ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে ভদ্রলোকের নাম আছে। দেখিলেই লোকটিকে ভাল লাগে, সদা-হাস্যমুখ, উপরের দন্তপাঁতি সর্ব্বদাই বিকশিত হইয়া আছে। শঙ্করের সহিত পরিচয় হইতেই তিনি উচ্ছ্বাসভরে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে বলিলেন, ভারি খুশি হলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করে'! উৎপলের বন্ধু তুমি, উৎপল আমাদের বাড়ির ছেলের মত ছিল। সেদিন আমি একটা মিটিংএ আটকে পড়লাম—তাই উৎপলকে 'সি-অফ্' করতে আর যেতে পারলাম না। বস বস—

এমন সময় আর একটি মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল। সে মোটরে আরও কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনজন আধুনিক মহিলা ও তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন পুরুষ মানুষ।

শঙ্কর ও সোনাদিদি একটি টেবিলে বসিয়াছিলেন। ঠিক তাহার পাশের টেবিলেই ছিলেন তিনি ও অপূর্ব্ববাবু। অপর পাশে ছিলেন দ্বিতীয় মোটরে সমাগতা একটি মহিলা ও তৎসঙ্গে আগত ভদ্রলোক দুইজনের মধ্যে একজন। এই ভদ্রলোক সোনাদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মিসেস্ রায়, একটা খুব ভাল ফিল্ম্ হচ্ছে, দেখেছেন? Man, Woman, Marriage?

সোনাদিদি বলিলেন, কাগজে দেখেছি বটে, পরদায় দেখা হয় নি!

দেখে আসুন তাহলে, ওয়াণ্ডারফুল প্রোডাক্শান্। আজই লাস্ট্ ডে—

সোনাদিদি হতাশভাবে বলিলেন, তাহলে আর হয় না। পার্টি শেষ হতেই ত সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সেকেণ্ড শো'তে যেতে পারেন।

দেখি—

সোনাদিদি চুপ করিয়া গেলেন। কোথাও যাওয়া না যাওয়ার মালিক তিনি নহেন। মিষ্টিদিদি যদি না যান, তাহা হইলে তাঁহারও যাওয়া হইবে না।

একটু পরে সোনাদিদি শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি দেখেছেন ফিল্ম্টা?

না—

যান, দেখে আসুন।

হস্টেলে রাত্রিবেলা ত ছুটি পাব না—

একটু দুষ্টামিভরা হাসি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ওহো, আপনি যে ভাল ছেলে সে কথা মনে ছিল না।

শঙ্কর গম্ভীর ভাবে বলিল, মনে থাকা উচিত ছিল!

সোনাদিদি পাশের টেবিলে রিণিকে বলিলেন, প্রকাশ-বাবু বলছেন খুব ভাল একটা ফিল্ম্ হচ্ছে, যাবি?

তোমরা যাও ত যাব।

অপূর্ব্ববাবু যাবেন? সোনাদিদি প্রশ্ন করিলেন।

মিহি গলায় অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, খুবই সুখী হতাম যেতে পারলে! কিন্তু আমার টুইশনি আছে, মিস্ বেলাকে পড়াতে যেতে হবে—

শঙ্কর চকিতে একবার রিণির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না।

সোনাদিদি বলিলেন, মিস বেলা? মানে, বেলা মল্লিক? সে ত দু'দুবার ম্যাট্রিক ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল শুনলাম। আবার পড়া সুরু করেছে না কি?

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া নিতান্ত লাজুক কণ্ঠে অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, আমি গান শেখাই তাঁকে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রিণির দিকে চাহিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ও—

ইহার উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে অপূর্ব্ববাবু কি একটা বলিলেন, কিন্তু চতুর্থ টেবিলে উপবিষ্ট আনন্দিত সর্দার প্রতাপ সিংয়ের অট্টহাস্যে তাহা আর শোনা গেল না। চতুর্থ টেবিলে প্রতাপ সিং ও মিষ্টিদিদি বসিয়া আলাপ আপ্যায়ন সহকারে চা-পান করিতেছিলেন।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল অস্তগামী রক্ত-কিরণ-রেখা মিষ্টি দিদির জরির আঁচলাটায় পড়িয়া জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

পাশের টেবিলের প্রকাশবাবু সোনাদিদিকে বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না ত, এঁকে এর আগে আপনাদের বাড়ীতে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

সোনাদিদি আলাপ করাইয়া দিলেন।

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, এই সুসজ্জিত ফ্যাসান-দুরস্ত

অধিবেশনে প্রকাশবাবু লোকটি একটু বেমানান গোছের সাদাসিধা। গলাবন্ধ গরমের কোট গায়ে এবং তদুপরি একটি মোটা গোছের খদ্দরের আধময়লা চাদর। দাড়িটা পর্য্যন্ত যেন দুই দিন কামানো হয় নাই।

সোনাদিদি পরিচয়-সূত্রে বলিলেন, প্রকাশবাবু হচ্ছেন আমাদের অগতির গতি, কোন বিপদে পড়ে প্রকাশবাবুর শরণাপন্ন হ'লে বাস্ নিশ্চিন্ত! তাছাড়া জানেন, উনি একজন খুব ভাল হোমিওপ্যাথ!

প্রকাশবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মিসেস্ রায়, অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি ত এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন; আমার ওপর এত বেশী মনোযোগ দিলে ওঁদের অপমান করা হবে যে—

প্রকাশবাবুর টেবিলে যে মহিলাটি ছিলেন তিনি এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ব্যাচিলার মানুষকে একটু জ্বালাতন করে মিসেস রায় আনন্দ পান, তার থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না। বেশ তাহলে করুন।

প্রকাশবাবু সস্মিতমুখে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শঙ্কর হেদুয়ার ধারে একটা বেঞ্চে একা বসিয়াছিল। প্রফেসার মিত্রের বাড়ী হইতে সে হস্টেলে ফেরে নাই। আজিকার দিনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাহার মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের সংসর্গে তাহার বৈকালটা কাটিল তাহারা যেন অন্য জগতের প্রাণী—স্বপ্ন-জগতের। কথাবার্ত্তা ব্যবহার কেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ষ্ট সজীব সুন্দর। সুরমা এই জগতের লোক। ইহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া সে মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করিল।··· স্টেশনে উৎপল সেদিন যাহা বলিয়াছিল তাহা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহা ত একেবারেই অসম্ভব। কল্পনা করাও বাতুলতা। রিণির মত মার্জ্জিতরুচি যুবতী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কেন? কিন্তু ওই অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিতকে ত রিণি সহ্য করিতেছে। এই কথা মনে হওয়ায় শঙ্কর সোজা হইয়া বসিল। রিণিকে সে নিজে বিবাহ করিতে পারুক আর না পারুক, অপূর্ব্বকৃষ্ণের হাত হইতে তাহাকে সে রক্ষা করিবে।

কে রে শঙ্কর, এখানে একা কি করছিস? আজ কলেজ থেকে তুই হস্টেলে পর্য্যন্ত ফিরিস নি, ব্যাপার কি বল ত?

শঙ্করের রুম-মেট কানাই।

শঙ্কর বলিল, একটা নেমন্তন্ন ছিল।

চল এবার যাওয়া যাক্, আটটা ত বাজে—

চল্।

দুইজনে গল্প করিতে করিতে হেদুয়া হইতে বাহির হইল। হেদুয়ার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে সহসা কানাই বলিল, ওহো, তোর তিরিশটা টাকা এসেছে আজ মণি-অর্ডারে। সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট তোকে দিতে এসেছিলেন, তোকে না পেয়ে আমাকেই দিয়ে গেলেন। বললেন তোকে দিয়ে দিতে। সঙ্গেই আছে আমার—এই নে—

কানাই পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া তিনটি নোট ও একটি কুপন শঙ্করের হাতে দিল। শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে তাহা পকেটে পূরিল।

ট্রাম আসিল।

উভয়েই চড়িয়া বসিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে বলিল, আমার একটু দরকার আছে, তুই যা, আমি আসছি একটু পরে। চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

ট্রাম চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

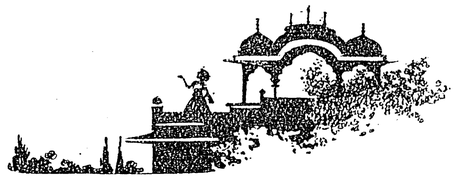

অপরাধতত্ত্বে নারীর স্থান

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সাধারণ উপলব্ধি হইতে বোঝা যায় যে, পুরুষ অপেক্ষা নারী অপরাধের পর্য্যায়ে অনেক নিম্নে। অনেকের মতে নারীর অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত হইবার বয়স দুইটী—একটী হইল যখন তাহার সবে যৌবনে পদার্পণ করিবার সময় হইয়াছে অর্থাৎ ১৪ বা ১৫ বৎসর; আর একটী হইল যখন বয়সের আধিক্য হইয়াছে অর্থাৎ অন্যান্য উপায়ে সহজে রোজগার করার সম্ভাবনা চলিয়া যায়। ওটিজেন (Ettingen) বলেন নারী সাধারণত পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে বিপথগামিনী হইয়া থাকে। কোয়েটলেটের (Quetlet) অভিমত হইল, ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমই নারীর অধঃপাতে যাইবার প্রধান সময়। এক দিক হইতে যেমন দেখা যায়, পুরুষ অপেক্ষা নারী একটু অধিক বয়সেই অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত হয়, অপর দিক হইতে আবার বলা চলে যে, পুরুষ যখন কিছুই জানে না, তারও পূর্ব্বে নারী অপরাধ করিতে পারে অর্থাৎ ১৪ বা ১৫ বৎসর বয়সে। এই সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ-ভাবে আলোচনা করিবার জন্য নিম্নে ভারতবর্ষের বয়ঃক্রম অনুপাতে নারী-অপরাধীর সংখ্যা দেওয়া গেল[১]—

নারী-অপরাধীর বয়ঃক্রম

প্রদেশ	* ২২শ বৎসরের নিম্নে	২২শ হইতে ৪০শ বৎসরের মধ্যে	৪০শ হইতে ৬০শ বৎসরের মধ্যে	৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধে
মাদ্রাজ	১৬২	১,২৮৮	৫৭৪	৪৬
বোম্বে	৮৭	৩০২	৯৬	১৫
এডেন	১	৬	১	×
বাঙ্গলা	৮১	৫৩২	১৭৫	১৬
যুক্তপ্রদেশ	৬৪	২৮০	১২৮	৮
পাঞ্জাব	৩৫	২৩৪	৫৫	৮
ব্রহ্মদেশ	৯৯	৫৮৯	১৯৮	২৪
বিহার ও উড়িষ্যা	৭৫	৪০৭	১৫৬	৪৩
মধ্যপ্রদেশ	২২	১৯২	৬৪	২
আসাম	৯	৪২	১৯	৩
দিল্লী	২৩৭	৯	১	×

উপরিউক্ত অপরাধীর শ্রেণী বয়ঃক্রম অনুপাতে ভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ "২২শ বৎসরের নিম্নে"

(১) ষ্ট্যাটিসটিক্যাল এব্‌স্ট্রাক্ট ফর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৯২৬-২৭ হইতে ১৯৩৫-৩৬ পর্য্যন্ত।

অপরাধীর যে সংখ্যা তাহা হইতে ১৪ বৎসর কি ১৫ বৎসর বয়সে ভারতীয় নারীর অপরাধ সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। তারকা চিহ্নিত ঘরটী সম্বন্ধে ষ্ট্যাটিসটিক্যাল এব্‌স্ট্রাক্টে একটী মন্তব্য দেখা যায় যে, ১৯২৯ সনের পূর্ব্ব অবধি উক্ত ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়স স্থলে ১৬ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়ঃক্রম বলিয়া লিখিত ছিল। এই পরিবর্ত্তনের যথাযথ কারণ কিছু উহা হইতে বোঝা যায় না। তবে সাবালিকা হইবার বয়ঃক্রম পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্য যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, নাবালিকা অবস্থায় নারী কতদূর অপরাধ করিয়া থাকে। উক্ত নাবালিকার কথা মানিয়া লইলে কোয়েটলেট বা অন্যান্য ইউরোপীয় অপরাধতত্ত্ববিদের অভিমত ধরিয়া লওয়া কঠিন। উপরিউক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়ঃক্রমের নারী অপরাধীর সংখ্যা অপেক্ষা ২২ হইতে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের অপরাধীর সংখ্যা অধিক। মাদ্রাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নারী অপরাধী সংখ্যা দৃষ্ট হয়। মাদ্রাজে দেখা যায় যে ২২ বৎসর অবধি বয়ঃক্রম নারী অপরাধীর সংখ্যা হইল ১৬২; কিন্তু ২২ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে যাহাদের বয়স তাহাদের সংখ্যা হইল ১,২৮৮। যখন ৪০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে তখন উহাদের সংখ্যা কমিয়া ৪৭৪ হইয়াছে, আবার যখন ৬০ বৎসর পার হইয়াছে তখন উহাদের সংখ্যা হইয়াছে মাত্র ৪৬জন। দেখা গেল যে মধ্য-বয়স্ক অর্থাৎ ২২ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে অপরাধ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বয়োধিক্যে উহার সংখ্যা লঘিষ্ঠ হইয়াছে। বোম্বে প্রদেশেও ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়সের নারী অপরাধীর সংখ্যা হইল ৮৭, ২২ হইতে ৪০ বৎসরের অপরাধীর সংখ্যা হইল ৩০২, ৪০ বৎসর পার হইলে উহার সংখ্যা কমিয়া ৯৬ হইয়াছে এবং ৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধে নারী-অপরাধীর সংখ্যা হইল মাত্র ১৫জন। এখানেও একই কথা প্রমাণ হইতেছে যে, মধ্য বয়সে নারী-অপরাধীর সংখ্যাধিক্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও ঠিক একই ফলাফল দেখা যাইবে—২২ বৎসরের নিম্নে উহার সংখ্যা হইল ৮১, তাহার ঊর্দ্ধে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নারী-অপরাধীর সংখ্যা হইল ৫৩২ এবং ৪০ বৎসর পার হইলে উহার সংখ্যা কমিয়া ১৭৫ হইয়াছে। তৎপরে ৬০ বৎসরের অধিক হইলে উহার সংখ্যা কমিয়া মাত্র ১৬ হইয়াছে। এখানেও প্রমাণিত হইল যে, মধ্যবয়সেই অপরাধ করিবার প্রবণতা অধিক এবং বয়স বেশী হইলে উহা কমিয়া আসে। বিহার ও উড়িষ্যার সংখ্যা লইলেও ঐ একই জিনিষ প্রমাণিত হইবে। প্রথমে ৭৫, তৎপরে ৪০৭ (২২শ হইতে ৪০ মধ্যে), তাহার পর ১৫৬ এবং ৬০ বৎসরের অধিক হইলে সংখ্যা মাত্র ৪৩ জন। বাঙ্গলা এবং বোম্বে অপেক্ষা মাদ্রাজ এবং বিহার-উড়িষ্যাতে অধিক বয়সের নারীর অপরাধ সংখ্যা অধিক। ব্রহ্ম-দেশেরও নারীর অপরাধের গতি একই প্রকারের। ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়সে দেখা যায় যে, উহার সংখ্যা ৯৯, তাহার পর ২২ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের নারী-অপরাধীর সংখ্যা হইল ৫৮৯, ৪০ হইতে ৬০ বৎসরের নারী-অপরাধীর সংখ্যা হইল ১৯৮ এবং ৬০ বৎসরের অধিক হইলে উহার সংখ্যা হইয়াছে মাত্র ২৪জন। মধ্যপ্রদেশেও প্রথমে উহার সংখ্যা ২২, তাহার পর ১৯২, তাহার পর ৬৪ এবং শেষে মাত্র ২ জন।

কাজেই ইহা এখন বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের সংখ্যা লইয়া পরীক্ষা করিলে প্রমাণিত হইবে যে, বয়সের আধিক্যের সহিত অপরাধ সংখ্যা কমিয়া যায় কিন্তু বৃদ্ধি পায় না। আর এক কথা হইল মধ্যবয়সেই অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি বা আবেগ অধিক, কিন্তু অল্প বয়সে অর্থাৎ ২২ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়সে অপরাধসংখ্যা স্বল্প। উপরে উক্ত ইউরোপীয় অপরাধতত্ত্ববিদগণের মন্তব্যের সহিত এখানে যে সিদ্ধান্ত করা গেল, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক; কারণ তাঁহাদের মতে নারী-অপরাধের আধিক্য দুইটী সময়ে পরিলক্ষিত হয়—একটী প্রাক্‌যৌবনে (১৪-১৫ বৎসর বয়সে) আর একটী বেশী বয়সে অর্থাৎ (৪০এর উপরে) ইহার কোনটীই ভারতের সহিত মেলে না।

এ স্থলে সাদারল্যাণ্ডের মতও উপরিউক্ত কোয়েটলেট বা ওটিনজেনের মতের বিরুদ্ধ। তিনি বলেন, "females are committed most frequently, as are males, in the age group 21-24, but the ratio of female commitments to male commitments is highest at the age of fifteen, probably because girls reach puberty at an earlier age than boys. The ratio of commitments of females to commitments of males is lowest

in the groups below the age of twelve and after the age of forty-five." (২)(বাঙ্গলা—যেরকম ভাবে পুরুষের ২১-২৪ বয়ঃক্রম কালে অভিযুক্ত হওয়ার সংখ্যা অধিক, সেই অনুপাতে স্ত্রীলোককেও উক্ত বয়ঃক্রমের মধ্যে অভিযুক্ত হইতে খুব বেশী দেখা যায়, কিন্তু ১৫ বৎসর এবং তন্নিম্ন বয়সে পুরুষের অপরাধ অনুপাতে স্ত্রীলোকের অপরাধ সংখ্যা অধিকতর ইহার কারণ খুব সম্ভবত ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের অল্প বয়সে দৈহিক পূর্ণতা লাভ করে। বারো বৎসরের নিম্নে এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের অপরাধ সংখ্যা নিম্নতম।) ভারতবর্ষের প্রধান প্রদেশগুলিতে নারীর অপরাধ সংখ্যা যোজনা করিয়া পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বেশী বয়সে নারীর অপরাধ সংখ্যা কমিয়া যায়, তাহার সহিত সাদারল্যাণ্ডের বক্তব্য প্রায় একই রকমের। কিন্তু ১৫ বৎসর বয়সে কি হয় তাহার সম্বন্ধে মতবাদ নির্দ্ধারিত করিয়া বলা সুকঠিন, কারণ আমাদের দেশে ঠিক ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের অপরাধীর সংখ্যা পাওয়া যায় না।

নারী-অপরাধের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়, যাহা পুরুষের মধ্যে একেবারে নাই যেমন গর্ভনাশ করা। দ্বিচারিণী হওয়া, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, পুরুষের অপরাধে সাহায্য করা, বিষ ভক্ষণ করান, বাড়ীতে অগ্নি দেওয়া, এবং ছোটখাট চুরি প্রভৃতি অপরাধের সহিত নারীর সংযোগ অধিক মাত্রায় দেখা যায়। খুন, জখম, মারপিট, জুয়াচুরি —এই সকল অপরাধে নারীকে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায় না। যেখানে শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তির বেশী দরকার সেখানে নারী অগ্রসর হয় না। অষ্ট্রিয়াতে স্ত্রীলোক অপরাধীর মধ্যে গর্ভনাশ, অন্যের অপরাধে যোগদান, বাটীতে অগ্নিদান এবং চুরি প্রভৃতি বিষয়ে অধিক পরিমাণে অভিযুক্ত হইতে দেখা যায়। ফরাসী দেশে স্ত্রীলোকে শিশুহত্যা, গর্ভনাশ, বিষ খাওয়ান, স্বামীহত্যা, শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইংলণ্ডের নারীকে জাল টাকা চালাইবার সাহায্য করিতে, মিথ্যা অভিযোগ বা দোষারোপ করিতে এবং নরহত্যা করিতে অধিকাংশ সময়ে দেখা যায়। কিন্তু নারীকে জটিল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বিজড়িত থাকিতে খুব কমই দেখা যায়। এ সম্বন্ধে Lombroso বলেন, "To conceive an assassination, to make ready for it, to put it into execution demands, in a great number of cases at least, not only physical force, but a certain energy and a certain combination of intellectual functions. In this sort of development women almost always fall short of men." অর্থাৎ একটা হত্যার পরিকল্পনা করিতে, তাহার জন্য তোড়জোড় করিতে এবং তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য শুধুই দৈহিক শক্তির যে আবশ্যক তাহা নহে, উহার সহিত কতকটা উৎসাহ এবং বুদ্ধিবৃত্তির সংমিশ্রণও প্রয়োজন। পুরুষ অপেক্ষা নারী এই সকল বিষয়ে একেবারে পশ্চাৎপদ।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষের নারীদের মধ্যে যে সকল অপরাধ প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোকের একটী ইংরেজী অনুবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সেই সকল অপরাধের জন্য স্ত্রীলোককে সমাজচ্যুত করা হইত। শ্লোকের ইংরেজী অনুবাদের কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল, যেখানে দেখান হইয়াছে কোন্ কোন্ অপরাধে নারীকে উপরিউক্ত শাস্তি দেওয়া বিধিগত ছিল— "Sexual intercourse with a low caste man, causing abortion of a child in her womb: and killing her husband: these are certainly additional causes of women's special degradation.৩—অর্থাৎ, নিম্নজাতির সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকায়, গর্ভনাশ করায় এবং স্বামীহত্যা করায় স্ত্রীলোকের বিশেষ অপরাধের সূচনা হয়। ইহা ব্যতীত গণিকাবৃত্তি বা অসৎচরিত্রা নারীর জন্যও বহুবিধ নিয়ম হিন্দুশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই স্থলে স্ত্রীলোকের শাস্তির বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের মত আরও লিখিত হইয়াছে—"A woman guilty of unchastity shall be deprived of her position and possessions, shall wear dirty clothes, shall live upon starving maintenance, shall be humiliated and made to sleep on bare ground···A woman guilty of

(২) "ক্রিমিনলজি": এডউইন সাদারল্যাণ্ড, ১৯২৪, পৃঃ ৯২-৯৩ দ্রষ্টব্য।

(৩) যাজ্ঞবল্ক্য, iii, ২৯৮ পৃঃ

adultery is purified by catemenia; but abandont is ordained in case of conception by adultery and in case of causing abortion or killing the husband as well as in case of committing heinous sins."৪—অর্থাৎ সতীত্বহীনতার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে নারী পদচ্যুতা ও সম্পত্তিচ্যুতা হইবে, কাপড় পরিধান করিবে, কেবলমাত্র জীবনধারণের উপযোগী সে ময়লা আহার্য্য পাইবে, বিনিন্দিত হইবে এবং নগ্নভূমিতে শয়ন করিবে। যে-স্ত্রীলোক অপর পুরুষের সহিত ব্যাভিচারিণী হইয়াছে তাহার ঋতু হইলে মুক্ত হইতে পারে কিন্তু ব্যাভিচারজনিত গর্ভাধান হইলে, গর্ভনাশ করিলে অথবা স্বামীহত্যা করিলে অথবা ঐ ধরণের অতি নীচ পাপ করিলে, তাহার সমাজচ্যুতি হওয়া অনিবার্য্য।

স্ত্রীলোকের অপরাধের বিশেষত্বের মধ্যে দুইটী প্রধান এবং সেই দুইটী স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভবপরও নহে। তন্মধ্যে প্রথমটী হইল গণিকাবৃত্তির অপরাধ এবং দ্বিতীয় হইল গর্ভনাশ করা এবং তৎসম্পর্কে সাহায্য করার অপরাধ। নিম্নে পর পর দুইটী বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

নাইন্‌টীন্থ সেঞ্চুরি চেম্বার্স ডিকস্‌নারিতে গণিকা বা "প্রস্‌টিটিউট" কাহাকে বলে তাহার বর্ণনায় লিখিয়াছে, "to expose for sale for bad ends."—অর্থাৎ অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য নিজেকে বিক্রয়ার্থে মুক্ত রাখা। এখানে অসৎ উদ্দেশ্য অর্থে কামপ্রবণতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে। গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর "হিন্দুল" নামক পুস্তকে "প্রস্‌টিটিউট" (গণিকা) সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল: "When a woman leaves her father's or husband's house where she has been living and goes away with a paramour and lives with him elsewhere, she is ordinarily called a prostitute by the Hindus and as such is assumed to be degraded."—অর্থাৎ যখন কোন স্ত্রীলোক পিতা কিম্বা স্বামীর বাটী, যেখানে সে বসবাস করিয়া থাকে, পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়ীর সহিত চলিয়া গিয়া অন্যত্র বাস করে, তাহাকে হিন্দুমতে সাধারণত বেশ্যা বলিয়া গণ্য করা হয় এবং সেইজন্য সমাজচ্যুতা বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু মেনের হিন্দুল (পৃঃ ৬১-৬২) হইতে মনে হয় যে, গণিকাবৃত্তিকে হিন্দুরা এককালে মানিয়া লইয়াছিল এবং তাহাদের জীবনের ও তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য বিশেষ আইনও দৃষ্ট হয়। হিন্দু আইন অনুসারে তাহাদের জাতিচ্যুতি এবং সমাজচ্যুতি হইত সত্য, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইত না। ১৮৬১ খৃঃ অঃ পেন্যাল কোড না হওয়া পর্য্যন্ত গণিকাবৃত্তির কোন অংশই আইনবিরুদ্ধ ছিল না।[৫] অপরাধ-বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে গণিকাবৃত্তি সামাজিক অপরাধ বলিয়া সর্ব্বত্রই গণ্য হইয়া আসিতেছে। সকল দেশেই ইহাকে অন্যায় বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু তথাপি ইহার স্থানও কিছু না কিছু মানিয়া লওয়া হইয়াছে। সভ্য দেশের মধ্যে কোথাও কোথাও ইহার মূল উৎপাটন করিবার চেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু ফলে দেখা গিয়াছে যে তাহার পরিণতি শুভ না হইয়া অশুভই হইয়াছে। ফরাসী দেশে একাদশ লুইর রাজত্বকালে ইহার দূরীকরণের জন্য প্রকৃষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। বেত্রাঘাত করা, ফাঁসি দেওয়া প্রভৃতি ভীষণ ও ভয়াবহ শাস্তিও এই অপরাধের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। আইনের সহিত সমাজ-বিজ্ঞানের যতটা সম্বন্ধ তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আইন দ্বারা কোথাও ইহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং কোথাও ইহার নিবারণ করা ব্যর্থ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কাজেই এখন অপরাধ-বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহার নিবারণ প্রচেষ্টা কত দূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা সন্দেহের কথা। বিজ্ঞানের কার্য্য হইল প্রত্যেক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা এবং কার্য্য-কারণ নিরূপিত হইলে একটা সাধারণ তথ্য স্থির করা। এখানেও আমরা প্রথমে চেষ্টা করিব যে, ইহার কারণ কি কি হইতে পারে এবং তৎপরে দেখিব যে, তাহা কোন উপায়ে নিবারিত হইতে পারে কি-না।

গণিকাবৃত্তির কারণ কি কি হওয়া সম্ভব তাহা লইয়া মতদ্বৈধ থাকিলেও মূল নীতি বিষয়ে সকলেই একমত।

(৪) যাজ্ঞবল্ক্য, i, ৭০-৭২ পৃঃ

(৫) "On the other hand, until the passing of the Penal Code in 1861, no aspect of prostitution was illegal; and the Courts recognised and gave effect to the usages of that class as relating to rights of property, etc. p, 62.

সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থাই যে একমাত্র কারণ তাহা বলিলে হয় ত ভুল থাকিয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে উপরিউক্ত কারণ দুইটীই অবশ্যম্ভাবী, যদিও অন্যান্য কারণ উহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। এ স্থলে ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রের মতে আমরাও আলোচনা বুঝাইতে গেলে বলিব, The existence of all the necessary conditions (including the positive and the negative) to bring about a particular phenomena together form a cause.—অর্থাৎ একটী বিশেষ ঘটনার জন্য যে যে আবশ্যকীয় অবস্থার (অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থা ধরিয়া) প্রয়োজন তাহাদিগকে একত্রে লইলে কারণ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কাজেই কোন একটী অবস্থা বা দুইটী অবস্থাই যে কারণ তাহা নাও হইতে পারে; হয় ত একের অধিক অবস্থার অস্তিত্বই অনেক সময়ে কারণস্বরূপ হয়। এ স্থলেও কেবলমাত্র সামাজিক বা কেবলমাত্র আর্থিক বা মানসিক অবস্থাই কারণ তাহা বলিলে বিজ্ঞানসম্মত হইবে না। এসাফ্যানবুর যেমন দেখাইয়াছেন, অপরাধীর মনস্তত্ত্ব যে সকল নারীর মধ্যে অধিক তাহাদের অধিকাংশই গণিকা-বৃত্তি অবলম্বন করে। কারণ উহাতে চুরি, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ করিবার বিশেষ সুযোগ পায় এবং গণিকাবৃত্তির দ্বারা সহজে ও বিনা পরিশ্রমে রোজগার করা যায়। "Prostitution does absorb a considerable percentage of criminality minded women. Those few prostitution who make a practice of robbing, he believes to be first of all, thieves, who have turned to prostitution because it affords the easy way of stealing." ষ্ট্রম্‌বার্ (Strrohmberg) বেশ্যাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী দেখাইয়াছেন—একটী হইল অলস শ্রেণীভুক্ত এবং আর একটী হইল গণিকাবৃত্তির সহিত আরও দু-একটী কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি বলেন বেশ্যাবৃত্তির সহিত "অপরাধ" একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত। এতক্ষণ অবধি আলোচনার মূল নির্দ্দেশ হইল—আর্থিক অবস্থাই গণিকাবৃত্তির মূল কারণ। কিন্তু এসাফানবুর এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে, "But we must not forget that a large number are led to adopt these dangerous occupations by their strong sexual impulses and their lore of dress and an apparently comfortable life."—অর্থাৎ, কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে ইহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক নারী এই বিপদসঙ্কুল ব্যবসায় অবলম্বন করে নিজেদের কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য, ভাল সাজসজ্জার বাসনা মিটাইবার জন্য এবং আপাতমধুর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। এখানেই এসাফানবুর স্থির হন নাই, তিনি আরও বলিয়াছেন, "undoubtedly our social conditions—miserable economic circumstance and the fact that prostitutes are not restricted to certain localities—are the cause of prostitution—" অর্থাৎ, ইহা নিঃসন্দেহ যে আমাদের সামাজিক অবস্থা, শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এবং বারবণিতারা যে একটী বিশেষ স্থানে আবদ্ধ থাকে না এই সকলই বেশ্যাবৃত্তির কারণ। বনহফার (Bonhoffer) বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বারবণিতার অপরাধভুক্ত হওয়ার কারণ হইল বিকৃত মানসিক অবস্থা। তবে মূলত ইহার দুইটী কারণ চোখে পড়ে; প্রথম হইল, নারী বিক্রয় ব্যবসা অথবা নারীকে বিপথে লইয়া যাওয়ার ব্যবসা এবং দ্বিতীয় হইল, তাহাদের অর্জ্জনের উপর নির্ভরশীল পুরুষের দল পিছনে থাকে তাহারা। লোকাটেল (Locatell) বলেন যে, তাঁহার মতে গণিকাবৃত্তি চুরি অপরাধের মত কতগুলি ব্যক্তিগত স্বাভাবিক কু-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত। শিক্ষার অভাব, পরিত্যক্ত হইয়া জীবনযাপন করা, দারিদ্র্য এবং কু-আদর্শ প্রভৃতিকে প্রাথমিক কারণরূপে গণ্য করা যায় না বরং সাহায্যকারী অবস্থা বলা চলে।

কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া উপরে যে মতামত আলোচনা করা গেল তাহা নিয়মিতভাবে শ্রেণীভুক্ত করিলে তিনটী হয়—প্রথম সামাজিক, দ্বিতীয় আর্থিক এবং তৃতীয় মানসিক। সামাজিক কারণের মধ্যে দেখা গেল যে, পরিত্যক্তা নারী, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কু-আদর্শ এবং পৃথকীকরণের ব্যবস্থা-শূন্যতা। কিন্তু ইহার সহিত আরও একটী কারণ সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, তাহা হইল সমাজের গোঁড়ামি বা ভাল হইবার পথরুদ্ধকরণের ব্যবস্থা। শেষোক্ত কারণটী বিশদ ভাবে বলিলে দেখা যাইবে যে, যে সকল বালিকা কোন কারণে একবার পদস্খলিত হইয়া বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভবতী হইয়া পড়ে তাহাদিগকে হয় ভ্রূণহত্যার পাপে বিজড়িত হইতে হয় অথবা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। অনেক সময়েই তাহারা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে, কারণ দেখে যে হয় ত তাহার জীবনে আর ভাল হইবার আশা নাই অথবা সমাজে মাথা নীচু করিয়া থাকা অপেক্ষা মৃতভাবে আর একটী দলভুক্ত হওয়া ভাল। দ্বিতীয় কারণ, আর্থিক কারণ আলোচনা করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, সহজ রোজগার, ভাল সাজসজ্জা এবং দারিদ্র্যই হইল ইহার বিভিন্ন রূপ। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে, দারিদ্র্যই নারীকে অধিকাংশ সময়ে বিপথে লইয়া যায়। যেখানে স্বাধীনভাবে সংস্থানের উপায় থাকে সেখানেও অপ্রাচুর্য্যের জন্য বহু নারী গুপ্তভাবে এই জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও কার্য্য পাইবার লোভেও নারীকে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির আশ্রিতা হইতে হয়। ধাত্রী, নার্স, বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, ক্যানভাসার প্রভৃতি কার্য্যে

প্রায়ই এইরূপ একটা বিচিত্র অথচ দৈনন্দিন অবস্থার সমাবেশ হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতে কারখানার স্ত্রী-মজুরদের, আসামে চা-বাগানের কুলিমজুরদের মধ্যে এইরকম চরিত্র-শৈথিল্য অধিক লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তৃতীয় কারণ হইল মনস্তত্ত্ববিষয়ক। মানসিক বিকার হেতু অনেকেই এই ভুল পথ অবলম্বন করে। উত্তেজনাও বহুল পরিমাণে গণিকা-বৃত্তির কারণ বলিয়া দেখা যায়, তবে অধিকাংশ স্থলে কু-প্রবৃত্তিকে কারণ বলিয়া অপরাধতত্ত্ববিদগণ দেখান, তাহার মধ্যে আরও একটু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রবৃত্তির মূলে দুইটী জিনিষের প্রভাব অধিক—শিক্ষা এবং জন্মগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। পিতামাতা যদি মদ্যপান অথবা কোন দোষযুক্ত হয় তাহা হইলে সন্তানের মধ্যে পানদোষ আসিতে পারে এবং সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে নারীকে বারবণিতা হইতে দেখা গিয়াছে। শিক্ষার অভাবে যে শত সহস্র নারী এই পথে আসিয়া পড়ে তাহা বলা বাহুল্য। নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল যাহা হইতে বোঝা যাইবে যে, অভিযুক্ত নারী অপরাধীর মধ্যে কত পরিমাণে অশিক্ষিতা এবং কত পরিমাণে শিক্ষিতা নারী আছে। অবশ্য তালিকা হইতে গণিকাবৃত্তির অপরাধে শিক্ষার অভাবে কতজন নারী অভিযুক্তা তাহা বোঝা যাইবে না কিন্তু সাধারণ অপরাধের ধারা ও শিক্ষার কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে কতকটা নির্দ্দেশ করিবে মাত্র।

প্রদেশ হিসাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অপরাধীর সংখ্যা তালিকা নিম্নে দেওয়া (ক) গেল।

প্রদেশ	শিক্ষা			
	যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে		যাহারা লিখিতে বা পড়িতে কিছুই জানে না	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
মাদ্রাজ	৫,৭২৪	৪	২৮,৬০৩	১,৯৬৬
বোম্বাই	৩,৫৭৯	৩	১৪,৯৬১	৪৯৭
এডেন	৬৭	×	২৭৪	৮
বঙ্গদেশ	৭,২৬৩	১৫	৩২,৪৭৭	৭৮৯
যুক্ত প্রদেশ	১,০৪২	৩	৩০,৭৯০	৪৭৭
পাঞ্জাব	১,৪৮৫	২	৩০,৭৬৫	৩৩০
ব্রহ্মদেশ	১৬,৭০৬	১৫১	৫,৮৬১	৭৫৯
বিহার এবং উড়িষ্যা	২,৫১৫	৫	২০,৫৫৯	৬৭৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,২২৮	১	৬,৫৬৯	২৭৯
আসাম	১৬১	১	৫,০১৭	৭২
উঃ-পঃ-সীমান্ত প্রদেশ	২২৫	×	৭,৮৪৫	১৪৭
বৃটিশ বেলুচিস্তান	৮৫	×	৮৩৭	১২
আজমির-মেরওয়ারা	১০২	১	৪৯৩	১৬
কুর্গ্	২৭	×	৩৮	২
দিল্লী	১৬০	×	১,০৩৬	১০

(ক) তালিকার সংখ্যা "ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল এব্‌সট্রাক্ট অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৯২৬ হইতে ১৯৩৬-৩৭," পৃঃ ২৭১ হইতে গৃহীত।

উপরিউক্ত তালিকা হইতে বোঝা যাইবে যে, অপরাধীর শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোক সংখ্যা কত বিরল। ব্রহ্মদেশে কেবল ১৫১ জন এবং অন্যান্য দেশে ১ হইতে ১৫ জনের মধ্যে সংখ্যা রহিয়াছে। কিন্তু লেখাপড়া না-জানার সংখ্যা কত অধিক তাহা তুলনামূলকভাবে দেখিলে আতঙ্কিত হইতে হয়। ৭৮৯ জন স্ত্রীলোক অপরাধী বাঙ্গলার ভাগ্যে রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকের সংখ্যা হইল মাত্র ১৫ জন। এ স্থলে অধিক বলা বাহুল্য যে, শিক্ষার অভাব আমাদের দেশে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কতকটা সাহায্য করে। এই কথা প্রত্যেক প্রদেশের বিষয়ে সমান ভাবে উপযোগী।

এতক্ষণ দেখা গেল যে, কি কি সন্তবপর কারণের জন্য নারী গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। বাস্তবিক পক্ষে বিচার করিলে বোঝা যায় যে, গণিকাবৃত্তি আর্থিক এবং সামাজিক কারণের মধ্য পথে রহিয়াছে এবং ইহাও বলা চলে যে বাস্তব অপরাধ ও সাধারণ কর্ম্মস্তরের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করিতেছে। যদিও যৌনসম্বন্ধ লইয়াই ইহার উৎপত্তি কিন্তু প্রকৃষ্ট সংশ্রব হইল অর্থের সহিত। যে দিন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় গঠনে আমূল পরিবর্ত্তন হইবে এবং অর্থের অভাব হেতু মানুষকে মনুষ্যত্ব বলি দিবার পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যবস্থা হইবে সেই দিনই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান সম্ভব। প্রচলিত সমাজবন্ধনের মধ্যে সামান্য উন্নতি যদি আনয়ন করিতে হয় তাহা হইলে প্রকৃত সমাজের অস্তিত্ব থাকা বা সঙ্ঘের সৃষ্টি হওয়া বিশেষভাবে আবশ্যক এবং সমাজের সাধারণের মধ্যে অন্ধ বা অজ্ঞতা নিবন্ধন পতিতা ভগ্নীদিগকে সহানুভূতি ও জ্ঞানের স্পর্শে আবার দেবীত্বে বরণ করিয়া লওয়ার চেষ্টা থাকা কর্ত্তব্য। যদি ক্রমান্বয়ে একজনকে "পাগল" সকলেই বলিতে থাকে তাহা হইলে সে পাগল না হইলেও তাহাই সাব্যস্ত হইয়া যায়, তদনুরূপ পতিতার দেহ সাময়িকভাবে কলুষিত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে যদি অবজ্ঞার চোখে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে তাহা হইলে সে অবজ্ঞার ভাজনই হইয়া থাকিবে নিশ্চয়। অন্যায়ের জন্য শাস্তিও যেমন আবশ্যক, ভ্রান্তির জন্য ক্ষমাও তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন। লোকমত বা সামাজিক আবহাওয়ায় জীবনের রুদ্ধ দ্বারটী মুক্ত হইয়া গেলে আজ যে পদদলিতা সেও সমাজকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করিতে পারে। জ্ঞানের আলোক যদি স্পর্শ করে অজ্ঞতার তিমির অপসারিত হইতে কতক্ষণ? সহস্র চেষ্টার ফলে যদি দুটী লাঞ্ছিত প্রাণী সত্যই উদ্ধার হয় তাহা হইলেও সমাজ যে কত উচ্চে স্থান পাইবে সে কথা চিন্তাশীলের প্রাণে স্পষ্টই জাগিয়া উঠে।

নারী-অপরাধের বৈশিষ্ট্য আর একটী শ্রেণীর কার্য্যে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। তাহা হইল ভ্রূণ-হত্যার অপরাধ। এ স্থলে ভারতীয় পেন্যাল কোডের যাহা আইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল—"Voluntarily causing a woman with child to miscarry otherwise than in good faith for the purpose of saving the life of the woman" all under offences relating to the birth of children. —অর্থাৎ, স্ত্রীলোকেরা জীবন বাঁচাইবার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে গর্ভনাশ করিলে শিশু-জন্ম বিষয়ক অপরাধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর অপরাধে স্ত্রীলোকেই অধিকাংশ সময়ে সাহায্যকারিণী অথবা নিজেই উক্ত অপরাধ করিয়া থাকে। ইহার মূলেও সমাজের খড়্গ-হস্ত রহিয়াছে। অন্যায় যদি হঠাৎ হইয়া যায় ও তাহার জন্য যদি ক্ষমা না থাকে, তখনই মানুষে সাধারণতঃ পাপের লুক্কায়িত অন্ধকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চায়।

সমাজ বা লোকলজ্জার ভয়ে স্ত্রীলোককে যে কি ভীষণ পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহা ভাবিলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। পাপের বা অপরাধের কথা বাদ দিয়া ধরিলেও দৈহিক কষ্ট এবং লুক্কায়িত কার্য্যের গুপ্তভাব সংরক্ষণের জন্য অর্থলোলুপ সমাজান্তর্গত লোকেরই নিকটে যে অর্থব্যয় করিতে হয় উভয়ই কি সাঙ্ঘাতিক বলিয়া বিবেচিত হয় না? ইহা যে শুধু ভারতেই প্রচলিত আছে তাহা নহে, ইহার বিস্তৃতি সমস্ত দেশেই কিছু না কিছু আছে। এ স্থলে একটী লাইন মেডিক্যাল জুরিস্‌প্রুডেন্স হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"Abortionists are of varying degrees of skill, from the black-sheep of the medical profession, who may perform the deed secundum artem, through the midwife who has some superficial acquaintance with the anatomy of the parts) down to the totally ignorant layman."[১] অর্থাৎ, যাহারা গর্ভনাশ করায় তাহাদের মধ্যে নানা স্তরের নিপুণতাবিশিষ্ট লোক থাকিতে পারে। চিকিৎসকদের মধ্যে দুষ্ট লোকও করিতে পারে। ধাত্রীর সাহায্যে উহা সমাধান করাইতে পারে, (ইহাদের তবু দেহের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বাহ্যিক একটা ধারণা আছে) আবার একেবারে অজ্ঞ লোক দিগের সাহায্যেও ইহা হইয়া থাকে। এই ঘৃণিত কার্য্য এমন ভাবে সমাধা করে যে, অতি অল্প স্থলেই উহা আইনের নজরবন্দী হইতে পারে। আর একস্থলে মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সে লিখিত আছে—"To detect the action of the first class and even the sober attempts of the midwives, is usually quite impossible by strictly medical evidence; it can only be done by enquiry into motives and fees and surrounding circumstances, inquiries more in the province of the detective than of the medical jurist." সমাজের স্কন্ধে যে কত গুরুতর ভার রহিয়াছে এবং সমাজান্তর্গত প্রতি এককের শিক্ষা এবং তৎপরতা কত অধিক হইলে এইসকল স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ হইতে যে সমাজকে মুক্তি দেওয়া যায় তাহা প্রত্যেকেরই চিন্তাকরা বাঞ্ছনীয়। একধারে যেমন শিক্ষার প্রয়োজন আর এক দিকে তেমনই সহৃদয় ক্ষমার প্রয়োজন; একদিকে যেমন অন্যায়ের শাস্তির আবশ্যক আর একদিকে তেমনি প্রকৃত ভ্রান্তির জন্য মুক্তি থাকা আবশ্যক।

আমাদের শাস্ত্রে অনেক সময়ে অন্যায়কে কত সাধারণভাবে এবং সহানুভূতির চক্ষে দেখিত তাহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী শ্লোক উল্লেখ করা গেল। পরাশর কলিযুগের জন্য বলিয়াছেন—

"রজতা শুদ্ধতে নারী বিকলং যা ন গচ্ছতি॥ (৭)

গর্ভবতী না হইলে অপর পুরুষের সঙ্গমজনিত দোষ ঋতুর সহিত চলিয়া যায়। তবে গর্ভবতী হইয়া পড়িলে তাহার জন্য বিশিষ্ট শাস্তির নির্দ্দেশ আছে। অবশ্য ইহা বলিয়া যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেওয়াও মহা-অপরাধ। এ সকল কথা অকস্মাৎ বা অজ্ঞানতা নিবন্ধন পতনের জন্যই উপযোগী, স্বেচ্ছাচারীদের জন্য নহে।

(১) টেলর কর্ত্তৃক "প্রিন্সিপ্লস্ এণ্ড প্র্যাকটিস্ অফ মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স", দ্বিতীয় খণ্ড, লণ্ডন (১৯০৪), পৃঃ ২২৯

(৭) Parasara, "A woman (committing adultery) is purified by catamenia provided she did not conceive."

বিস্ময়

শ্রীঅমিয়মোহন বসু

নীলাভ আকাশ চিরে সোনার ছবি
নেমে আসে ধরণীর শ্যামল বুকে,
আবিরের রঙে রাঙা তরুণ রবি
মধুর হাসিটি লেগে রয়েছে মুখে!

সোহাগে কাঁপিয়া ওঠে কনক লতা—
খোঁপায় খোঁপায় জাগে ফুলের হাসি,
বনের আঁচল-ভরা 'মনের কথা'—
উজাড় করিয়া অলি শুধায় আসি'!

আঁখির আবেশ-মাখা ঘুমের শেষে
পালক মেলিয়া জাগে বনের পাখী,
পুলক মাতন তার নাচন বেশে—
কথার ফোয়ারা যায় পরশ রাখি'!

চকিতে চপল ভাবে বধূরা চলে—
কলসী দুলিয়া ওঠে কোমল কাঁখে,
অলস হাতের ছোঁয়া নদীর জলে—
না জানি গোপনে কার আনন আঁকে!

কি জানি অজানা কোন্ রাখাল ছেলে
বাতাস মিলায়ে দেয় বাঁশীর সুরে,
মাঠের পথে কি মোর দেবতা এলে—
দ্বাপর যুগের সেই মোহনপুরে?

স্বপনে রাঙিয়া ওঠে প্রভাত বেলা—
নিখিল ধরণী যেন আমায় ডাকে,
যেদিকে তাকাই, দেখি কাহার খেলা—
খুঁজিয়া পেলাম এ কি পেলাম তাকে?

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

কিন্তু সে একেবারেই হাল ছাড়িল না। পর দিনই সন্ধ্যায় গিয়া সুকেশবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল; সে যখন জানাইল, সুকেশবাবু তাহাদের প্রধান একজন নেতা, সুতরাং এই সব সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় অগ্রণী হইয়া তাঁহার দাঁড়ান চাই, বড় একটা দায়িত্বও তাঁহার আছে, দাবীও তাহারা করিতে পারে, একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "আমি তোমাদের নেতা কিসে?—তোমাদের এসব সবুজবাদী সাম্যবাদী দল আমি গড়িনি, কাজকর্ম্মেরও পরিচালনা কখনও কিছু করি না। হাঁ, তবে তোমাদের সভায় উভায় ডাক; যখন ডাক, গিয়ে দু কথা বলি—এই মতগুলোর পক্ষে দু কথা যেমন বলা যায়। আর মাঝে মাঝে কিছু আর্থিক সাহায্য যখন এসে চাও সাধ্য মত দিয়ে দিই। তার বেশী কি সম্বন্ধ তোমাদের এই সব দলের সঙ্গে আমার আছে বল্‌তে পার?"

কেমন অপ্রতিভ হইয়াই বিমান পড়িল; একটু থতমত খাইয়া শেষে কহিল, "কিন্তু আমরা ত সর্ব্বদাই আপনার আদেশ মেনে চ'ল্‌ছি। ভলাণ্টিয়ারী কর্‌তে কি পিকেটিং করতে যখনই ডাক্‌ছেন, অমনি এসে হাজির হচ্ছি—"

"অনেক ইস্কুল কলেজের, আরও কত ক্লাবের ছেলেদেরও ডাকি, তারাও আসে। কিন্তু তাতে কি এটা প্রমাণ হয় বিমান যে, আমি এই সব ইস্কুল কলেজের আর এই সব ক্লাবের কর্ত্তা? আর যেথায় ছেলেমেয়েদের যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হবে, কেলেঙ্কারী যা কিছু ঘখন হবে, তার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে—এ দাবী কেউ করতে পারে?"

"না, তা পারে না। তবে আমাদের এই সব দলে—"

"হাঁ, ওদের চাইতে বেশী একটু মেলামেশা হয় ত করি। তোমরা আসছ-যাচ্ছ সর্ব্বদা, সভায় ডাকছ যখন তখন, আর অর্থ সাহায্যও যখনই দরকার হয়—এসে চাইলেই যা পারি দিয়ে দিই। তা ছাড়া, ব'ল্‌তে পার বিমান, তোমাদের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ আমি কখনও গ্রহণ করেছি? কোনও কমিটিতে কখনও যোগ দিয়েছি? তোমাদের কোনও সভা আমি আহ্বান করেছি কখনও? এসব দূরে যাক্, তোমাদের কোনও দলের patron (পৃষ্ঠপোষক) ব'লেও আমার নাম কখনও বেরোয় নি।"

"Patron ব'লে সবুজবাদী সাম্যবাদী আমরা কাউকে স্বীকার করি না—সবাই আমরা সমান—"

"তবে আজ নেতা ব'লে এ দাবী এসে কেন ক'রছ? এ দায়িত্বই বা কেন মাথায় চাপাতে চাইছ?"

মুখখানি বিমানের লাল হইয়া উঠিল; একটু কাল থমকিয়া থাকিয়া কহিল, "দেখুন, আমাদেরই একজন ব'লে আপনাকে আমরা মনে করি। অধিকারে সমতার দাবী যাই করি, বুদ্ধিতে শক্তিতে আর সামাজিক প্রতিপত্তিতে উচ্চনীচ একটা ভেদ যে আছে, সেটা অস্বীকার করতে পারি না।—যাঁরা উচ্চ, সঙ্কটে তাঁদের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশাও বেশী করি, করতে মানুষকে হয়।"

"ঠিক কথা। কিন্তু আমি ত বাস্তবিক—বুঝিয়েই বল্লাম—তোমাদের একজন কেউ নই। হাঁ, তাহলে এ দায়িত্ব আমার থাক্‌ত, এ দাবীও তোমরা কর্‌তে পারতে।"

হাতে মাথাটি রাখিয়া বিমান কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল—ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "বল্‌তে ভরসা পাচ্ছি না, আপনাকে offence (অসন্তোষের কারণও কিছু) দিতে চাই না। কিন্তু আপনার যে ঐ নারী-কর্ম্মিসঙ্ঘ—সেটাও এই দলের একটি অঙ্গ বটে—আর সেখানেও শুন্‌তে পাই—"

একটু ভ্রূকুটি ললাটে উঠিল। যাহা হউক, বিরক্তির এই ভাব চাপিয়া ধীর ভাবেই সুকেশবাবু কহিলেন, "নারী-কর্ম্মিসঙ্ঘ আমার নয় বিমান। মিস্ মিটার ওটা করেছেন, তিনিই চালাচ্ছেন। তবে, হাঁ, আমার উপদেশ সদা সর্ব্বদাই এসে চান, দেখতেও মাঝে মাঝে ডাকেন, আর দরকার মত অর্থ সাহায্য যখন চান, পারি নিজে দিই, কি যোগাড় ক'রে দিই। বহুদিনের একজন বন্ধুও তিনি আমার।"

বিমান তখন কহিল, "ভাল, সাক্ষাৎ দায়িত্ব কিছু আপনার না থাক, দেশের একজন শক্তিমান্ মানুষ আপনি, দেশহিতকর বহু কর্ম্মে বিশেষ অগ্রণীও বটেন। এই যে আমাদের লেডী কমরেডরা এই ভাবে বিপন্ন হ'য়ে পড়ছেন, মর্য্যাদা সব হারিয়ে, আশ্রয় কোথাও একটু কিছু না পেয়ে, একদম অকূল পাথারে ভেসে যাচ্ছেন, অতল পঙ্কে নিমজ্জিত হ'য়ে পড়ছেন, এদের উদ্ধারের একটা চেষ্টা করা লোকসমাজে একটা স্থান এঁদের যাতে হয় তার পক্ষে সহায়তা করা, এটাও কি বড় একটা কর্ত্তব্য ব'লে আপনি মনে করেন না?"

"দুঃখের কথা—অতিবড় দুঃখের কথা বিমান, যে কালস্রোতে নূতন যে ভাবের বন্যা দেশে এসে পড়েছে, তাতে গিয়ে প'ড়ে এইভাবে অতি বিপন্ন হ'য়ে এঁরা পড়ছেন। কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি? এ বন্যা দেশে আমি আনিনি, এর আঘাতের বেগকে প্রতিহত ক'রে ফেরাব সে শক্তিও আমার নাই। সমাজ এদের একটা মর্য্যাদা দিতে এখনও প্রস্তুত নয়। নিজেরাও এরা মর্য্যাদা একটা—অন্তত মর্য্যাদা যে হারায়নি—এটা অনুভব ক'রে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারছে না। আইনে এর কোনও প্রতিকার হবে সে আশা সুদূরপরাহত। আর তা হ'লেই বা কি? মানুষ যেটাকে দুর্নীতি ব'লে পরিহার কর্‌তে চায়, আইন তাকে সুনীতির স্থানে তুলে দিতে পারে না।"

"তা হ'লে সত্যই আপনি প্রতিকার কিছু কর্‌তে পারেন না! চেষ্টাও কিছু—"

"না, আমার সাধ্যাতীত। অধিকারেরও বহির্ভূত। বড় দুঃখিত হচ্ছি বিমান। কিন্তু কর্‌তে কিছুই পারছি নি। তবে তোমরা যদি কিছু পার, আর অর্থসাহায্য দরকার যদি হয়—"

বিমান বলিয়া উঠিল, "আমরা আর কেউ নেই। একা আমি কি কর্‌তে পারি? আচ্ছা, তা হ'লে উঠি এখন। নমস্কার!"

"হাঁ, দাঁড়াও একটু। তোমাদের খরচ-পত্তর—একটা চেক্—না নগদই এই পঞ্চাশটা টাকা বরং আজ নিয়ে যাও।"

হাত গুটাইয়া লইয়া বিমান কহিল, "না, দরকার হবে না কিছু।"

"থাক্‌বে ত এখানে কিছু দিন?"

"থাক্‌ব না।"

"সে কি? এসেছ—পিকেটিং ত চলছেই, কদ্দিন আরও চল্‌বে—"

"পিকেটিং আর কর্‌ব না।"

"তবু খরচ-পত্তর ত কিছু হয়েছে। দুটো-একটা দিন যাই থাক, আরও হবে। আবার ফিরে যেতেও খরচ কিছু লাগবে।"

"একেবারে নিঃসম্বল হ'য়েও আসিনি। ফিরে যেতে—তা খরচ সামান্য যা দরকার হয় যোগাড় ক'রে নিতে বোধ হয় পারব। না পারি, হেঁটেই যাব। নমস্কার!"

বলিয়াই বিমান বাহির হইয়া গেল। চক্ষু দুটি দিয়া টস্ টস্ করিয়া তখন জল পড়িতেছিল। অন্য কাহারও কাছে—না, বৃথা আর কেন যাইবে? এই একই ছলের একটা উত্তর পাইবে।—ঠাকুর মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন! সব ভুয়া!—গ্রাম অঞ্চলে তবু একটু প্রাণের সাড়া, আদর্শবাদে সরল সত্যনিষ্ঠা তবু কিছু আছে। আর এই কলিকাতা শহর বিরাট একটা ছলের বাজার মাত্র!

৩১

"তোমার কাজ হ'য়ে গেলেই ত চ'লে যাবে দিদি?—আমি তখন কি করব? কার কাছে থাক্‌ব?"

পাশাপাশিই দুইজনে বসিয়াছিল। স্নেহে একখানি হাত ফুল্লরার কাঁধে রাখিয়া আর একখানি হাতে হাত ধরিয়া লতা কহিল, "আমি যাব না ফুলু।"

"কিন্তু আমি তোমাকে রাখব কি ক'রে দিদি?—আমার যে—"

কাঁদিয়া ফুল্লরা দুই হাতে লতার গলাটি জড়াইয়া ধরিল।—গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া লতা কহিল, "কেঁদো না, কেঁদো না বোন। তোমাকে রাখ্‌তে হবে না, আমিই থাক্‌ব।"

"থাক্‌বে!—কি ক'রে থাক্‌বে?" বলিতে বলিতে মুখখানি তুলিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে কহিল, "তোমার ত কাজ ক'রে খেতে হবে।"

"থাক্‌তেও ত কোথাও হবে।—তোমার সঙ্গে একবাড়ীতেই পাশাপাশি ঘরে দুজনে থাক্‌ব।"

"এর আগে যেখানে থাক্‌তে—"

"আগে—এই তোমার এখানে আসবার আগে—মিসেস চম্পটীর ওখানে ক'দিন ছিলাম। তা—সেখানে আর থাক্‌ব না, সুবিধেও হবে না।"

"এই কাজ কদ্দিন করছ?"

একটু হাসিয়া লতা কহিল, "সবে এই সুরু করেছি ভাই—তোমারই কাছে?"

"ও!—তা সে ত মিসেস্ চম্পটীই লাগিয়ে দিয়েছেন। তা এখন নতুন কাজকর্ম্ম—"

"তিনিই বোধ হয় যোগাড় ক'রে দেবেন। আপাতত তাঁর উপরেই নির্ভর কর্‌তে হবে। তার পর দেখি—একটু জানাশুনো যদি হ'য়ে যায়, নিজেই বোধ হয় যোগাড় ক'রে নিতে পারব।—তাই বলছিলাম, তোমার সঙ্গে একবাড়ীতে পাশাপাশি থাক্‌তে কোনও অসুবিধে আমার হবে না। একসঙ্গেই তোমাকে নিয়ে থাক্‌তে পারতাম।—তবে আমার বিধবা মা আছেন কাশীতে আমার ছেলেটিকে নিয়ে, তিনি যখন এখানে আস্‌বেন—"

"না, একসঙ্গে আমাকে নিয়ে কি ক'রে তিনি থাক্‌বেন?"

চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল। আঁচলে মুছিয়া কহিল, "তা একবাড়ীতে—পাশাপাশি থাকতে ত আপত্তি তিনি করবেন না?"

"না, তা করবেন না।"

কিছুক্ষণ কি ভাবিতে ভাবিতে লতার মুখপানে চাহিয়া ফুল্লরা কহিল, "একটা কথা ভাব্‌ছি দিদি, তা কিছু মনে ক'রো না—তুমি ত দেখ্‌ছি সধবা। নিজে কাজ ক'রে খেতে হ'চ্ছে, ছেলেটিও রয়েছে তোমার মার কাছে কাশীতে। তোমার স্বামী—"

"স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন বোন্।"

"ত্যাগ করেছেন! ওমা, কেন? তোমার মত এমন ভাল মেয়ে—কেন, কি ব'লে ত্যাগ করেছেন?"

"কি ব'লে—না, অপরাধ কিছু ধ'রে ত্যাগ করেন নি।—তবে করেছেন, আমার দুর্ভাগ্য। অপরাধী তাঁকেও কর্‌তে পারিনে বোন্।"

"তবে—"

"বিবাহ করেছিলেন আমায় তাঁর বাবাকে কিছু না জানিয়ে। তিনি আমাকে তাঁর ঘরের বউ ব'লে ঘরে নিতে চান না?—ছেলেকে আবার বিয়েও দিয়েছেন।"

"কি সর্ব্বনাশ! তা—যাই করুন, তোমার খরচপত্রের একটা ব্যবস্থা—"

"করতে চেয়েছিলেন। এখনও শুন্‌ছি, কর্‌তে চান। তবে আমি তা নিতে চাই নি, এখনও চাই না। দেখি যদি কাজকর্ম্ম ক'রে চালিয়ে নিতে পারি। এ সব কাজে শুনেছি আয় মন্দ হয় না। আবার আমার মাও আস্‌ছেন, তিনি খুব ভাল রাঁধেন—রেঁধেই ওখানে খান। এখানে এসেও রাঁধুনীর কাজে যা পান—দুজনায় মিলে চালিয়ে নিতে বোধ হয় পারব। পারতেই হবে, উপায় আর কি আছে?"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ফুল্লরা কহিল, "কিন্তু আমি কি করব দিদি? মন গেছে ভেঙ্গে—শরীরেও বল পাই না। কতদিনে আর

পাব, পাবই কি-না আর এ জীবনে জানি না।—সম্বল যা আছে, মাস তিনেক আর কোনও মতে চল্‌বে। কিন্তু তারপর—তারপর—কি করব দিদি—"

ফুঁকরাইয়া ফুল্লরা কাঁদিয়া উঠিল। দু'টি হাতে লতার গলাটি আবার জড়াইয়া ধরিল।

"কেঁদো না, কেঁদো না বোন্। ধৈর্য্য ধর। ভয় কি? মাথার উপরে দেবতা আছেন—তাঁকে ডাক"—

"কাকে ডাকব দিদি?—মাথার উপরে—আমার মাথার উপরে দেবতা কেউ নেই। তাঁর রাজ্যের বাইরে যে এসে আমি প'ড়েছি—"

"তাও কি কেউ যেতে পারে বোন? তোমার আমার—সবারই মাথার ওপরে সমান তিনি আছেন; জগতের জীব তাঁর রাজ্যের বাইরে কে কোথায় যেতে পারে বল? পতিতপাবন দয়াময় তিনি দীন-দুঃখীর পরম বন্ধু। ডাক, প্রাণে ভক্তি রেখে, বুকে বিশ্বাস ধ'রে, মনে প্রাণে তাঁকে ডাক, দয়া তাঁর পাবে—ভাঙ্গা মন আবার জুড়ে উঠ্‌বে, ভাঙ্গা শরীরে আবার বল আসবে, উপায় তখন তিনিই ক'রে দেবেন।"

"দেবেন? সত্যি, দেবেন্ দিদি?—ভাঙ্গা মন আমার আবার জুড়বে?—ভাঙ্গা শরীরে আবার বল পাব? চাইতাম না, কিছুই চাইতাম না দিদি।—মনটা আমার পু'ড়ে পু'ড়ে বোধ হয় শুধ্‌রেই গেছে। পাপ এই দেহটা এখন ছেড়ে যদি যেতে পার্‌তাম দিদি, তাঁর পায়ে একটু শান্তি যদি গিয়ে পেতাম! না, তাও চাই না দিদি—পাবও না। জীবনের এই স্মৃতি সঙ্গেই ত থাক্‌বে। শান্তি কি ক'রে পাব? আহা, দেহটার সঙ্গে মনটাও যদি অমনি লোপ পেয়ে যেত দিদি!—ঐ যে শেষ ঘুম—সে যদি চিরতরের একটা ঘুমই কেবল হ'ত!"

"যদি হ'ত বোন্, সে ঘুম আমিও চাইতাম!—" গভীর একটি নিশ্বাস বুক ভরিয়া উঠিল। একটু থামিয়া আবার লতা কহিল, "কিন্তু মায়াটাও যে কাটাতে পারিনে বোন্।—আমি ঘুমোব—কিন্তু ঐ যে বাছাটুকু কোলে পেয়েছি তাকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কার কাছে ফেলে যাব?"

চক্ষু দুটি ছল ছল হইয়া উঠিল।—ফুল্লরার চক্ষেও জল আসিল। চাহিয়া দেখিয়া লতা কহিল, "সে দায় যে তোমারও আস্‌ছে বোন।"

চক্ষু মুছিয়া ফুল্লরা উত্তর করিল, "তোমার এ দায় কেবল দায়ই নয়, দিদি, জীবনের একটা আনন্দও বটে। কিন্তু আমার এ দায়—এখনও আসেনি—কিন্তু যখন আস্‌বে, সারা জীবনের একটা লজ্জা হ'য়েই থাক্‌বে, যা নিয়ে মুখ তুলে কারও সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।—আর আমি যে মা—যখন বুঝবে আমিও হব তার লজ্জা। নিজেই হবে নিজের লজ্জা—যাতে নিজেও সে মুখ তুলে কোথাও গিয়ে এ পৃথিবীতে দাঁড়াতে পার্‌বে না। ব'ল্‌তে কি দিদি—মনে হয়—মনে হয়—যদি দেখ্‌তে পাই, জ্যান্ত সে মাটিতে প'ড়েনি—তার বড় একটা ভাগ্য ব'লেই সেটা আমি বরণ ক'রে নেব। কিন্তু কত জন্মের কত পাপের ফলে মহাপাপিনীর পেটে এসেছে, এ ভাগ্যে কি তার হবে?"

লতার মনে হইল, তার সেই বাছাকেও এই লজ্জার ভাগী হইয়া এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে! কিন্তু তবু—তবু—ওমা! এ কামনার কথা মনের কোণেও যে আনিতে পারি না।—সে যে তার বাছা—তার কোলের বাছা—বুকভরা স্নেহের ধন—আহা, কতদিন বাছার মুখখানি চোকে দেখে নাই, বুকে ধরিয়া তার হাসিমুখে চুমো খায় নাই—সেই মুখের আধ আধ মা ডাক শোনে নাই।—তবে ফুল্লরা এখনও তার বাছাকে কোলে পায় নাই, মুখখানি তার চোকে দেখে নাই। আর তার সে বাছা—ঘটনাচক্রে যাই আজ লজ্জার ভাগী হউক, সত্যকার ধর্ম্মে লজ্জার হেতু তাহার কিছু নাই। যখন বড় হইবে, সব শুনিবে, বুঝিবে সত্যই লজ্জার কিছু তার ঘটে নাই; মাকেও শ্রদ্ধাবান্ সন্তানের চোখে দেখিবে, লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে না, ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে না।—কিন্তু ফুল্লরার বাছা—হায় অভাগী! কি বলিয়া তার লজ্জা সে দূর করিবে? ঘৃণায় ফিরান মুখখানি কি বলিয়া ঘুরাইয়া শ্রদ্ধায় তার পানে উঁচু করিয়া তুলিবে। নীরবে কতক্ষণ লতা বসিয়া ভাবিল। ফুল্লরাও নীরব। চক্ষু দুটি অশ্রুর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিতেছিল। কি ভাবিতেছিল, সে-ই জানে!

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লতা কহিল, "তোমার মা বাবা কেউ নেই ফুলু?"

"আছেন। মা আছেন, বাবা আছেন, দাদা আছেন"—

ফুঁফরাইয়া উঠিয়া দুই হাতে ফুল্লরা মুখ ঢাকিল।

"তারা তোমার খবর কিছু পাননি?"

"না!—খবর কি দেব? কোন্ মুখে কি দেব!—বাবার শরীর বড় খারাপ ছিল—ক'মাস এই হ'য়ে গেল—কে জানে কেমন আছেন, কি হ'য়েছে—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—আর পারিলনা। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—লতাও আর কিছু বলিলনা। কতক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া ফুল্লরা কহিল, "খবর কিছু দিতে চাইনে দিদি।—যদি দিতে পারতাম—এই খবরটা যদি দিতে পারতাম—তাঁদের মুখে কালি নিয়ে এই পৃথিবী থেকে আমি বিদায় হ'য়ে গেছি—যাতে একটা সোস্তির নিশ্বেস ফেল্‌তে পারতেন! কিন্তু আজ কি খবর দেব? তবে খবর পেলে—যদি জান্‌তে একটিবার পারতাম—তাঁরা ভাল আছেন, বাবা একেবারে ভেঙ্গে পড়েননি, আর—আর আমার কথা একদম মন থেকে তাঁর মুছে ফেলতে পেরেছেন—"

"তাও কি সম্ভব বোন্?—তুমি কেমন আছ, কোথায় কি অবস্থায় আছ, কি ক'রছ, এটা কি না ভেবে তাঁরা পারেন? না জান্‌তে পেরে সোস্তি একটু মনে ধ'রতে পারেন? আর জান্‌তে পারলে তোমার যা হয় একটা অবস্থাও তাঁরা করবেন।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফুল্লরা কহিল, "কি ব্যবস্থা ক'রবেন? দুটি খাওয়া-পরা—না দিদি, তাঁদের মুখে এই কালি দিয়ে আবার তাঁদের ভারবোঝা হ'য়ে থাক্‌ব—না, তা আর পারবনা দিদি!—বরং ঝি'গিরি ক'রে খাব তবু তা পারবনা। মান অপমান—না, আমার আবার মান অপমান কি! মেয়েমানুষের যে মান—সেত জন্মের মত হারিয়েছি!"

মুখ ফিরাইয়া লতা চক্ষু দুটি মুছিল—কথা কিছু মুখে ফুটিলনা। একটু সামলাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ পরে ফুল্লরা কহিল, "না, তাঁদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ আমার চুকে গেছে দিদি—আছি কেবল তাঁদের কলঙ্ক হ'য়ে। তাও যদি চুকে যেত!—কিন্তু যাবেনা, সেই জ্বালায়ই ত পুড়ে আজ খাক্ হ'য়ে যাচ্ছি! শান্তি একটু ম'লেও কি পাব? কে ব'লে দেবে? কার কাছে এ আশাটুকুও পাব?—একএকবার ইচ্ছে হয়—প্রাণটা কেঁদে কেঁদে ওঠে—গুরুদেবকে যদি একটিবারের তরে একদিন পেতাম!"

"গুরুদেব।"

"বাবার গুরুদেব—অতি বড় একজন সাধু মহাপ্রাণ ঠাকুর।—ক'বছর তাঁকে দেখিনি—নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বড় ভালবাসতেন আমাকে, কত আস্‌তেন আমাদের বাড়ী, আর কত যে সব ভাল কথা শেখান! তখন দেশেই আমরা থাক্‌তাম। সেই ঘর বাড়ী, সেই ঠাকুর-ঘর—লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ, সেই তুলসীমঞ্চ, বেলতলার বেদী, সেই ফুলের বাগান! ভোরে উঠে সাজি হাতে নিয়ে ফুল তুলতাম—স্নান ক'রে এসে পুজোর সাজ ক'রে দিতাম।—সেই কত ব্রত—পুণ্যিপুকুর মাঘমণ্ডল চাঁপা-চন্দন—পাড়ার সব ঘরে ঘরে এখনও সব র'য়েছে—মেয়েরা এখনও ফুল তোলে, পুজোর সাজ ক'রে, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেয়, ব্রত করে—ব্রতকথা শোনে—কামনা করে রামের মত পতি পায়, সীতার মত সতী হয়।—কিন্তু আমার সব ফুরিয়ে গেছে—সেই যে সব আশা, সেই যে তার আনন্দ—তার সাড়া এ জীবনে আর পাবনা?—কোনও জন্মে কোনও জীবনেও কি আর পাব দিদি?"

"পাবে—পাবে বই কি? একটা এই জন্মে যাই তোমার ভাগ্যে ঘটে থাক্—ঠাকুর দয়াময়—জন্ম জন্ম সে ভাগ্যে তোমাকে ফেলে রাখবেন না। মানুষ যা ভাবতেও পারে, দয়াল ঠাকুর ক'রতে তা কখনও পারেন?"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফুল্লরা কহিল, "ক'লকেতায় এলাম—কি কুক্ষণেই এলাম—কি মোহেই যে এসে প'ড়লাম? সব ভুলে গেলাম!—গুরুদেবের সেই সব কথা—ওরা ব'লত, দাদাও ব'লত—সব বাজে কথা—মেয়েদের ছোট ক'রে দাবিয়ে রাখবার মত ছল! আর কি সব বই এনেই প'ড়তে দিত!—মনে হয় আজ—দিদি, কি বিষই অমৃত ব'লে পান ক'রেছি! আর তার ফলে ওদের কি হ'য়েছে? ডুবেছি বিষের সাগরে আসি!—ডুব্‌ছি আমরা?"

ঝি আসিয়া কহিল, "একটী ঠাকুর এয়েছেন বৌমা।"

"ঠাকুর কে—কে ঠাকুর! গুরুদেব!" চমকিয়া কেমন বিভ্রান্ত-দৃষ্টিতে ফুল্লরা চাহিল—একটা রক্তোচ্ছ্বাস উঠিয়া দেখিতে দেখিতে মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত শরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। ঝি কহিল, তা হবেন। দেবতার তুল্যি জাজ্বল্যি ভোলা মহেশ্বর রূপ! দেখ্‌লেই মনে হয় পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ি?—তা সত্যিই লুটিয়ে পেন্নাম ক'রে পায়ের ধূলো নিয়ে ব'লে এনু, একটুখানি দাঁড়ান ঠাকুর, বৌমাকে খবরটা দিই। বৌমা আবার—"

"যাও—যাও!—দাঁড়িয়ে র'য়েছেন—শীগ্‌গির গিয়ে সিঁড়ি ফেলিয়ে নিয়ে এস!"

ঝি বাহির হইয়া গেল। ফুল্লরা বলিয়া উঠিল, "দিদি! দিদি! কি ক'রব দিদি! গুরুদেব এয়েছেন—কি ক'রে এ মুখ তুলে তাঁর পানে চাইব, এ হাতে তাঁর পায়ের ধূলো নেব?—চাইছিলাম—কিন্তু না, কাজ নেই পারবনা দিদি! যাও, যাও, তুমি যাও, গিয়ে বল—ওমা!—ঐ বুঝি আস্‌ছেন—পায়ের সাড়া পাচ্ছিনা?—না পারবনা দিদি! আমি—আমি পালাই!—তুমি—তুমি যা হয় ব'লো!"

বলিতে বলিতে ত্রস্ত ফুল্লরা উঠিতে গেল; কিন্তু পারিল না—পা কাঁপিয়া আবার বসিয়া পড়িল।—দরজা খুলিয়া হস্ত সঞ্চালনে ঝিকে বাহিরেই থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া হরদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুল্লরা মাটিতে উবুড় হইয়া পড়িল। লতা উঠিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

৩২

"ফুলু! মা আমার!"

কাছে আসিয়া বসিয়া হরদাস দুই হাতে তুলিয়া ফুল্লরাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"কেঁদোনা, কেঁদোনা মা, একটুখানি শান্ত হও দিকি!—দুটি কথা আমার সঙ্গে কও। আমি যে সেই গুরুদেব তোমার, তোমার কাছে এসেছি মা।"

"আপনি সেই গুরুদেব—এসেছেন বড় দয়া আপনার—কিন্তু আমি আমি—"

"তুমি ও সেই ফুলু মা আমার, সেই আমার বড় স্নেহের লক্ষ্মী মেয়েটি! কই একটিবার বাবা ব'লে ত আমাকে ডাক্‌লেনা? প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো ত নিলেনা।

"বাবা! বাবা!"

"হাঁ, ডাক ডাক, আবার ডাক—বাবা, বাবা! মুখ তুলে আমার মুখ-পানে চেয়ে ডাক, বাবা, বাবা!"

"বাবা! বাবা! বড় দয়া আপনার, এই ঘরে এসেও বুকে আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন। কিন্তু মুখ তুলে যে চাইতে পারছিনি বাবা!—বুকে ঠাঁই পেয়েছি, কিন্তু পা দুখানি যে এ হাতে—"

"পাগল! যে মেয়ে বুকে ঠাঁই পেয়েছে, পা দুখানি সে হাতে ছুঁতে পার্‌বেনা?—না, সে হবেনা মা। সোজা হ'য়ে ব'সো, প্রণাম ক'রে আমার পায়ের ধূলো আগে নেও,—তার পর যা কথা আছে হবে। নইলে ব'লছি রাগ ক'রে এক্ষুণি আমি যে পায়ে এসেছি সেই পায়ে অম্‌নি ফিরে চ'লে যাব।"

অমনি সঙ্কুচিতভাবে ফুল্লরা উঠিয়া প্রণাম করিল; পায়ের ধূলো লইয়া একটু সরিয়া বসিল।

"না, আমার কাছে এসে ব'স, এস।"

বলিয়া কোলের কাছে ফুল্লরাকে টানিয়া আনিলেন। বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফুল্লরা কহিল, "আমার কি হবে বাবা?—আমি এখন কি ক'রব?"

মাথায় হাত বুলাইয়া হরদাস কহিলেন, "ভয় কি মা? কিছুই ভাব্‌তে

হবেনা তোমাকে। মেয়ে তুমি, আমি বাবা। বুকে তোমাকে তুলে নিয়েছি, ভয় কি? ক'র্‌তে যা হয় আমি ক'রব। কিচ্ছু ভেবো না মা। যা হবার হ'য়ে গেছে, ফেরাবার ত উপায় নেই মা। এখন তোমার কল্যাণ কিসে হয় আমি দেখ্‌ব।"

"কল্যাণ! কল্যাণ আর আমার কি হ'তে পারে বাবা?—সব কল্যাণের বাইরে যে আমি এসে প'ড়েছি। তবু তবু যদি এখন আপনার আশ্রয় পাই—"

"পাবে মা, পেয়েছ! কল্যাণের বাইরে—কি ব'লছ মা? পরম কল্যাণের আধার যিনি, তাঁর রাজ্যে তাঁর সৃষ্ট জীব কেউ, তাঁরই সন্তান—কল্যাণের বাইরে কখনও যেতে পারে?"

ফুল্লরা কহিল, "বুঝ্‌তে পারি নি বাবা তখন—কিন্তু তবু যে অপরাধ আমি ক'রেছি, তার যে ক্ষমা নেই—"

"ক্ষমা নেই এমন কোনও অপরাধ মানুষ কারও হ'তে পারে না মা।"

"কে ক্ষমা ক'র্‌বে বাবা? নিজে আমি নিজেকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারছিনি—"

একটু হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "নিজে যে নিজেকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারে না, সকলের আগে দয়াময় এসে তাকে ক্ষমা করেন, তার কল্যাণের আশ্রয়ে তাকে তুলে নেন। তাঁর দাসানুদাস আমি আজ তাঁরই সেই ক্ষমা নিয়ে এসেছি, আমার এই আশ্রয়ে তাঁরই আশ্রয়ে তোমাকে তুলে নিচ্ছি। নইলে আমি কে মা?"

দুটি হাত বাড়াইয়া ফুল্লরা ঠাকুর হরদাসের গলাটি আবার জড়াইয়া ধরিল। স্নেহে হরদাস ফুল্লরার শিরোচুম্বন করিলেন।

"শোন মা, একটু স্থির হয়ে ব'সে শোন।"

গলাটি ছাড়িয়া দিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে ফুল্লরা একটু সোজা হইয়া বসিল। হরদাস কহিলেন, "শোন মা। অপরাধ—না, যা হ'য়েছে তোমাকে তার জন্যে অপরাধী ক'র্‌তে পারি না। তবে ভুল বড় একটা ক'রেছ—কিন্তু তার জন্যেও তুমি দায়ী নও মা। দায়ী তারা, যারা এই ভুল তোমাকে করিয়েছে, বহু জনে ভুলের পথে তোমাকে টেনে নিয়েছে, তোমায় মত আরও কত অভাগীকে টেনে নিচ্ছে, মায়ের জাতটাকে ধ্বংসের পথে নামিয়ে দিচ্ছে, এদের যে প্রশ্রয় দিচ্ছে—সমাজ দমন করছে না, তার প্রায়শ্চিত্ত সমাজকে ক'রতেই হবে।—তবু এই সত্যকে অস্বীকার ক'রতে আজ পারি না, তোমার আচরণে নারীর বিহিত, কুলনারীর পক্ষে অলঙ্ঘনীয়, সমাজধর্ম্ম লঙ্ঘিত হ'য়েছে। দুঃখ পেওনা মা, কুলনারীর মর্য্যাদা দিয়ে লোক-সমাজ আজ তোমাকে গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না, তোমার এই মাতৃত্বকেও মাতৃত্বের মর্য্যাদায় তুলে নিতে পারে না।—সামাজিক গৃহস্থ তোমার পিতাও পারেন না।"

ফুল্লরা উত্তর করিল, "না, তা পারেন না—সেটা বুঝি বাবা, মেনেও নিচ্ছি। কিন্তু আপনি—"

"আমি পারি। সামাজিক গৃহস্থ আমি নই, সন্ন্যাসী। নামে ঠিক না হ'লেও কার্য্যতঃ আমি সংসারত্যাগী পরিব্রাজক, সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংসৃষ্ট সকল বিধি-নিষেধের অতীত। আমি পারি। পারি, তাই তোমাকে গ্রহণ ক'রেছি। তোমার পিতার না হ'তে পার, কিন্তু তুমি আজ আমার মেয়ে।—আর তোমার আজ এই মাতৃত্ব—লজ্জা পেওনা মা—তাকেও যতদূর পারি একটা মর্য্যাদায়ই আমি তুলে নেব। তুমি তোমার গর্ভস্থ সন্তানের কেবল নও, আমারও মা। কেবল তুমিই নও মা, দুষ্টের দমনে, দুর্নীতির প্রচার রোধে সমাজের এই অবহেলার ফলে তোমার মত যত মেয়ে, যত মা, আজ নারীর মর্য্যাদা হারিয়ে সমাজের বাইরে এসে প'ড়েছে, সবাই তারা আমার মেয়ে, সবাই তারা আমার মা। বাইরেই একটা মর্য্যাদায় তাদের স্থিতি করব, সন্ন্যাসিজীবনের ব্রত আমার আজ এই।"

যারপর নাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া লতা হরদাসের কথা শুনিতেছিল। বলিয়া উঠিল, "অসীম দয়া আপনার বাবা, মহত্ত্বের পার নাই। কিন্তু একজন মাত্র সন্ন্যাসী আপনি, কত পারবেন? ক'দিনই বা পারবেন? এই সব অভাগীর অন্ত নাই দেশে আজকাল। সমাজ ভিতরে একটা মর্য্যাদার স্থান এদের না দিতে পারে। কিন্তু বাইরে যখন এসে পড়ে, একেবারে ভাসিয়ে না দিয়ে সেই বাইরের একটা স্থান তারা পায়—ঠিক সামাজিক মর্য্যাদায় না হ'ক, ধর্ম্মপথে শান্তিতে তারা জীবনটা কাটাতে পারে, এটা দেখা কি সমাজের বড় একটা কর্ত্তব্য নয়? যদি না করে, না পারে, তাতে কি সমাজের সমাজধর্ম্ম লঙ্ঘিত হয় না?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া হরদাস কহিল "কে মা তুমি?"

"আমি নার্স—ওঁর সেবায় নিযুক্ত হ'য়েছি।"

অগ্রসর হইয়া লতা গলবস্ত্রে হরদাসকে প্রণাম করিল।

"সুখে থাক মা! মঙ্গল হ'ক! হাঁ, যে প্রশ্ন তুমি ক'রেছ, প্রশ্ন মতই একটা প্রশ্ন বটে।—হাঁ, সমাজ এদের ভিতরে কুলনারীর মর্য্যাদায় গ্রহণ ক'রতে পারে না, ক'রবার পক্ষে গুরু বাধাও র'য়েছে। কিন্তু তাই বলে একেবারে ত্যাগ ক'রে অসহায় অবস্থায় দারুণ দুর্গতিতেও ফেলে দিতে পারে না। শান্তিতে সুপথে যাতে এরা জীবনযাপন ক'রতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা সমাজকে ক'রতেই হবে। না ক'রলে, না পারলে, সামাজিকের সমাজধর্ম্ম কেবল নয়, মানবের মানবধর্ম্মই লঙ্ঘিত হবে; আর তার জন্যে সেই মহাধর্ম্মরাজের বিচারাসনের সম্মুখে তারা দায়ী হবেন। কিন্তু সমাজ সেটা ভাবছে না, এই ধর্ম্ম অবহেলা ক'রেই চ'লছে। তা—কি ক'রব মা, তিনিই প্রেরণ ক'রেছেন, এদের রক্ষার চেষ্টা কিছু ক'রছি। তারপর—তিনিই জানেন ফলাফল কি হবে! কি ক'রব মা?—দেশের সব লোক ধর্ম্মবুদ্ধি ভ্রষ্ট হ'য়ে দেশের সব নারীকে—মায়ের জাতটাকেই—তাদের চিরন্তন ধর্ম্মপথের ধারা থেকে বিচ্যুত ক'রে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। অতি প্রবল ব্যাপক এক অভিযানই এই উদ্দেশ্যে আরম্ভ হ'য়েছে। মায়ের জাতকে এখন আত্মরক্ষার তরে আপন ধর্ম্মে আপনাদেরই শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে এই অভিযানকে প্রতিহত ক'রতে হবে।"

"এরা কি তা পারবে বাবা?"

"পারতে এদেরই হবে। ছেলেরা মায়েদের নিত্য এই মোহের দ্বারে বলি দিচ্ছে।—খাঁড়া কেড়ে নিয়ে তাদের দাঁড়াতে হবে, সেই মোহের

তাদের ধর্ম্মের দ্বারে বলি দিতে হবে। কেন পারবে না? এরা যে সেই খড়্গমুণ্ডধর বরাভয়কারী মহাশক্তিরই অংশ।—তাঁর মূর্ত্তি ধ'রেই দাঁড়াতে হবে। ফুলু!"

"বাবা।"

"আমি ভরসা করি মায়েদের এই প্রতি-অভিযানে এমনি একখানি খাঁড়া ধ'রে তুমিও একদিন দাঁড়াবে।"

দুই হাতে পা ধরিয়া মাথাটি পায়ের উপরে নোয়াইয়া ফুল্লরা কহিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ বাবা।"

"হাঁ, এই আমার আশীর্ব্বাদ মা! হাঁ, ঐ অভিযানে এই খাঁড়া তুলে তোমরাই ঠিক আগু হ'য়ে দাঁড়াতে পার। তোমরাই হুঙ্কার ছেড়ে পাষণ্ডদের ব'লতে পার, স্তব্ধ হও, দূর হও, সর্ব্বনাশ আমাদের যতদূর যা ক'রেছ, আর ক'রতে পারবে না। অভয় হাত তুলে মায়েদেরও ব'লতে পারি, সাবধান! স্বধর্ম্মে স্থির থাক, ওদের ছলে বিপথে এসোনা; রক্ষাকবচ সব আঁকড়ে ধ'রে থাক, বিপদ হবে না।—আমাদের দেখে রেখ।"

উচ্ছল একটা ভাতি ফুল্লরার মুখ ভরিয়া ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "যদি পারি বাবা, এ জীবনও আমার ধন্য হবে, এই ভাগ্যকেও তখন বরণ ক'রে মাথায় তুলে নেব।"

"তাই হ'ক মা—আমিও তখন ধন্য হব। আমার এই ব্রত তখন পূর্ণ হবে।—হাঁ, এখন শোন মা, দেখে তোমাকে গেলাম একটা সোস্তিই এখন পাব। তোমার মা বাবা—"

"কেমন আছেন তাঁরা?"

"আছেন—খুব ভাল, সে ত আর ব'লতে পারি না মা—তবে হাঁ, এখন থাকবেন, সোস্তিও একটা পাবেন—সেটা আমিও দেখ্‌ব।—প্রসবকাল তোমার নিকট; তার পর সূতিকার কাল যদ্দিন না উত্তীর্ণ হয়, এইখানেই তুমি থাক, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক, মনে ক'রো এ তোমার বাবার বাড়ীতে বাবার হেফাজতেই আছ। হাঁ, তোমার খরচপত্র—"

"দু-তিন মাসের সংস্থান আমার আছে।"

"কোথায় পেয়েছ! কে দিয়েছে?"

"আমার গহনা কিছু ছিল, বিক্রী ক'রেছিলাম।"

"বেশ। আপাততঃ তাই চালাও। হাঁ মা, তুমি রয়েছ, তোমার হাতেই ওকে আমি রেখে যাচ্ছি। ডাক্তার যিনি আছেন, তাঁর যা ক'রবার ক'রবেন; কিন্তু ভার রে খে যাচ্ছি আমি তোমার ওপরে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, আর অতি সুবুদ্ধি। ঐ একটি কথাতেই তোমাকে চিনে নিয়েছি আমি। আমার এই ব্রতে তোমার সহায়তাও হয়ত পাব। হাঁ মা, তোমার নামটা—"

"কনকলতা।"

"সধবা ত তুমি!"

"হাঁ বাবা।"

"হুঁ! খুব দুঃখেই বোধ হয় প'ড়েছ—নইলে স্বামী থাকতেই বাইরে এই সব কাজে আসতে হয়। আর দিনকাল যা প'ড়েছে, মেয়েরাও এই সব কাজে বেরিয়ে উপার্জ্জন কিছু না করলে অনেক সংসারই চলে না। তবে তুমি যে কাজে এসেছ, এটা মেয়েদেরই কাজ বটে।—তা সে যাই হ'ক্ মা, ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, ভার ওর তোমার ওপরেই রইল।—ফিরে এসে খবর নেব। চিঠিও লিখব। আর এর ভেতর খবর যদি কিছু দিতে হয়, এই ঠিকানায় চিঠি লিখো—দেখি একটু কাগজ মা।"

লতা একটুকরা কাগজ ও দোয়াত কলম আনিয়া দিল—হরদাস ঠিকানা লিখিয়া লতার হাতে দিলেন। পড়িয়া লতা চমকিয়া উঠিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—"নন্দগ্রাম—শ্রীযুক্ত শিবকিঙ্কর শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী!—ইনি আপনার কে হন বাবা?"

"আমার গুরুদেব। ওঁর কাছেই এখন যাচ্ছি—তুমি ওঁকে জান মা?"

"জানি বাবা, ঐ নন্দগ্রামে—এই আমার মার সঙ্গে একবার গিয়েছিলাম—কদ্দিন ছিলাম।"

"ও তাহ'লে এও নিশ্চয়ই জান মা, কত বড় এক পণ্ডিত, আর তার চাইতেও বড়—কত বড় একজন সাধু মহাপুরুষ ইনি। আমার এ জীবনের যা কিছু শিক্ষা, কর্ম্মের যা কিছু প্রেরণা, ওঁর কাছেই পেয়েছি। আর আজ—থাক্ সে কথা মা, তাহ'লে উঠি এখন; আসি আজ মা ফুলু। নির্ভয়ে থাক, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক। আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার মা। আর সবার মাথার উপরে আছেন মা জগদম্বা! ভয় কি মা?"

বলিয়া হরদাস উঠিলেন। ফুল্লরা আর লতা চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। হাসিমুখে দুজনের মাথায় দুখানি হাত রাখিয়া হরদাস আশীর্ব্বাদ করিলেন "স্বস্তি।"

হরদাস বাহির হইয়া গেলেন। ফুল্লরা আর লতা উভয়েরই মনে হইল, কোন্ পুণ্যলোকের নির্ম্মল একটা বায়ুপ্রবাহ যেন ঘরখানির মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আর তার কি শান্তি, কি আনন্দ।—ঘরখানিই যেন এক মহাতীর্থের দেবায়তনে পরিণত হইয়াছে!

কুরঙ্গ আসিয়া একখানি পত্র লতার হাতে দিল। সুকেশবাবু লিখিয়াছেন, ক'দিন তোমাকে দেখ্‌ছিনা। একটা সভায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলেছিলাম মনে আছে বোধ হয়। আজ সেই সভার দিন। সময়ও হ'য়ে এল। যদি আসতে পার, বিশেষ সুখী হব।"

মুখখানি কেমন একটা বিরাগের বক্ররেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। —উত্তরে ঐ চিঠির নীচেই লিখিয়া দিল, "মাফ করবেন আমাকে—আজ আর যাওয়া সম্ভব হবেনা।"

কুরঙ্গ উত্তর লইয়া চলিয়া গেল।—ফুল্লরা কহিল, "মিসেস্ চম্পটীর চিঠি দিদি? কি লিখেছেন তিনি?"

"না, তাঁর চিঠি নয়;—আর একটি লোক—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তা এখন যেতে পারবনা।—এস তোমাকে কথামৃত পড়িয়ে শোনাই।"

৩৩

হরদাস ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বিমান একা বসিয়া রহিয়াছে। উঠিয়া বিমান প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

"এস বিমান! সুখে থাক। ব'স।" বলিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিলেন। বিমান নিকটেই গৃহতলে বসিল। একটু হাসিয়া হরদাস চাহিলেন।

"তারপর? খবর কি বাবা? ভাল আছ ত!"

"আজ্ঞে—শরীর-গতিক—আপনার আশীর্ব্বাদে আছি একরকম ভালই।"

"তাহ'লে—মনের গতিকে বোধ হয় খুব ভাল নও?"

একটু হাসি হরদাসের মুখে ফুটিল।

বিমান উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, মোটেই ভাল নয়। স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেছে, মোহ একদম টুটে গেছে।—বড় আঘাতে একেবারে মর্ম্মাহত হ'য়ে আপনার পায়ে এসেছি বাবা।"

"বটে।—তা কি হ'য়েছে বাবা, খুলে বল ত সব।"

তাঁহার সঙ্গে সেই আলাপ আলোচনায় মনে যে একটা ধাক্কা বিমান পাইয়াছিল, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আর সুকেশবাবুর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা তার হইয়াছিল সব বিমান খুলিয়া বলিল।

"হুঁ।—নতুন কিছু নয় বিমান। জানতাম এই উত্তরই তুমি সবার কাছে পাবে। সুকেশবাবুর কাছে কেবল নয়, তোমার বন্ধু এই যুবাদের কাছেও। তবু বড় সুখী হ'চ্ছি বিমান, এত বড় একটা মোহজালে প'ড়েও মনুষ্যত্ব তুমি হারাওনি। হারাওনি, আছে, তাই এই দায়িত্ববুদ্ধি তোমার মনে আজ জেগে উঠেছে, আর সে দায়িত্বের ভার নিতেও তুমি প্রস্তুত।"

"কিন্তু নিতে যে পারলাম না বাবা! একা অসহায় আমি—পথও ভুল পথ—"

বিমানের চ'ক্ষে জল আসিল।

"ঠিক! ভুল পথ—করতেও কিছু পারনা। এ ভুল পথে কেউ পারেনা; যারা ম'রছে তারা মরছে। তবু দায়িত্বটাই এরা বোঝেনা, কথার ছলে ফাঁকি দিয়ে এড়াতে চায়। কিন্তু সত্যটা তুমি সরল মনে স্বীকার ক'রছ, ভুলের দায়িত্বও নিতে চাইছ। অসহায়? তবু ব'লছি বিমান, একা এখন একটি যুবার মূল্য এদের হাজার যুবার উপরে। মূল্যই এদের কিছু নাই।"

দুই হাতে বিমান চক্ষু দুটি মুছিল। হরদাস চাহিয়া দেখিলেন—মুখে মৃদু একটু হাসির রেখা ফুটিল।

"তাহ'লে এখন কি ক'রতে চাও বিমান?"

"আপনার আশ্রয় চাই।"

"আশ্রয়—মানে?"

"আপনার শিষ্যত্বে আমাকে গ্রহণ করুন।"

"ভাল, তাই তবে ক'রলাম।"

সম্মুখে সরিয়া আসিয়া বিমানের মাথায় হরদাস হাত দুখানি রাখিলেন। রোমাঞ্চিত দেহে নত হইয়া বিমান পায়ে মাথাটি রাখিল; অশ্রুধারায় সে পায়ে ভক্তশিষ্যের পূজার অর্ঘ্য অর্পিত হইল।

স্নেহে বিমানকে তুলিয়া হরদাস পাশে আনিয়া বসাইলেন। কহিলেন, "শিষ্যত্বে তোমাকে গ্রহণ ক'রলাম। এখন শিষ্যের ধর্ম্ম কী তুমি পালন ক'রতে চাও?"

"আজ্ঞে যদি দয়া করেন, সেবক হ'য়ে আপনার সঙ্গেই থাক্‌তে চাই। আপনার যে 'মিশন' (mission)—"

"মিশন!—না, ভুল ক'রেছি বিমান! আমার শিষ্যত্বের যোগ্য তুমি নও।" বলিয়া একটু সরিয়া বসিলেন।

"বাবা!" অতি ব্যাকুল দৃষ্টিতে বিমান চাহিল।

হরদাস কহিলেন, "'মিশন'! ঐ এক 'মিশন' কথাটিতেই বুঝতে পারছি বিমান, মোহমুক্ত তুমি হওনি, হ'তে পারনি।"

করজোড়ে বিমান কহিল, "মুক্ত তবে দাসকে ক'রে নিন বাবা। ভুলে ক'রেও শিষ্যত্বে গ্রহণ ক'রেছেন, ত্যাগ এখন ক'রতে পারেন কি। শুনেছি গুরু রামানন্দ কবীরকে এইভাবেই শিষ্যত্বে গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন।"

হরদাস হাসিয়া উঠিলেন।

"হাঁ, এইবার পরাজয়ই আমার ক'রেছ বিমান। দেখ্‌ছি গুরুমার বিদ্যেটা সুরুই তোমার হ'য়েছে। ভাল, এই বিদ্যেয় সিদ্ধিলাভ কর, গুরুবৃত্তি তাতেই আবার সত্যকার গৌরব লাভ ক'রবে।"

একটু হাসিয়া নতমুখে বিমান কহিল "শিষ্যের অধিকারে তবে গাঁকা দখলই পেলাম বাবা?"

"না, এখনও পরীক্ষা শেষ হয় নাই।"

"তাহ'লে—"

হরদাস কহিলেন, "শোন বিমান, 'মিশন' আমার কিছুই নাই। ওসব মিশনটিশনের বুলিও কিছু বুঝি না। তবে মনে মনে একটা ব্রতের সংকল্প ক'রেছি, এখন সব সেই মা জগদম্বার ইচ্ছা।"

বলিয়া গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিমান কহিল, "সেই ব্রত যখন গ্রহণ ক'রবেন, সেবক হ'য়ে আপনার সঙ্গে থেকে—"

"না, আমার সে ব্রতের সঙ্গে তোমার কোনও সম্বন্ধই থাক্‌তে পারেনা বিমান। সে অধিকারই তোমার নাই; তোমাদেরই নাই।"

"আজ্ঞে—"

"আমার এই ব্রত আমার এই সব অভাগী মায়েদের সেবা। আর মায়ের জাতটাকেই যে এরা এই মোহজালে জড়িয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বধর্ম্মে ফিরে এসে নিজেরা যাতে রক্ষা পায়, দেশকে সমাজকে রক্ষা ক'রতে পারে, তারই একটা প্রাণপণ চেষ্টা। আঘাতের পর আঘাত যে আসছে, তার প্রতিঘাতের অভিযানে দল বেঁধে অগ্রসর হ'তে হবে মায়েদের। যাতে তাঁরা পারেন, তাই আমি ক'রতে চাই—সেই আমার ব্রত। এ ব্রতে আমার সহায় তুমি—তোমরাই কেউ হ'তে পারনা বিমান। সে অধিকারই তোমাদের নাই!"

ধীরে ধীরে বিমান কহিল, "আমারও যে এই লক্ষ্য ছিল বাবা—"

"না, সে লক্ষ্য এ লক্ষ্য নয়। তুমি যা চেয়েছ, এ তা নয়। এর ভেতর তোমরা আস্‌তেই পার না, দূরেই থাক্‌তে হবে। তবে দূরে থেকেও পরোক্ষভাবে সহায়তা যথেষ্ট ক'রতে পার।"

"কি ভাবে পারি বাবা, বলুন।"

"বিবাহ ক'রেছ বিমান?"

"আজ্ঞে, না।"

"যাও। তবে ঘরে ফিরে যাও।—বিবাহ কর। বিবাহের বয়স তোমার হ'য়েছে।"

"আজ্ঞে, বয়স হয়ত হ'য়েছে। তবে—তবে—"

"তবে—কি? ব'লতে চাও সামর্থ্য হয়নি, পরিবার প্রতিপালন ক'রতে পারবে না?"

"আজ্ঞে—"

"হাঁ, শুনেছি তোমাদের ওসব ধুয়ো অনেক। সংসারে কেবল একলাটি তুমি নও, আরও পাঁচজন র'য়েছেন, খেয়ে প'রে আছ ত সবাই? কি ক'রে চ'ল্‌ছে তোমাদের?"

"আজ্ঞে, জমাজমি কিছু আছে, আর দাদা কাকা—যিনি যা পারেন, আনেন। মোটা ভাত কাপড় একরকম চ'লে যাচ্ছে।"

"একটা বৌ এসে কত ভারবোঝা আর বাড়াবে? এসব হুজুগ ছেড়ে কাজ যদি কিছু কর, কিছু কি তুমিই আন্‌তে পারবে না?"

"আজ্ঞে, তা—পারব বই কি?—তবে এখুনি ত এমন বেশী তা কিছু হবে না।"

"কত বেশীই বা এখুনি তোমার লাগ্‌বে? যখন লাগবে, গা তেমন থাকলে রোজগারও ক'র্‌তে পারবে। তোমার দাদা কাকা এঁরা মেলাই রোজগার ক'র্‌তে পারবার আগে কি তোমার বিবাহ দিতে চান না?"

"আজ্ঞে, তা চান বই কি? আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রেই তুলেছেন।"

"তবে যাও, বিবাহ ক'রে সংসারে স্থিত হ'য়ে ব'স। সেকেলে সরল সেই গ্রাম্যচালের মোটা ভাত কাপড়ই যথেষ্ট। ছেলেরা যদি বাঁচতে চায় গ্রাম্য চালের মোটা ভাত কাপড়েই আবার ফিরে যেতে হবে, সহরের ফিন্‌ফিনে বাবুগিরি ছেড়ে। মেয়েদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, ফুরফুরে বিবিয়ানা ছাড়িয়ে আবার সেই মোটা সাড়ী শাঁখা সিন্দুরে! তোমাদের ফিরতে হবে পুরোণো সেই ক্ষেতখামারে বাগবাগিচেয় গোয়াল ঘরে মাছের দীঘি-পুকুরে, তাদেরও ফিরিয়ে আন্‌তে হবে সেই ধানের গোলায় চেঁকিশালায় ডালাকুলোয় পাকের ঘরে।"

বিমান কহিল, "হালচাল একদম বদ্‌লে গেছে বাবা। সহরে গিয়ে সবাই জমেছে, বাবুগিরিতে বিবিয়ানায়, সহরের আরাম বিরামে, গা ছেড়ে দিয়েছে। ফিরতে কি ফেরাতে আর সহজে কেউ পার্‌বে?"

"পারতেই হবে! নইলে ম'র্‌বে, এদেরও মার্‌বে। শোন বিমান! এই যে মেয়েরা সব যা তা হুজুগে মেতে উঠ্‌ছে, ঘর ছেড়ে বাইরে হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছে, আর তাতে ক'রে শেষে এই সব দুর্ব্বিপাকে গিয়ে প'ড়ছে, তার বড় একটা কারণ, সময়মত সংসারে এরা স্থিতিলাভ ক'রতে পারছেনা; ছেলেরা হ'য়ে উঠেছে বিবাহে বিমুখ, স্ত্রী-পুত্রাদি পোষ্যপালনের দায়িত্বই গ্রহণ ক'র্‌তে চাইছে না। প্রত্যেকেই যদি চায় নাগরিক উচু চালের পৃথক্ এক একটি সংসার না হ'লে সেটা সুখের সংসারই হ'তে পারে না, হয় কেবল একটা বিড়ম্বনা, তবে এ দায়িত্ব সহজে কেউ নিতে পারে না, এ বিমুখতাও অনিবার্য্য। অথচ যথাসময়ে দারপরিগ্রহ ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রমে পুরুষরা না যদি গিয়ে বসে, নারীধর্ম্মে মাতৃধর্ম্মে স্থিতিলাভ ক'রে নারী কেউ প্রকৃত কল্যাণের ভাগিনী হয়ত পারেনা, সমাজও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারে ধ্বংস হ'য়ে যায়। সুতরাং এ দায়িত্ব-গ্রহণ পুরুষের অলঙ্ঘনীয় সামাজিক ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম অবহেলা ক'রবার, এড়িয়ে চ'লবার অধিকার তার নাই, মানুষ হ'য়ে মানুষের, সামাজিক হ'য়ে সামাজিকের, কর্ত্তব্য যদি পালন ক'রতে চায়। প্রাচীন ভারতে দুর্লঙ্ঘ্য বিধিই এই ছিল, বিদ্যাশিক্ষার পর যুবা হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা আজীবন সন্ন্যাসী হবে যদি গুরুর অনুমতি পায়, নতুবা দারপরিগ্রহ ক'রে গৃহস্থ তাকে হ'তেই হবে। বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত, বিষয়ভোগী অকৃতদার পুরুষ লোকসমাজে যথেচ্ছা বিচরণ ক'রতেই পারত না। এরূপ সব পুরুষ থেকে বহু অকল্যাণের সৃষ্টি সমাজের হয়।"

বিমান উত্তর করিল, "জীবিকাসমস্যা তখন এত কঠিন ছিলনা বাবা।"

"না, তা ছিল না। এখন হ'য়েছে, আর সেইটেই হ'চ্ছে সমাজের অতিবড় একটা কঠিন সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যাকে সমাধান ক'রে তোমাদের নিতেই হবে, সমাজকে যদি রক্ষা ক'রতে চাও, মানুষ হ'য়ে মানুষের ধর্ম্ম, পুরুষ হ'য়ে পুরুষের ধর্ম্ম যদি পালন ক'রতে চাও, আর তার একটা পথ ঐ যে জীবনের কথা ব'ল্‌লুম, এ দেশের পুরোণো জীবনে ফিরে আসা। অনেক লম্বা লম্বা কথা তোমরা আজকাল কও,—দেশ উদ্ধার ক'র্‌বে, জাতটাকে বড় ক'রে তুল্‌বে, পৃথিবীর সব বড় বড় জাতের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চ'ল্‌বে, অথচ একটি নারীর ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রবার বেলায় ভ'য়ে পিছিয়ে এস। রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারনা, অথচ ছলে ভুলিয়ে নষ্ট এদের ক'রতে এতটুকু দ্বিধা কেউ বড় ক'রছ না! ধিক্ তোমাদের! কি ক'র্‌বে তোমরা? কি ক'রতে পার? ঘরে ঘরে এইসব মায়েদের যারা মায়ের আসনে মায়ের মানে রক্ষা ক'রতে পারে না, আসনভ্রষ্ট ক'রে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে, তারা আবার দেশমাতৃকার নাম করে কোন্ মুখে?"

বিমান নতমুখ নীরব। অগ্নিদৃষ্টিতে হরদাস চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বিমান কহিল, "তা হ'লে আপনার আদেশ বাবা—"

"হাঁ, আমার আদেশ, যাও, ঘরে যাও, বিবাহ কর, সংসারধর্ম্মে স্থিত হও। তোমার সহযোগী বন্ধু যারা তাদেরও বিবাহ ক'রে সংসার-ধর্ম্মে স্থিত ক'রতে চেষ্টা কর। কাজকর্ম্ম যেভাবে যে যা পারে করুক, চাষ করুক, মজুরী করুক। ভাবনা ক'রো না বিমান, প্রাণের আগ্রহে যদি খোঁজ, কাজের পথ পাবে, মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। সংসারধর্ম্মে স্থিতি দিয়ে মায়ের জাতকে রক্ষা কর। পুরুষ হ'য়ে জন্মেছ, বীরের মত পুরুষের মত মাথা তুলে নেও, কাপুরুষের মত ভয়ে এড়াতে চেওনা; নিজের অলস আরামে, কেবল নিজের স্বার্থসুখ-ভোগ-লিপ্সায়, মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিওনা, দেশকে ডুবিও না। সবুজ দল

ক'রেছ বিমান? এই সবুজই সত্যকার সেই চিরন্তন সবুজ ধর্ম্মে সার্থক হ'ক্। তোমার নতুন এই সবুজ দলের সাধনমন্ত্র হ'ক মোহবিভ্রান্ত, ধর্ম্মভ্রষ্ট দেশকে তার স্বধর্ম্মে আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলবে!"

"যে আজ্ঞে বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন, এই মন্ত্র নিয়ে এই ব্রত যেন গ্রহণ ক'রতে পারি।—"

পায়ে লুটাইয়া বিমান গুরুদেবকে প্রণাম করিল। দুটি হাত তার মাথায় রাখিয়া হরদাস কহিলেন,

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত!"

উঠিয়া বিমান কহিল, "কবে আবার দর্শন পাব বাবা?"

"বৌমাকে নিয়ে যেদিন আস্‌তে পার্‌বে, তার আগে নয়।"

(ক্রমশঃ)

মহাশান্তি

শ্রীকালিদাস রায়

আজি শুধু মনে হয় চেয়ে চেয়ে দেখে অই
বাড়ীটার পানে,
বাড়ীতে কি কেহ নাই? গেল কি পলায়ে সবে
আর কোনখানে?
পালিত কুকুর গাভী ঝিমাতেছে চোখ বুজে
খুঁজে না আহার,
খাঁচার পাখীটা সেও ডাকেনিক সারা দিন
কি হলো তাহার?
কয় দিন হ'তে কোথা দেখেছি সকলি যেন
চঞ্চল অস্থির
বন্ধুজন যায় আসে কমে নাক সারা দিনে
অঙ্গনের ভীড়।
প্রহরে প্রহরে গাড়ী নিয়ে আসে তাড়াতাড়ি
কতই ডাক্তার,
চাকরের হাত হতে শিশি কেড়ে নিয়ে ছুটে
দাদা বাবু তার।
ছোট ছোট দল বেঁধে ফিসফিস করে সবে
এখানে ওখানে,
সকলেরই ম্লান মুখ ঘন ঘন সাইকেল
ছুটিছে দোকানে।
এক প্রশ্ন মুখে মুখে সবাই শুধায় শুধু
রোগীর সংবাদ,
মাঝে মাঝে শুনিয়াছি মায়ের প্রবোধ সাথে
ক্লিষ্ট আর্ত্তনাদ।
সারা রাত্রি আলো জ্বালা, নিদ্রাহীন গৃহখানি
আরক্ত নয়নে
তৃষা ক্ষুধা সব ভুলে চাহিয়া আছিল শুধু
রোগীর শয়নে।
আজ কি গভীর শান্তি, রুদ্ধ বাতায়নগুলি,
সকলি নিঝুম,
কোন গৃহে নাই আলো রান্নাঘর হতে আজ
উঠে নাক ধূম।
উদ্বেগ, অস্বস্তি, ভয়, ব্যস্ততা, সংশয়, আশা,
ত্রস্ত কলরব
সব সাথে নিয়ে গেছে, চিতার অনলে আজ
পুড়ে গেছে সব।
একটি মাসের নিদ্রা ঘনায়ে মুদায় আজ
নয়ন অলস
একটি মাসের ক্লান্তি করে আজি অবসাদে
সর্ব্বাঙ্গ অবশ।
একটি মাসের চিন্তা বুকের কুলায়ে আজ
লভেছে বিশ্রাম,
একটি মাসের ভ্রান্তি ছুটে ছুটে শ্রান্ত হয়ে
পেয়েছে বিরাম।
পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ হতো না যাহার লাগি
সে পেয়েছে লয়
দেহ আজি প্রাপ্য তার বুঝে লয় কড়া ক্রান্তি
মনে করি জয়।
কোথা শয্যা কোথা খাট? ধূলায় পড়িয়া সব
ঘুমে অচেতন,
শূন্য সে রোগীর গৃহ, চূড়ায় উড়িছে তার
শান্তির কেতন।
মহাশোকও শ্রান্ত হয়ে গলিয়া ঢলিয়া পড়ি
নয়ন আসারে
মিশে গেছে সুষুপ্তির উদার অগাধ স্থির
শান্তি পারাবারে।
আর অই স্বপ্ন পথে রোগমুক্ত সুস্থ দেহে
প্রিয়জন এসে
ঢুকে পড়ে অঙ্ক পর গলায় জড়ায়ে কর
কথা কয় হেসে।

যশোহরের অখ্যাতনামা কবি গঙ্গারাম দত্ত

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বঙ্গদেশের গ্রামগুলি অনুসন্ধান করিলে বহু গৃহস্থের ঘরে পুরাতন পুঁথি পাওয়া যাইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। এই উপেক্ষিত, লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত পুথিরাশি যদি সমস্তই আমাদের দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব হইত, তবে বোধ হয় আমরা দেখিতে পাইতাম যে, বাংলাদেশ একাধিক কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই কত প্রাচীন লেখকের বহুকষ্টরচিত হস্তলিখিত গ্রন্থাবলী কীটদষ্ট হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, অথবা গৃহদাহ প্রভৃতি বিপৎপাতের ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? যাঁহারা পূর্ণ অথবা আংশিকরূপে কালের ব্যাহত প্রভাব হইতে রক্ষা পাইয়াও অজ্ঞাতনামা রহিয়া গিয়াছেন, বক্ষ্যমানপ্রবন্ধের বিষয়ীভূত কবি গঙ্গারাম দত্ত সেই প্রাচীন কবিদিগের অন্যতম।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের বাতিক লইয়া পুরাতন পুথির তল্লাস করিতে গিয়া কবি গঙ্গারামের সন্ধান মিলিয়াছিল। ন্যূনাধিক দুই শতাব্দী পূর্ব্বে কবি গঙ্গারাম দত্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহার নিবাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত নড়াইল গ্রাম। নড়াইলের সুবিখ্যাত জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপরাম দত্ত ইঁহার অগ্রজ। গঙ্গারামের বংশধরগণ এখনও নড়াইলে বাস করিতেছেন। দৈবের প্রতিকূল প্রভাবে গঙ্গারামের রচিত গ্রন্থাদি লোকের অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। সময়ও সুবিধামত ঐগুলি উপযুক্ত বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকগণের মধ্যে গঙ্গারামের নাম হয়ত আমরা সসম্মানে উল্লিখিত দেখিতাম।

গঙ্গারামের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইটুকু জানা যায় যে, মহারাজ আদিশূর দ্বারা আনীত পুরুষোত্তম দত্ত ইঁহাদের আদিপুরুষ! এই দত্তবংশ হাওড়ার নিকটস্থ বিখ্যাত বালিগ্রামে বাস করিতেন। এইজন্য ইঁহারা "বালির দত্ত" বলিয়া পরিচিত। মহারাষ্ট্রগণের অর্থাৎ "বর্গীর" উৎপাতের ফলে দত্তরা মুর্শিদাবাদের নিকট "চৌরা" নামকস্থানে গিয়া বাসস্থাপন করেন। তারপর আরও দূরে সরিয়া গিয়া দত্তরা আবার নূতন বাসস্থানের পত্তন করেন। এই নূতন নিবাস হইল "নড়াল" গ্রাম এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা মদনগোপাল দত্ত। মুর্শিদাবাদে নিবাসকালে মদনগোপাল দত্ত। মুর্শিদাবাদে নিবাস কালে মদনগোপাল নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন। চাকুরী-অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা তিনি একটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত হয় যে, তাঁহার ভূসম্পত্তির পরিমাণ ছিল মাত্র বার বিঘা জমি, যাহার উপর বসতবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মদনগোপালের পুত্র রামগোবিন্দ। নড়াইল জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপরাম দত্ত এই রামগোবিন্দের পুত্র। রূপরাম নাটোর-রাজের প্রতিনিধিরূপে নবাবসরকারে কাজ করিতেন এবং তিনিই নাটোর-রাজসরকার হইতে পাট্টা লইয়া নড়াইলে কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কালীশঙ্কর রায় এই রূপরামের পুত্র। কালীশঙ্করের বিক্রমেই কয়েকশত বিঘার সামান্য সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়া বহু লক্ষ টাকার বিরাট জমিদারীতে পরিণত হয়।

রূপরাম নাটোর-রাজসরকার হইতে যে পাট্টা লইয়াছিলেন তাহার তারিখ বঙ্গাব্দ ১১৯৮ (খৃঃ ১৭৯১) এবং তিনি বঙ্গাব্দ ১২০৯ (খৃঃ ১৮০২) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, বলিয়া বোধ হয়।* গঙ্গারাম রূপরামের কনিষ্ঠ।

গঙ্গারাম নিজের রচনার মধ্যে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন:

বাণী বাগেশ্বরী দেবী আদ্যা সরস্বতী।
গঙ্গারাম ভণে তার পদে রাখি মতি॥
বালী সমাজীর দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম।
সেই বংশে নারায়ণ নারায়ণ সম॥

* Westland সাহেব প্রণীত Report on the District of Jessore (1874). Westland সাহেব গঙ্গারামের নামও উল্লেখ করেন নাই।

মদনগোপাল নাম তাহার নন্দন।
সুত রামগোবিন্দ কির্ত্তির বিবর্দ্ধন ॥
রূপরামদত্ত নাম তাহার তনয়।
তাহার অনুজে এই ভাষা করি কহে ॥
নিবাস নড়াল গ্রাম নলদ্বিপ মাঝে।
চাকলে ভূষণা নাম (মহিদেব ?) রাজে ॥
সুন্দরাকাণ্ডের কথা হইল সমাপ্ত।
এখন লঙ্কার কথা হইবে (যে যাপ্ত ?) ॥

("বিজ্ঞাপিত" কথা লিপিকরপ্রমাদে ঐরূপ হইয়া থাকিবে)

—গঙ্গারামের রামায়ণের পুথি—পত্র ২৪৪

অন্যত্র, অর্থাৎ উক্ত পুঁথির লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে, কবি স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের নাম উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন ঃ

সমাপ্তঞ্চেদং লঙ্কাকাণ্ডমিতি।
ইহার পশ্চাতে হবে উত্তরা প্রকাশ।
অগস্ত্যের মুখে রাম সুনে ইতিহাস ॥
ভল্লুক বানর আর রাক্ষসের জন্ম।
রাবণ তপস্যা করি কৈল জত কর্ম্ম ॥
দিক বিজয়ের কথা বহু ইতিহাস।
উত্তরাকাণ্ডেতে সর্ব্ব আছয় প্রকাশ ॥
গঙ্গারাম দত্ত কহে সুনহ ভারতী।
শ্রীনন্দকিশোরে মাতা কর সুদ্ধমতি ॥
কালীশঙ্করের মতি রামনিধি দত্তে।
ধনধান্যে পূর্ণ করি রাখিবা মহত্তে ॥
গদাধর শ্রীধর কিঙ্কর তব পায়।
প্রথমে করিবা দয়া মূর্খতার দায় ॥
পঞ্চভাই একমতি সুদ্ধে সুদ্ধাচার।
পদছায়া দিয়া রাখ তনয় তোমার ॥
কবিতার ভালোমন্দ কিছুই না জানি।
জে বোল বোলাও তুমি বাগ্‌ময়ি রাণী ॥
শশাঙ্ক বাসনে ধরিবারে যেই আশ।
তেন রামায়ণ কহে গঙ্গারাম দাস ॥

(পুঁথি—৩৩৫ পত্র)।

উপরিলিখিত রচনার মধ্যে, নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি এই তিনজন রূপরামের পুত্র, গদাধর ও শ্রীধর গঙ্গারামের পুত্র। অধিক বয়সে (বোধ হয় শেষ বয়সেই) গঙ্গারামের একপুত্র হইয়াছিল। রামায়ণ রচনার পরে হইয়াছিল বলিয়া এই পুত্রের নামরাখা হইয়াছিল রামকুমার। রামকুমার পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান।

গঙ্গারাম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সঞ্চিত পুস্তকভাণ্ডারে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, বিরাট্ (পৃথক্‌ভাবে), জ্যোতিষগ্রন্থ ইত্যাদি রাশি রাশি হস্তলিখিত পুথি ছিল। ইহা ব্যতীত অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাংলা পুথিও ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থগুলি—ক্ষুদ্র ও খণ্ড খণ্ড সংস্কৃত রচনাও ছিল। অযত্নে ও প্রায় অজ্ঞাতেই ঐ পুস্তকরাশি প্রায় দুই শত বৎসর পড়িয়া ছিল। বহু লোকে কৌতূহলচাপল্যের বশে কতক কতক পুথি নাড়াচাড়া ও ওলট্-পালট্ করিয়াছেন, কেহ বা এটা-সেটা বাড়ীতে লইয়া গিয়া আর ফেরত দেন নাই। কতকগুলি পোকায় কাটিয়াছে, কতক বা একচাপে বহুদিন থাকায় এমন ভাবে জুড়িয়া গিয়াছে যে, পত্রগুলি টানিয়া পৃথক্ করা যায় না; করিতে গেলে সেগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। এই বিপর্য্যয় অবস্থা হইতে গঙ্গারামের স্বরচিত গ্রন্থাবলীর উদ্ধারের চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গেল, তাঁহার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম রচনা বাংলা রামায়ণ অধিকাংশস্থলেই বিনষ্ট—পাঠ-উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই : "ঊষাহরণ কাব্য" একেবারেই পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, আর কোন বাংলা রচনা ছিল কি-না তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না—অর্থাৎ অনুমান হইলেও তাহার প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিবেশীগণের অযথা কৌতূহলের দৌরাত্ম্য এবং কালের সর্ব্ববিনাশকর প্রভাব, এই দুইয়ের ফলে ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে।

কিন্তু "ঊষাহরণ কাব্যের" দলিল অপ্রত্যাশিতরূপে পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিভাণ্ডারের মধ্যে "ঊষাহরণ কাব্যের" কয়েকটি ছিন্নপত্র ও রচয়িতার নাম "গঙ্গারাম" এইরূপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। "গঙ্গারাম" লিখিত "সত্যনারায়ণের কথা"রও কয়েকখানি ছিন্নপত্র ঐ স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। গঙ্গারামের রামায়ণের সহিত লিপিসাদৃশ্যবশতঃ আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে এই তিন পুস্তকের রচয়িতা একই ব্যক্তি। ইহার পর জমিদার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার রায় মহাশয়ের নড়াইলের

বাটীতে কতকগুলি পুরাতন পুস্তক দেখিতে দেখিতে "আচার্য্য"† নামক একখানি মাসিকপত্রের কয়েক সংখ্যা একত্র বাঁধান দেখিতে পাই। উক্ত পত্রিকার ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গঙ্গারাম দত্ত সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে তৎপ্রণীত "ঊষাহরণ কাব্য" হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উক্ত রচনা সম্বন্ধে পাঠকগণের একটা ধারণা জন্মাইবার জন্য নিম্নে দু-এক স্থল তুলিয়া দিতেছি ঃ—

ঊষা নামে তার কন্যা, বরাঙ্গনা মাঝে ধন্যা,
রূপে গুণে লক্ষ্মীর সমান।
চমের গঞ্জিত কেশে, ফলক ললাট দেশে,
ভুরু যুগ কামের কামান ॥
শিশু মৃগ জিনি আঁখি, নাচয়ে খঞ্জন পাখী,
শ্রুতিপুট গঞ্জিয়া গিধিনী।
নাসা তিল ফুলজিনি, মুখছটা সুনলিনী,
দন্তরুচি জিনি সৌদামিনী ॥
অধরে প্রবাল আভা, ওষ্ঠে জিনি বিম্বজবা,
গণ্ডে জিনি কনক দর্পণ।
মৃণাল নিন্দিত ভুজে, চম্পক অঙ্গুলি মাঝে,
নখে তায় যেন তারাগণ ॥
* * *
গমন করির শুণ্ড, চরণে নূপুর খণ্ড,
রাজহংস জিনি করে গতি।
উর্ব্বসী মেনকা আদি, দেব কন্যা যথাবিধি,
ঊষা যেন মদনের রতি ॥
বাক্যের ঈশ্বরী মাতা, হও মোরে বরদাতা,
মতি রহে বিমল চরণে।
গঙ্গারাম দত্ত গায়, বন্দিয়া ব্রাহ্মণ পায়,
ঊষারূপ ঊষাহরণে ॥

অনিরুদ্ধের সহিত দৈত্যগণের যুদ্ধ ঃ—

তবে ত প্রমথগণ দানব বিস্তর।
তাহা সবাকারে আজ্ঞা দিল নৃপবর ॥
রণরঙ্গে বিশারদ নানা অস্ত্র ধরে।
আষাঢ়ের মেঘ যেন বর্ষে ভূমিপরে ॥
বিদ্যুৎ সমান বাণ করে চকচকি।
একাকারে পড়ে বাণ অনিরুদ্ধে ঢাকি ॥
প্রমথ দানবগণ যুদ্ধে বিশারদ।
যার যুদ্ধে দেবগণ গনেন আপদ ॥
কেহ মহীপথে যায় কুঞ্জর আকার।
কেহ বা গগনে যেন মেঘের সঞ্চার ॥
প্রদ্যুম্ননন্দন বীর বিক্রমে অপার।
নির্ভয় শরীর, যেন সমরে কুমার ॥
বলভদ্র সমবলে ধাইল সম্মুখে।
পরিখ লইয়া বীর ঘুরয়ে কৌতুকে ॥
ছিন্ন ভিন্ন করি সবে নানা দিক ধায়।
কার মাথা কার হাত পরিঘের খায় ॥
কার নাসা কার কান কার ভ্রুবঙ্ক।
রণমাঝে পড়িলেক সেনা লক্ষ লক্ষ ॥ ইত্যাদি।

রামায়ণ, ঊষাহরণ, সত্যনারায়ণের কথা ব্যতীত সুদাম চরিত্র নামক একখানি পুস্তকও গঙ্গারাম কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের এক পত্রের একটি মাত্র টুক্‌রা আমি দেখিয়াছি, উহাতে এইটুকুমাত্র পাওয়া যায় ঃ

মুকুংদ সংগল নাম, পুণ্যকথা……ধাম,
পরকাল নিস্তর শ্রবণে।
ধ্যান করি বাণি পায়, গংগারাম দাস গায়,
প্রণমিয়া ব্রাহ্মণ (চরণে ?) ॥

এই পুস্তকখানি লিপিকার দেবনাগরী অক্ষরে লিখিয়া ছিলেন। ইহার শেষ কয়েক পঙক্তিতে একটা তারিখের উল্লেখ আছে।

ইতি সুদাম চরিত্র সমাপ্ত ঃ

সন ১১৭৭ (অক্ষরেও লেখা) ৮ শ্রাবণ, শনিবার লিখিতং শ্রীবৈষ্ণবদাস পঠনার্থী শ্রীরামহরি দাস। বাংলা ১১৭৭ সাল ইংরাজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ। সুদাম চরিত্র ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ—পলাশীর যুদ্ধের সময়ে এবং সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যকালে গঙ্গারাম জীবিত ছিলেন।

† "আচার্য্য" মাসিক পত্রিকা নড়াইলের কতিপয় ভদ্রলোক ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত করেন। ১২৮৯ সালের ভাদ্র সংখ্যার পর পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত "গঙ্গারাম দত্ত" প্রবন্ধের লেখক ছিলেন গঙ্গারামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র কুঞ্জবিহারী দত্ত।

এক্ষণে গঙ্গারামের বাংলা রামায়ণের কথা আলোচনা করা যাউক। ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পুথির ৩৩৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত পত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পত্রে দুই পৃষ্ঠা। পুথির আকার ক্ষুদ্র নহে—পুরা এক হাতের বেশী লম্বা এবং ৪।৫ আঙ্গুল চওড়া। লেখাগুলি খুব ঘন এবং অক্ষর আকারে ছোট। তুলট কাগজের উপর সেই প্রাচীন কালীতে লেখা যাহার বর্ণ ও উজ্জ্বলতা দুই শত বৎসরেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নিমকাঠের দুইখানি ফলক পুথির আবরণ। এই ফলকের উপর প্রাচীন চিত্রকলার রীতি অনুসারে রামায়ণের কতিপয় ঘটনা নানাবর্ণে চিত্রিত। চিত্রের রং একটু মলিন হইলেও বেশ স্পষ্ট। রামায়ণখানি পড়িলে স্বতঃই এই কথা মনে হয় যে, যথারীতি একটু মার্জ্জনঘর্ষণ করিয়া লইয়া পুথিখানি উপযুক্ত সময়ে ছাপাইলে প্রচলিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট হইত না। দুঃখের বিষয়, উত্তরাকাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ গ্রন্থকার লঙ্কার পরে উত্তরা লিখিবেন স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন। গঙ্গারামের এই সুবৃহৎ রামায়ণের কয়েক স্থান হইতে রচনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতেছি :—

রামরাজত্ব—

বেদবেদাঙ্গের মত ভ্রাতৃগণসনে।
নিবিষ্ট হইলা রাম প্রজার পালনে॥
ধর্ম্মের করেন রক্ষা সামদণ্ডভেদে।
হৃষ্টপুষ্ট জনসর্ব্ব রামের প্রসাদে॥
হইল প্রথিবী সর্ব্ব ধনধান্যময়।
বিধবা না হয়ে নারী নহে সর্পভয়॥
নাহি রোগ শোক তথা চোর দস্যু ভয়।
পিতায় না করে শ্রাদ্ধ না মরে তনয়॥
সর্ব্বলোক হরশিত ধর্ম্মপরায়ণ।
ধর্ম্মময়ে দেখে রাম জেন নারায়ণ॥
* * * *
নিত্য পুষ্প নিত্য ফল হয়ে তরুগণে।
কালে বরিষয়ে মেঘ হিত চিন্তি মনে॥
সুখস্পর্শ সমীরণ রামরাজ্যে সদা।
নাহি ব্যাধি দুষ্ট ভয়ে নারীগণে মুদা॥
* * * *
বাপ খুড়া ভক্তি করে কুলের নন্দন।
মান্য জ্যেষ্ঠা ভগ্নী (সেবা) অন্য নাহি মন॥
শ্বশুর মাতুল সেবা দেবগুরু দ্বিজ।
অতিথির পূজা আর বর্ণধর্ম্ম নিজ॥
* * * *
কুবেশ মলিন নাহি রামের নগরে।
নৃত্যগীত আনন্দিত প্রতি ঘরে ঘরে॥ ইত্যাদি।

সীতাহরণ প্রয়াসী রাবণের প্রতি সীতার উক্তি :

মহাবর পতি মোর মহেন্দ্র সমান।
মহোদধি সমগুণে মহাবলবান॥
* * * *
পূর্ণচন্দ্র নিভানন শূর বলবান।
রাজপুত্র জিতেন্দ্রিয় নরেন্দ্র বাখান॥
প্রথুকির্ত্তি মহাতেজ প্রতাপে তপন।
সিংহপরাক্রম বীর ধর্ম্মপরায়ণ॥
তার অনুগতা আমি সতী কুলবতী।
বিদিত নাহিক তোর মোর জেই পতি॥
* * * *
শৃগাল হইয়া তুমি ব্যাঘ্র পত্নিইচ্ছা।
হেন আশা নিরাকার পাপমতি মিছা॥ ইত্যাদি।

সাগর বন্ধন :

সুগ্রীবের মন্ত্রী জত পাত্র হনুমান।
তাহা সভা প্রতি রাম কহিল বিধান॥
সমুদ্রের কথা সভে সুনিলে বিদিত।
শেতুবন্ধ কর সভে নলের সহিত॥
* * * *
রামের আদেশে তবে ধায় প্লবঙ্গমা।
সাগরে তরঙ্গ জেন নাহি তার শিমা॥
মহাবনে প্রবেশিল হাজারে হাজার।
ধাইল সকল সেনা বানর রাজার॥
আস্কোটন্তি হরশিতে কিনকিনা ধ্বনী।
বানরের বেগে জেন কাপেন মেদিনী॥
পর্ব্বত আকার সভে আনয় পর্ব্বত।
বনের করয়ে শূন্য শিলাতরু জত॥

মূলসনে মহাতরু উফারিয়া আনে।
তার গর্ত্তে রসাতল জেন বিদ্যমানে॥
শাল তাল তমাল কদম্ব অশ্বকর্ণ।
সরল অর্জ্জুন বৃক্ষ কুটাজ বিবর্ণ॥
সমূলে উন্মূল করি লয়ে তরুগণ।
ইন্দ্রধ্বজ চলে জেন বহিয়া বারণ॥
* * * *
দশ কোটি পরিমাণ ষষ্ঠীগুণ তার।
এত সংখ্যা ধায় কপি সাগর মাঝার॥
সভে মেলি বহে তরু পর্ব্বত শিখর।
একানল করে বদ্ধ সাগর উপর॥ ইত্যাদি।

লঙ্কার বর্ণনা :

দেখিয়া লঙ্কার শোভা নানা রত্ন শাজে।
কাঞ্চন রচিত দ্বার মণি মাঝে মাঝে॥
বিবিধ তোরণ নানা বর্ণে বিভূষিত।
* * * *
প্রাকার পরম শোভা বিবিধ পরিখা।
বিস্ময় বানরগণ দেখে অনিমিখা॥
প্রাচির বিবিধ ছন্দে পূর্ণকুম্ভ তাহে।
দ্বারে দ্বারে তমনাশে (দীপগণ ?) জাহে॥
অষ্ট দ্বার লঙ্কাপুরী প্রাকার বেষ্টিত।
অষ্ট জে প্রাকার সেই পরম শোভিত॥
শরতের আভ্র জেন শোভে পুরীখান।
পরম সুন্দর বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
সুবর্ণ রচিত দিব্য উদ্যান শোভিত।
প্রবাল মুকুতা মণি পতাকা ভূষিত॥
নানাবর্ণে শোভে লঙ্কা অতি রুচিময়।
দেখিয়া বানরগণ পরম বিস্ময়॥ ইত্যাদি।

রাবণ বধ :—

ইন্দ্রের সারথী সেই আপনী মাতলী।
রামেরে কহেন বীর হৈয়া কৃতাঞ্জলি॥
* * * *
জেই অস্ত্র পিতামহ করিল নির্ম্মাণ।
ব্রহ্মশির নামে তার জগতে আখ্যান॥
* * * *
অন্য অস্ত্রে রাবণের নাহি হবে বধ।
না কর অবজ্ঞা তুমি দেবের বিপদ॥
মাতলীর বাক্যে রাম হয়ে অবহিত।
লইলা সারঙ্গ ধনু বৈকুণ্ঠ পুজীত॥
* * * *
জাহে গুণ দিতে মহি করে টলমল।
সেই ধনু হাতে করি উঠে মহাবল॥
অগস্ত্যের দত্ত বাণ হাতে করি লয়।
মহাসর্প গর্জ্জে জেন শর রুচিময়॥
ব্রহ্মার নির্ম্মিত শর ইন্দ্রের কারণে।
ইন্দ্র তাহা অগস্ত্যেরে দিল ঘোর বনে॥
অগস্ত্য রামেরে দিল ধনুক সহিত।
পবন জাহার পায়ে বহে সাবহিত॥
(ফলে তার) অগ্নি সূর্য্য রহে ত্যাগকালে।
আকাশ শরীর জার গৌরব বিশালে॥
* * * *
হেমময় পুংখ সেই শরে বিভূষিত।
সকল দেবের তেজ তাহাতে জড়িত॥
সর্ব্বভূত বীর্য্য তাহে কেহ না এড়ায়।
সহস্র সূর্য্যের সমো বাণ শোভা পায়॥
সধূম (আগুন) কাল (জন জিহ্বা) খেলে।
সাক্ষাত তক্ষক জেন ভিষণ গরলে॥
* * * *
বেদমন্ত্র পড়ি রাম সেই অস্ত্র এড়ে।
অস্ত্র দেখি দেবাসুর মোহ হৈয়া পড়ে॥
* * * *
মহাঅস্ত্র দেখিয়া রাবণ জড়ী (?) হয়ে।
নাহি চলে হস্তপাদ মুগ্ধ হৈয়া রহে॥
বেগে গিয়া সেই বাণ লাগে তার বুকে।
নদী জিনি রক্তধারা নিকলিল মুখে॥ ইত্যাদি

উপরি-উক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি দেখিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, গঙ্গারামের কবিত্ব শক্তি নগণ্য নহে। দেশকালপাত্রের সুবিধা পাইলে গঙ্গারামও কৃত্তিবাস, কাশীরাম এবং ভারতচন্দ্রাদির মত বিখ্যাত হইতে পারিতেন, মনে হয়।

পরিশেষে, গঙ্গারামের রামায়ণের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। গঙ্গারামের বাংলা রামায়ণ মূল সংস্কৃত রামায়ণের এত নিকটগামী যে, স্থানে স্থানে রচনা ঠিক যেন অনুস্বারবিসর্গবর্জ্জিত সংস্কৃত। গঙ্গারাম যে সংস্কৃত ভাল জানিতেন এবং মূল রামায়ণের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখিয়া বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত মিলগুলি দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে ঃ

মূল সংস্কৃত—(অযোধ্যা বর্ণনা)

কপাট তোরণবর্তীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
* * * *
দুর্গগম্ভীর-পরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্॥

গঙ্গারাম—গম্ভীর পরিখদুর্গ নানা অস্ত্রধারী।
কপাট তোরণ রন্ধ্রে বেড়ী শারী ২॥

মূল— গোলাঙ্গুলেষু চোৎপন্নাঃ কিঞ্চিদুন্নতবিক্রমাঃ।
ইত্যাদি—আদিকাণ্ড।

গঙ্গারাম—
গোলাঙ্গুল আদি কপি দেবতার তেজে। ইত্যাদি।

মূল— পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসঞ্জিতেন্দ্রিয়ম্।
* * * *
পৃথুকীর্ত্তিং মহাবাহুং ···
মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
(অরণ্য)

গঙ্গারাম— পূর্ণচন্দ্র নিভানন শূর বলবান।
রাজপুত্র জিতেন্দ্রিয় নরেন্দ্র বাখান॥
প্রথুকীর্ত্তি মহাতেজ প্রতাপেতপন।
সিংহ পরাক্রম বীর ধর্ম্মপরায়ণ॥

মূল— নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা।
গঙ্গা— আদিত্যের প্রভা যেন ছুইতে না পারি।
রামঅনুগতা তেন আমি কুলনারী॥

মূল— কালকূট বিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তু মিচ্ছোসি।
গঙ্গা— কালকূট বিষ পিয়া সুখে হবে গতি।
মূল— ব্রূহি ব্রূহীতি রামস্য ব্রুবাণস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
ত্যক্ত্বা শরীরং গৃধ্রস্য প্রাণা জগ্মু বিহায়সম্॥
(জটায়ুর প্রাণত্যাগ)

গঙ্গা— প্রাণ ত্যজে পক্ষীরাজ দেখেন সাক্ষাত।
কহো ২ বলি রাম জোড় করে হাত॥
মূল— সৌমিত্রে হরকাষ্ঠানি নির্ম্মথিষ্যামি পাবকম্।
(অরণ্য)

গঙ্গা— লক্ষ্মণ আনহ কাষ্ঠ অগ্নিকর দীপ্ত।
মূল— অনুতিষ্ঠতি যেদিষ্যাং পনসঃ পনসো যথা।
(লঙ্কা)

গঙ্গা— পনস বানর ফাঠে পনস সমান।
মূল— খরহন্তা স তে ভর্ত্তা রাঘবঃ সমরে হতঃ।
(লঙ্কা)

গঙ্গা— খরহন্তা তোর পতি বধিলাম রণে।

ইত্যাদি বহু বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

অনুমান হয়, এই গঙ্গারামই "মহারাষ্ট্র পুরাণ" রচয়িতা। কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপাতত উপস্থিত না থাকায় ঐ বিষয় আলোচনা করিলাম না।‡

‡ গঙ্গারামের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার দত্ত মহাশয় কবির সমস্ত পুথিরাশি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিতে দিয়া এবং মৌখিক তথ্য প্রদান করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

হয় ত

শ্রীগৌতম সেন

নদীর ঘাটে কাঙ্গালীর মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিয়াছে। ভোর না হইতেই খেয়াঘাটে লোকে লোকারণ্য। খবর পাইয়া রমানাথও আসিল।

—কাঙ্গালীর বৌটা গেলো কোথায়? জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে রমানাথ কাঙ্গালীর ঘরের দিকে চাহিল।

সত্যই সে-খেয়াল কাহারও এতক্ষণ ছিল না। নায়েব মশায়ের প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই সচেতন হইয়া উঠিল। বৌটা সত্যই নাই ঃ কাঙ্গালীর ঘর খালি পড়িয়া আছে।

—বৌটাকে নিয়ে কাঙ্গালীর কিছু গোলমাল হ'য়ে থাক্‌বে বোধ করি। সকলকেই শুনাইয়া রমানাথ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের দিকে চাহিল।

ঘটনা এই পর্যন্ত। কিন্তু ইহার পর কাঙ্গালীর স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া যেসব কাহিনী পল্লবিত হইয়া উঠিল তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই এবং গল্পও নহে। গল্প হয় ত এইটুকু ঃ

নূতন নায়েব রমানাথ অতি অল্প মূল্যে কেন যে কাঙ্গালীকে ঘাট বিলি করিয়াছিলেন, তাহা অন্যে না জানিলেও চরণ জানিত। তাই একদিন সে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, ঈশান দাসের সাহস ছিল, কিন্তু বুদ্ধি ছিল না।

হয় ত সত্য। কেবল বুদ্ধির দোষেই ঈশানের মত পাকা লোককেও অকালে মরিতে হইল। ঘোড়ায় চড়িয়া সেই যে বাহির হইয়া গেল আর ফিরিল না।

কিন্তু রমানাথ ঈশানের মত নির্বোধ নয়। অল্প বয়সটাকে সে এমন করিয়া পাঁচজনের সম্মুখে দাঁড় করাইল যে, সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণের ছেলে—বংশগুণ যাবে কোথায়!

রমানাথ ঈশান দাসের পরিত্যক্ত আসনে ভাল হইয়া বসিল। বসিয়াই দেখিল কাঙ্গালীর বৌকে ঃ হাল্কা একখানি সাদা মেঘ—পল্লীর নীল বুকে যেন উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।

চরণ কাঙ্গালীর কানে মন্ত্র দিয়াছে, ঘাট যদি পেতে চাস্, বৌকে দে মা-ঠাকরুণের কাছে পাঠিয়ে।

রমানাথের খ্যাতি—বিনয় এবং সদাচারকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে কাঙ্গালীর ধারণা হইয়াছিল, এই দেবতার চরণ ধরিয়া পড়িলে কি না হয়!

রমানাথ স্বপ্ন দেখে ঃ সেই সাদা মেঘের স্বপ্ন। ঘোড়া ছুটাইয়া সেও চলিয়াছে, আর ফিরিল না।

কাঙ্গালীর বৌ আসিয়া যখন নায়েব-বাড়ী প্রবেশ করিল, তখন রমানাথ কি-একটা কাজে নীচে নামিতেছিল। সিঁড়ির পথে হইল দেখা।

কাঙ্গালীর বৌ লজ্জায় জড়সড় হইয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

রমানাথের ইচ্ছা হইল তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দুটি কথা বলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাহার সেই সাদা মেঘের স্বপ্ন। হয় ত কাঙ্গালী এইখানেই কোথাও ওৎ পাতিয়া আছে ঃ ঈশান দাসও ত একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।—রমানাথ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, ওপরে এসো।

উপরে আসিয়া কাঙ্গালীর বৌ একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইল। ঘরগুলি প'ড়ো-বাড়ীর মতই ভয়াবহ! যেন কতকালের কুৎসিতকাহিনী তাদের প্রতিটি দেওয়ালে আঁকা রহিয়াছে!

রমানাথ বুঝিল, বৌটা ভয় পাইয়াছে। বলিল, তোমাদের মা-ঠাকরুণের এখনও পুজো শেষ হয়নি।

—যাক্, মা-ঠাকরুণ তা হ'লে আছেন—আপন মনে উচ্চারণ করিয়া বৌটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

—তুমি কে, তা ত বল্লে না? তোমার নাম কি? রমানাথের চোখে ক্ষুধিত দৃষ্টি।

—আমরা বড় গরীব। বলিয়া বৌটা মুখ নামায়।

—তোমার নাম ত বল্লে না?

—আমার নাম সখিয়া।

—বাঃ, বেশ নাম ত।

সখিয়া লজ্জায় লাল হইয়া ওঠে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও হয় ত আসে, সেইটুকু ঢাকিতেই সে মুখ নীচু করিল। বলিল, গোমস্তাবাবু জানেন—ঐ ঘাটই আমাদের সম্বল।

—ও, তুমি কাঙ্গালীর বৌ?

—হুজুর—বলিয়া কাঙ্গালীর বৌ রমানাথের পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

রমানাথ সখিয়ার অনেক খবরই একটু একটু করিয়া জানিয়া লইল। কোথায় তাহার বাড়ী, কেই বা তাহার আর আছে। কিন্তু কাঙ্গালী সম্বন্ধে সখিয়া একটি কথাও ভাঙিল না। তা না ভাঙুক—রমানাথ বুঝিল, তাহার কাছে কাঙ্গালী অতি তুচ্ছ। মুখখানিকে যথাসম্ভব হাসিতে সুশ্রী করিয়া রমানাথ দুটি টাকা বাহির করিয়া সখিয়াকে দিল।

সখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

—এখন এই নে।

সখিয়া নড়ে না। রমানাথ হাসিয়া ফেলিল। সখিয়ারও তা হ'লে আত্মমর্যাদা আছে! বলিল, ঐ দুটো টাকা দিয়েই বিদায় দেবো না রে—ঘাটের ব্যবস্থা আমি করব। কাল কাঙ্গালীকে একবার পাঠিয়ে দিস্।

সখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বার বার তাহার মাথাটি রমানাথের পায়ের উপর রাখিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল।

—ছাড় ছাড়, আমাকে এখন পূজো করতে হবে।

সখিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, রমানাথ তখন নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে। টাকা দুইটি আঁচলে বাঁধিয়া সখিয়া ধীরে ধীরে নায়েব-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন কাঙ্গালী আসিল। রমানাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। স্বপ্নের সেই কালো-দেহের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য আছে কি-না, বোধ-করি তাহাই দেখিতেছিল। বলিল, খেতে দিতে পারবি না ত বিয়ে করেছিলি কেন?

কাঙ্গালী 'আজ্ঞে আজ্ঞে' করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না।

—মাঝির কাজ কত দিন করছিস?

—আজ্ঞে, ছোট থেকেই।

—তবে টাকা দিতে পারবি না কেন?

—আজ্ঞে, কিছু নেই হুজুর।—বিয়ে করতেই খোখানেক বেরিয়ে গেল।

রমানাথ মুখ বাঁকাইয়া হাসিল। বলিল, তবে আর কি! এখন বৌ-ই তোকে খাওয়াক।

—হুজুর!

রমানাথ ধমক দিয়া বলিল, চোপ! কত টাকা দিবি?

কাঙ্গালী তাহার কাপড়ের গিঁট খুলিয়া পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া রমানাথের পায়ের কাছে রাখিল। বলিল, আমার আর একটি পয়সাও রইল না হুজুর।

চরণ ঠিকই বলিয়াছে, তাহাদের খুবই ভাগ্য তাই এমন মনিব পাইয়াছে। কাঙ্গালীর খুশী আর ধরে না। সারাদিন নৌকার কাজ করিয়া একটু অবসর পাইলেই কাঙ্গালী নায়েব-বাড়ী আসিয়া হাজির হয়। ইচ্ছা—কত তুচ্ছ কাজই ত রহিয়াছে, যাহা হয় নিজের হাতে করিয়া দিয়াও যদি একটু কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারে। রমানাথ কোনদিন যদি বলে, কি রে, কাজকর্ম্ম কেমন চল্‌ছে কাঙ্গালী? কাঙ্গালী অম্নি আহ্লাদে গলিয়া পড়ে। ঐ একটুমাত্র কথা —কাঙ্গালী যেন উহার মধ্যে কত অনুগ্রহের সন্ধান পায়। আস্তে আস্তে রমানাথের পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার পা টিপিয়া দেয়।

সেদিন কাঙ্গালী আসিতেই রমানাথ বলিল, আরে, একটা ঝি ঠিক ক'রে দিতে পারিস—দু-এক দিনের জন্যে? ঝি-টার কাল থেকে হয়েছে জ্বর—

—বৌকে পাঠিয়ে দেব, আমরা আপনারই ত খাচ্ছি হুজুর! বলিয়া কাঙ্গালী যেন পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। তাহার মত লোক মনিবের একটা উপকারে আসিবে ইহা কি কম কথা?

সখিয়া আবার আসিল। কিন্তু আসিয়াই মনে করিল, না আসিলেই ছিল ভাল।

সখিয়া নীরবে কাজ করিয়া যায়, রমানাথ একটি কথাও বলে না। শুধু আড়ালে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখে। দেখে, কি আছে ঐ নীরবতার মাঝে? ওকি আমার কথা একবারও ভাবে না? আমার এই রূপ, এই ঐশ্বর্য—ইহার কোনটিই কি উহাকে মুগ্ধ করে নাই? এখনও কি ও কাঙ্গালীর কথা মনে-প্রাণে ভাবিতে পারিতেছে?

হঠাৎ চোখো-চোখি হইয়া যায়। সখিয়া চোখ নামায়।

—বাঃ, সব কাজ শেষ হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি! বলিয়া রমানাথ হেসমুখ হাসি লইয়া দুটি টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল।

সখিয়া কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, রমানাথ বাধা দিয়া বলিল, আমি মনিব, 'না' বল্‌তে নেই।

কাঙ্গালী টাকা দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসে। বলে, রাজা—রাজা। ওদের কাছে কি এর দাম আছে রে!

পরদিনও যথাসময়ে সখিয়া আসিয়া কাজে লাগিল। রমানাথ তাহার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে—ইচ্ছা করিয়াই, একখানি পাঁচটাকার নোট যেন পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে ফেলিয়া গেল।

ফিরিতে তাহার দেরী হইল না। আসিয়া দেখিল, সখিয়া কাজ সারিয়া তাহারই ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

—কি গো সখি?

সখিয়া নোট বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিল: আপনার পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছে।

রমানাথ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, পকেট থেকে! বলিয়াই মৃদু হাসিল।

বলা বাহুল্য রমানাথ সে টাকা আর লইল না।

সখিয়ার বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। ভাবিল, কোন রকমে একবার এই বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতে পারিলে আর সে ইহার ছায়াও মাড়াইবে না।

রমানাথ ইহার অর্থ বোঝে। বলিল, যা, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে না। কেউ দেখে ত—

কিন্তু সখিয়াকে আবার যাইতে হইল। তাহার শত অনুনয় বিনয় কাঙ্গালীর উচ্চকণ্ঠের নীচে চাপা পড়িয়া গেল। বলিল, হারামজাদি! তোর রূপ দেখে আমার পেট ভরবে? খাবি কি? এই ঘাট যদি আজ কেড়ে নেয়—যা লক্ষ্মী, অমন বাবু আর হয় না। ঝিটার অসুখ হ'লো, ভাবলাম, আমরা থাক্‌তে বাবুর কষ্ট হবে—তা হারামজাদির দুদিন খেটে দিলে গতর ক্ষয়ে যাবে!

সখিয়া কাঁদিতেও পারিতেছিল না: তাহার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে।

—তাও তুই মাগনা খাটিসনি, বাবু টাকা দিয়েছে।

সখিয়ার আর সহ্য হইল না। ঘৃণায় সর্বশরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পাঁচ টাকার সেই নোটখানা কাঙ্গালীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘরে বসিয়াই রমানাথ টের পাইল, সখিয়া আসিয়াছে এবং কাজও করিতেছে। কিন্তু আজ সে ঘর হইতে বাহিরই হইল না। শুধু সিন্দুকটার দিকে চোখ রাখিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কাজ সারিয়া সখিয়া নিজেই উপরে আসিল। বলিল, কই, টাকা দেবে না বাবু?

রমানাথ হাসিতে হাসিতে সিন্দুক খুলিল।

সখিয়া চোখের নিমেষে টেবিলের উপর হইতে একটি পিতলের তালা তুলিয়া লইয়া রমানাথকে ছুঁড়িয়া মারিল।

রমানাথ আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কপাল কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। সখিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

একটু পরে চরণ আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই সখিয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল।

সারাদিন তার উদ্বেগের আর অন্ত রহিল না। তাহার কেবলই থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, হয় ত একটু পরেই তাহাদের উভয়েরই ডাক আসিবে: হয় ত একটা ভীষণ শাস্তি তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াই আছে। একটা ভীরু দৃষ্টি লইয়া সে যেন প্রতিটি চেতন-অচেতন বস্তুকে নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া ফিরিতেছে।—কেন সে অমন করিল? হয় ত তাহারই বুঝিবার ভুল। টাকা দিয়াছে, তাহাতে কি হইয়াছে? তাহারা গরীব, হাত পাতিতেই ত জন্মিয়াছে!

কাঙ্গালী ইহার কিছুই জানিল না, সখিয়াও বলিল না।

শুধু তাহার অনুতপ্ত মন সারাক্ষণ রহিয়া রহিয়া আপন সীমাটুকুর মধ্যে গুম্‌রাইয়া কাঁদিয়াছে।

সকালবেলায় কাঙ্গালীর মুড়িগুড় নামাইয়া দিয়া সখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কাঙ্গালী মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

সখিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যেন ছুটিতে লাগিল। অনেক দয়াই ত করিয়াছেন, এবার কি তিনি ক্ষমা করিবেন না? রমানাথের রক্তমাখা মুখ মনে করিতে তাহার বুক শুকাইয়া যায়।

সখিয়া উপরে আসিয়া দেখিল, রমানাথ তখনও বিছানায় শুইয়া আছে। কপালটা নেকড়া দিয়া বাঁধা। স্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ দরজার কাছে সে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। রমানাথ একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, জ্বর হয়েছে।

সখিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিয়া তাহার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল।

রমানাথের বেশ লাগিতেছিল। চোখ বুজিয়া পরম তৃপ্তির সহিত তাহার আহত স্থানটিতে হাত বুলাইতে লাগিল।

—বাবু!

—হয়েছে, হয়েছে। বলিয়া রমানাথ উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মাথাটা বড় ঘুরিতেছে, জ্বরটাও আছে।

সখিয়া কাছে সরিয়া আসিল। চোখ দুটি তাহার জলে টল টল করিতেছে।

—আমি বোধ হয় আর বাঁচ্‌ব না সখি! রমানাথ বলিল।

সখিয়ার চোখের সম্মুখ হইতে কে যেন বাহিরটাকে লেপিয়া পুছিয়া দিয়া গেল। তারপর আর তাহার কিছু মনে নাই। হয় ত সমস্ত অবচেতনার মধ্যে একটি মমতা-মাখা হাত ধীরে ধীরে ঐ পীড়িতের কপাল স্পর্শ করিয়াছিল।

—ছাড়ুন। বলিয়া রমানাথের বাহুপাশ ছাড়াইয়া সখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বালিসের তলা হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া রমানাথ বলিল, আমাকে ক্ষমা কর: অসুখে আমার মাথার ঠিক নাই।

সখিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার যেন কত যুগ এখানে কাটিয়া গিয়াছে! বাহির হইবার জন্য সে দরজা খুঁজিতে লাগিল।

—বল, ক্ষমা কর্‌লে? রমানাথ উঠিয়া তাহার হাত ধরিল।

—আপনার আবার রক্ত পড়্‌ছে!

—পড়ুক। বলিয়া রমানাথ তাহার কপালের ব্যাণ্ডেজ টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিল।

সখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

—বল, একবার নিজের মুখে ব'লে যাও, ক্ষমা কর্‌লে?

সখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

রমানাথ শুইল, কিন্তু রক্ত পড়িতেই লাগিল।

সখিয়া তাড়াতাড়ি সেই রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ তুলিয়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার কপালে বাঁধিয়া দিল।

—সখি! রমানাথের হাতে টাকা।

—না।

—না, এ তোমাকে নিতেই হবে। আমাকে বুঝতে দাও, তুমি ক্ষমা করেছ।

সখিয়া টাকা লইয়া টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দু দিন সখিয়া শুধু নীরবে অশ্রুই ফেলিয়াছে। তাহার কাহিনী ত কাহাকেও বলিবার নয়। এ যে তাহার গোপনকাঁটা। ফেলিবারও উপায় নাই, বহিবারও সাধ্য নাই!

রমানাথের অসুখ আর লুকানো রহিল না। কাঙ্গালীও শুনিল। কিন্তু সখিয়ার মুখ শুকাইয়া গেল।—কাঙ্গালী যদি আরও কিছু শুনিয়া থাকে?

সন্ধ্যা হইতেই কাঙ্গালী আসিয়া চুপ-চুপ করিয়া বলিল একবার যা না সখি, খবরটা নিয়ে আয় মনিব আমাদের—

সখিয়া একবার কাঙ্গালীর দিকে চাহিল। সে চোখে কি ছিল, ঘৃণা? না, নিরুপায় দরিদ্র স্বামীর প্রতি মমতা!

সে রাত্রি সখিয়া গৃহে ফিরিল না। কাঙ্গালী সারারাত্রি প্রতীক্ষাই করিয়াছে, কিন্তু খোঁজ লইতে পারে নাই। কি করিয়া পারিবে? গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি—নায়েব-বাড়ীর সমস্ত অর্গল বন্ধ হইয়া গিয়াছে: দূর বাহিরের ক্ষীণকণ্ঠ ধনীর প্রাসাদ-দ্বারে হয় ত মাথা ঠুকিয়াই মরিবে! তাহার কণ্ঠ পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একটি প্রাণীও হয় ত জাগিয়া নাই!

কাঙ্গালীর কত কথাই মনে হইল। হয় ত রাধুর অসুখ বাড়িয়াছে, হয় ত সখিয়া রাগ করিয়াই মা-ঠাকরুণের কাছে থাকিয়া গেল। কিম্বা—

এই 'কিম্বা' মনে হইতেই কাঙ্গালীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জিত হইয়া তাহার দুর্বল মনটাকে ছি ছি করিতে লাগিল। তাহাদের যে দেওয়া মনিব।—

ভোরের আঁধারে পা টিপিয়া টিপিয়া সখিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কাঙ্গালী তখনও জাগিয়া আছে। হয় ত এই ভোরের প্রতীক্ষাই করিতেছিল সে। সখিয়া হাসিল। বলিল, ভাবনা হয়েছিল বুঝি?

—বাবু, বাবু কেমন আছে? কাঙ্গালী জিজ্ঞাসা করিল।

সখিয়া তেমনি করিয়াই হাসিয়া উত্তর দিল, ভাল আছে।

কাঙ্গালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রথম শিহরিয়া উঠিল।

নির্বোধ কাঙ্গালী যেদিন সমস্তই টের পাইল, সেইদিনই তাহার জীবনে যবনিকা পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কাঙ্গালী নৌকা লইয়া সেই যে গঞ্জে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

আর সখিয়া? সখিয়া হয় ত তখন রমানাথের শুভ্র-শয্যায় অনাগত আর এক মধুযামিনীর স্বপ্ন দেখিতেছিল।

কাঙ্গালী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সখিয়াও হয় ত শুনিয়াছে: হয় ত কাঁদিয়াছেও। কিন্তু সে কান্না শুনিল ভগবান।

হবো আমি সাবধান

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রিয়া ওগো প্রিয়তমা,
তব অজানিত অপরাধগুলি'
কর আজি তুমি ক্ষমা!
কর, কর ক্ষমা কর'
হৃদয়ের বোঝা নামাইতে দাও—
ব্যথা দুঃসহতর!
যতবার যাই, ফিরে আসি পুনঃ,
আগাইয়া পিছু আসি;
মনে হয় যেন বিচ্ছেদ সুরে—
বাজে মিলনের বাঁশী!
শুনিয়া চমকি! শিহরিয়া উঠি!
মনে মনে ভাবি কত;
কবে কোন্‌দিন অজ্ঞাতে তব
দোষ করিয়াছি শত!
সংশয় যত হৃদয়তে জাগে,
বাড়ে তত ব্যবধান—

ক্ষম, ক্ষম প্রিয়া, এইবার মোরে,
হবো আমি সাবধান।

জাপানের শিক্ষানীতি

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ

আমাদের আধুনিক শিক্ষানীতির গলদ জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দীর্ঘকাল শিক্ষা-বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আমরা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি। সুখের বিষয়, দেশের অনেক চিন্তাশীল মনীষী গুরুতর ও জটিল শিক্ষা-সমস্যার সুসঙ্গত সমাধানের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন বিশ্বভারতীর মারফৎ সারা বিশ্বের সভ্যতা ও কৃষ্টির আদান-প্রদানের বিপুল আয়োজনে। ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষা-পরিকল্পনার সাহায্যে শিক্ষাকে কর্ম্মজীবনের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিতর দিয়া দেশের অন্ন-সমস্যার মীমাংসায় তাঁহার বিরাট কর্ম্মশক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নিয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরাট ব্যবধানই আমাদের শিক্ষার প্রধান ত্রুটি। সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষা সংস্কারকগণের চেষ্টার মূলে রহিয়াছে—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধন। আধুনিক জাপানের শিক্ষানীতি—জ্ঞান ও কর্ম্মের সুন্দর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাপানকে সভ্যজগতে মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। এই শিক্ষানীতির ভিতর হয়ত ভারতের শিক্ষা-সমস্যা-সমাধানের পন্থা আবিষ্কারের আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। তাই জাপানের শিক্ষানীতি আলোচনার প্রয়োজন।

আজ জাপানের বিপুল শৌর্য্যবীর্য্য ও উগ্র রাজ্যলিপ্সার তাড়নায় চীন বিপন্ন। কিন্তু একদিন চীনই ছিল জাপানী সভ্যতা ও সাধনার সূতিকাগৃহ। চৈনিক সভ্যতাই জাপানের আদি শিক্ষা-দীক্ষার জননী। প্রাচীন জাপানীরা ছিল সিন্টো ধর্ম্মাবলম্বী। প্রকৃতি পূজার ভিতর দিয়াই সিন্টো ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখন শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল ধর্ম্মযাজক পুরোহিতগণের হস্তে। তাঁহারা এই ধর্ম্মমূলক শিক্ষাই আদিম জাপানীদের ঘরে ঘরে প্রচার করিতেন। এখানে-সেখানে দুই-একটা বিদ্যায়তনও ছিল। পুরোহিতগণই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যাপনা করিতেন। প্রাচীন ভারতের অধ্যাপকদের ন্যায় তাঁহারাও ছাত্রগণের নিকট হইতে আর্থিক দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু ছাত্রবেতনের পরিবর্ত্তে তণ্ডুল গ্রহণের রীতি তখন প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কনফিউসিয়ানিজম্ জাপানের শিক্ষিত সমাজের রীতিনীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতির অনেকটা সংস্কার সাধন করিল। জাপান যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল তখনও ধর্ম্মযাজকরাই ছিলেন জাপানের শিক্ষাগুরু।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকালে জাপানের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। "গুণকর্ম্ম বিভাগ" অনুসারে জাপানী-সমাজে শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জাপানী সমাজ—(১) রাজকর্ম্মচারী ও যোদ্ধা, (২) কৃষক, (৩) শিল্পী, (৪) বণিক ও (৫) এইনু (Ainu)—এই পাঁচভাগে বিভক্ত হইল। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া রাজকীয় ও সামরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহারা দাইমিয়ো (Daimios)-দিগের অধীনে যথাযোগ্য বেতনে চাকুরী করিত। তখন দাইমিয়োদিগের হাতেই ছিল রাজশক্তি। এই রাজকর্ম্মচারী ও যোদ্ধাশ্রেণীর লোকেরা প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। তাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ লেখাপড়া ও শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা করিত। মধ্যশ্রেণীর শিক্ষালয়ে তাহাদের শিখিতে হইত—চীন-জাপানের ইতিহাস ও আপিসের পত্রাদি লিখিবার রীতিনীতি ইত্যাদি। অবশিষ্ট চারি শ্রেণীর লোকদের জন্য কেবল প্রাথমিক শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পিণ্টো নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ নাবিক প্রথম জাপানে পদার্পণ করেন। তখন হইতেই ইউরোপের সহিত জাপানের পরিচয়ের সূত্রপাত হইল। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ জাপানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সুরু করিল। দিনে দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনা জাপানকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। চৈনিক সভ্যতার জড়তা যেন নবীন জাপানের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হইয়া উঠিল। কাজেই কর্ম্মকুশল জাপান কর্ম্মপ্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ইহার ভিতর দিয়াই যেন জাপান আপন মুক্তি-পথের সন্ধান খুঁজিয়া পাইল।

শিক্ষা মানব-সভ্যতা ও সাধনার ভিত্তিভূমি। যখন কোন জাতির সভ্যতার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয় তখন শিক্ষা-

দীক্ষার আমূল সংস্কার অনিবার্য্য হইয়া ওঠে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব যখন জাপানী সভ্যতার সর্ব্বস্তরে আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল তখন জাপানের শিক্ষার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সময়োপযোগী শিক্ষা-সংস্কারের ফলেই জাপান আজ সভ্যজগতে ধন্য ও বরেণ্য। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানে ইউরোপীয় আদর্শে জাতীয় শিক্ষার সূত্রপাত হয়। জাপানে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন জাপানী শিক্ষানীতির অনেক সংস্কার হইল। জাপানের শিক্ষা-দীক্ষা নূতন আদর্শে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বর্ত্তমান জাপান প্রাথমিক শিক্ষায় আমেরিকার ও উচ্চশিক্ষায় জার্মানীর আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছে। জাপান অন্যের আদর্শকে নিজের ছাঁচে না ঢালিয়া কখনই বিজাতীয় কোন কিছুর অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত নয়। জাপান আপন সভ্যতা ও সাধনার মূলভিত্তির উপরই পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জাপানের শিক্ষা-সংস্কারকগণ সাধারণ বিদ্যালয়গুলির সহিত টেকনিকেল স্কুলসমূহের বেশ একটা সুন্দর সমন্বয় ও সংযোগের সূত্র বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে। একের সহিত অপরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। নিম্নলিখিত চিত্র হইতে ইহাদের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইবে।

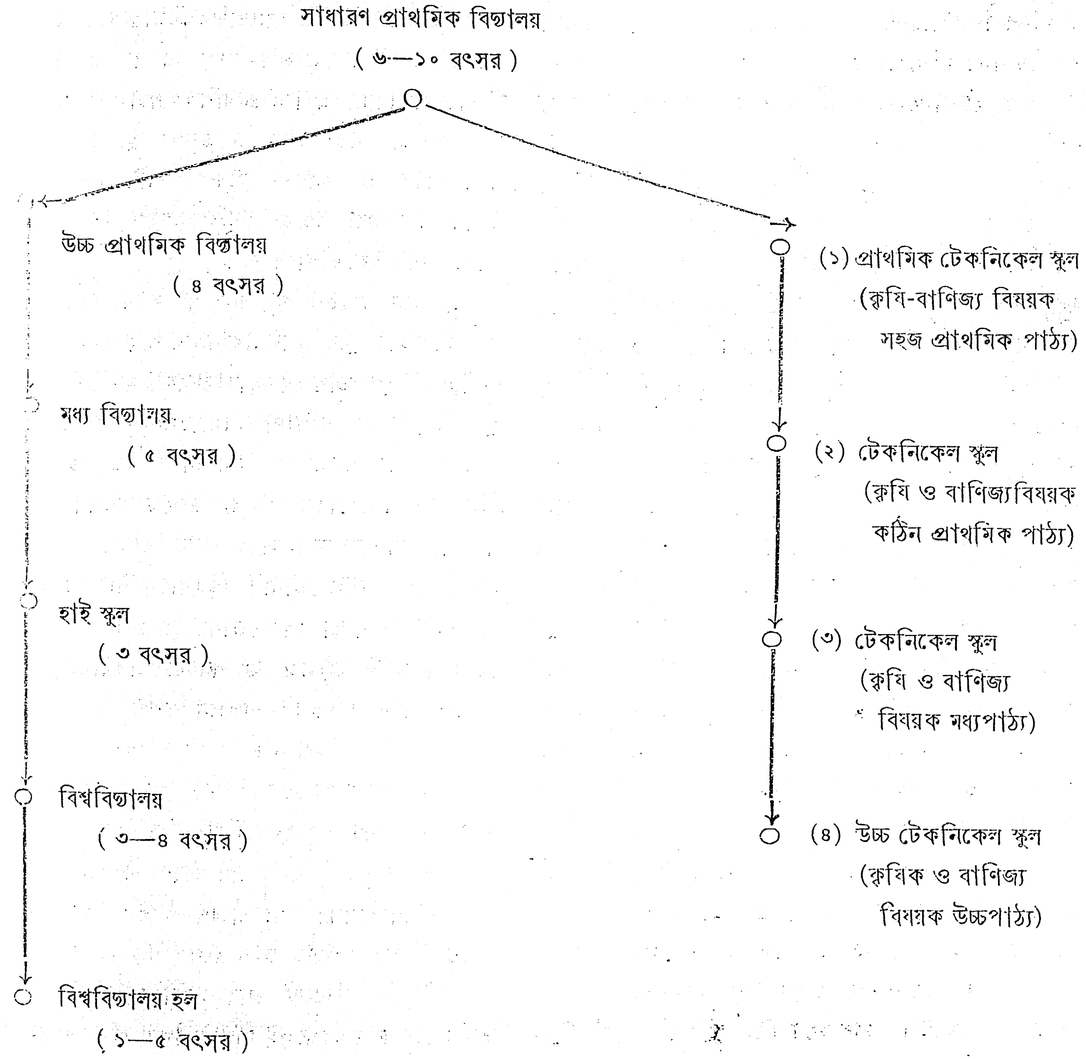

জাপানে ছয় বৎসর বয়সে বালক-বালিকা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখানে ছাত্রগণ সাধারণ লেখাপড়া, গণিত, নৈতিক উপদেশ, শারীরিক ব্যায়াম, চিত্রাঙ্কণ ও হস্তশিল্প শিক্ষা করে। এখানকার পড়া শেষ হইলে শিক্ষার্থী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা প্রাথমিক টেকনিকল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে। উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য ব্যতীত জাপানের ইতিহাস, ভূগোল ও ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রগণকে চারি বৎসর পড়িতে হয়। কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিলে দুই বৎসর পড়িয়াই মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অথবা উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা দুই নম্বর টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে। উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মধ্য শ্রেণীর তিন নম্বর টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিতে কোন আপত্তি নাই। উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ছাত্রছাত্রী সাধারণ নর্ম্ম্যাল স্কুলে পড়িতে পারে এবং সেখানকার শিক্ষা শেষ হইলে তাহারা উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুলেও ভর্ত্তি হইতে পারে।

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে অন্ততঃ বার বৎসর বয়সে মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভ করা দরকার। উচ্চাঙ্গের নৈতিক উপদেশ, জাপানী ও চীনা সাহিত্য, বিদেশী ভাষা (ইংরেজী), ইতিহাস, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শারীরিক ব্যায়াম, আইন, অর্থনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সকল বিষয়ই মাতৃভাষার সাহায্যে শেখানো হয়। ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বিদেশী ভাষায় পড়ান হয় না। মধ্য শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ সতর বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য হাই স্কুলে, উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুল ও মেডিকেল স্কুলে অথবা উচ্চ টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে। হাই স্কুলের পাঠ্য তিনভাগে বিভক্ত :—

(১) আইন কলেজে প্রবেশ করিবার উপযোগী পাঠ্য।

(২) কৃষি-বিজ্ঞান ও ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিবার উপযোগী পাঠ্য।

(৩) মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিবার উপযোগী পাঠ্য। জাপানের আইন কলেজে কেবল আইন শিক্ষা দেওয়া হয় না; সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিও পড়ান হয়। জাপানের আইন কলেজ আমাদের আর্ট কলেজের অনুরূপ। হাই স্কুলে তিন বৎসর পড়িয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। তখন বয়স অন্ততঃ উনিশ বৎসর হওয়া চাই। সেখানে তিন-চার বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া বি-এ পাশ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে।

টেকনিকেল স্কুলগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে। প্রাথমিক টেকনিকেল স্কুল হইতে ক্রমে উচ্চতর টেকনিকেল স্কুলে প্রবেশ করা যায়। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্টি-ফিকেট লইয়া যদি কেহ প্রাথমিক টেকনিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সেখানকার পাঠ্য যথাযথরূপে অধ্যয়ন করে তবে সে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর টেকনিকেল স্কুলে পড়িতে পারে। তজ্জন্য উচ্চপ্রাথমিক ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে তাহার পড়িবার প্রয়োজন হয় না। ভারতে কিন্তু এ সুবিধা ও সুযোগের নিতান্ত অভাব। এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন ছাত্র ইন্‌জিনিয়ারিং অথবা মেডিকেল স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করিলেও আই-এ অথবা আই, এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্‌জিনিয়ারিং কিংবা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে না।

জাপানে যাহারা খুব মেধাবী ছাত্র কেবল তাহারাই সাধারণত হাই স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। একবার যাহারা হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়, তাহারা বোধ হয় আর টেকনিকেল স্কুলে পড়ে না। জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছাত্রগণের মৌলিক গবেষণার সাহায্য করা অথবা উচ্চ রাজকার্য্যের উপযোগী মানুষ গঠন করিয়া তোলা। জাপানে টোকিও ও কাইটো এই দুইটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয় ছয়টি কলেজ ও কাইটো বিশ্ববিদ্যালয় চারিটি কলেজ লইয়া গঠিত। জাপানে দুইটি বেসরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ও আছে। পুরুষদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। মেয়েদের জন্য মনাকায় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-এ উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রতিভাশালী ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করে। প্রত্যেক কলেজ হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র হলে পড়িবার জন্য মনোনীত হইয়া থাকে। ভারতের ন্যায় জাপানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে-কোন ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয় হলে প্রবেশ করিবার

অনুমতি দেওয়া হয় না। সেইজন্য জাপানে উচ্চশিক্ষিত যুবকগণের সংখ্যা খুব বেশী নহে এবং তাহারা বেকারও বসিয়া থাকে না। বেকার-সমস্যার জন্য জাপানকে এতটা মাথা ঘামাইতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় হলে পাঁচ বৎসর মৌলিক গবেষণা করিয়া ছাত্রগণকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এই প্রবন্ধ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে ছাত্রগণ হাকুসি (Hakushi) অথবা গাকুসি (Gakushi) অর্থাৎ পি-এইচ্ ডি কিংবা এম্ এ উপাধি পাইয়া থাকেন।

জাপানের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোপরি কর্ত্তা—একজন কেবিনেট মন্ত্রী। একজন সম্পাদক, কয়েকজন আইন পরামর্শদাতা ও পরিদর্শক কর্ম্মচারী মন্ত্রী মহাশয়কে শিক্ষা বিভাগের কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিয়া থাকে।

জাপানে যাহারা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে শিক্ষকতা করিবার সনদ না পায়, তাহারা শিক্ষক হইতে পারে না। ভারতের ন্যায় জাপানে বি-টি অথবা এল-টি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত নাই। উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুলের বি-এ উপাধিধারী শিক্ষকগণ ললিতকলা ও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এবং যাঁহারা সনদ পাওয়ার উপযোগী শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষা পাশ করিতে পারেন—কেবল তাঁহারাই হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সনদ পাইয়া থাকেন। জাপানের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই একটা নর্ম্ম্যাল স্কুল আছে। কয়েক বৎসর হইল সমগ্র জাপানে সাতান্নটি নর্ম্ম্যাল স্কুল ছিল। আমাদের বাংলায় মাত্র পাঁচটি নর্ম্ম্যাল স্কুল। তন্মধ্যে গত বৎসর একটির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ভারতের নর্ম্ম্যাল স্কুলের ন্যায় জাপানের নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্রগণকেও বেতন দিতে হয় না। তাহাদের আহারাদির সমস্ত ব্যয় নর্ম্ম্যাল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ বহন করিয়া থাকে। নর্ম্ম্যাল স্কুলে পুরুষদের চারি বৎসর ও মেয়েদের তিন বৎসর পড়িতে হয়। উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুলের ব্যয়ভার জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। সেখানে মেয়ে-পুরুষ সকলকেই চারি বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।

ভারতের ন্যায় জাপানেও শিক্ষকতার আদর নাই। অন্য কোন কাজের সুবিধা না হইলেই মানুষ গুরুগিরি খুঁজিয়া লয়। সেখানে শিক্ষকগণ এক স্কুলে দীর্ঘকাল কাজ করেন না। যদি কেহ পনর বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং তাঁহার বয়স ষাট বৎসর হয়, তবে তিনি পেন্সন্ ভোগ করিতে পারেন। জাপানে শিক্ষকগণের পারিবারিক পেন্সনের প্রথা প্রচলিত আছে। দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর কোন শিক্ষকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গ পেন্সন্ ভোগ করিতে পারে। জাপানে হাইস্কুলের শিক্ষকের মাসিক বেতন এক হইতে সাত পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কলেজের অধ্যাপকের মাসিক বেতন পাঁচ হইতে পঁচিশ পাউণ্ডের বেশী হয় না।

জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কিন্তু অবৈতনিক নহে। মার্কিন যুক্তরাজ্যে, কানাডায় ও ফ্রান্সে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। জার্মানীতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলেও অবৈতনিক নহে। জাপানে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর গড়ে একজনের শিক্ষার জন্য চৌদ্দ আনা ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট এক আনার কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিয়াও শিক্ষাবিভাগে ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার পন্থা খুঁজিয়া থাকেন।

জাপানে জেলা বোর্ড অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদ্যালয়ে সাহায্য দেওয়ার রীতি নাই। দুই-একটা সরকারী বিদ্যালয় ব্যতীত প্রায় সকল স্কুলই সর্ব্বসাধারণের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। জাপানে ছাত্রগণকে বৃত্তি অথবা পুরস্কার দেওয়া হয় না। একান্ত প্রয়োজন হইলে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণকে অর্থসাহায্য করা হয়। কিন্তু এই সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়।

ভারতের ন্যায় জাপানী বিদ্যালয়ে বিরাট লিখিত পরীক্ষা-প্রণালী নাই। ছাত্রগণের প্রমোশন পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিলেও সেখানে হাতে কলমে লিখিয়া পরীক্ষা দিতে হয় না। সকল পরীক্ষাই মৌখিক। ছাপান প্রশ্নপত্রও নাই, পরীক্ষার ফিসও নাই। জাপানী ছাত্রগণ পরীক্ষায় কম নম্বর পাইলে অথবা অকৃতকার্য্য হইলে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। ছাত্রগণকে কড়া শাসন করিলে তাহারা ধর্ম্ম-ঘট করিয়া বসে। জাপানে শাসনশৃঙ্খলা রক্ষা করা বড়ই দুষ্কর।

রাজ-বিধি অনুসারে জাপানের ছোট-বড় সকলকেই ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়। ভারতে কিন্তু এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। জাপানে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স আছে। আমাদের দেশে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ

করিবার সময় বয়সের কড়াকড়ি আছে কিন্তু বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার কালে বয়সের কোন বিশেষ বিধান নাই।

জাপানী শিক্ষার আর একটি সুবিধা—সকল বিষয়ই মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতে বিজাতীয় ভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। সম্প্রতি অনেক আবেদন-আন্দোলনের ফলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য হইয়াছে। বিদেশীর ভাষায় সকল বিষয় শিখিতে হইলে বিদেশী ভাষাটিকে ভালরূপে আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কেবল বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে করিতেই ভারতীয় ছাত্রগণের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় চলিয়া যায়। পরে স্বাস্থ্য ও বলবীর্য্যের অভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা অনেক সময় তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে না। কেবল বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে বিদ্যা আয়ত্ত করিলে ভাবপ্রবণ যুবকহৃদয়ে স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া ওঠে। দেশাত্মবোধের তীব্র অনুভূতি যেন বৈদেশিক কৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

পুতুল খেলা

শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

গজ্‌নীর হাটে এবার রথের দিনে
আমার ছেলের ছোট মেয়ে নিজে গিয়ে,
একটি মোমের পুতুল এনেছে কিনে
এক টাকা আর সতেরো পয়সা দিয়ে ;
মহা আনন্দে তার সাথে করি খেলা
কেটে যায় তার সারা বরষার বেলা,
আহারের কথা আজ আর মনে নাই
খালি ঘুরে' ফেরে পুতুলটি বুকে নিয়ে।

বহু পুরাতন সামিয়ানাখানি ছিঁড়ে
পুতুলের ধুতি করেছে সে তৈয়ার ;
গায়ের চাদর করেছে পুরাণো চীরে
নয়নে মাখায় কাজল বারংবার।
শুধালে তাহারে বলে : এটা মোর খোকা,
পরম আদরে গালে দেয় মৃদু টোকা,
চুমো খেয়ে বলে, ঘুমো তুই সোনামণি,
গুন্ গুন্ গান গায় ঘুম-পাড়াবার॥

আমি বসি আজ জীবনের পথ-মাঝে
চেয়ে চেয়ে দেখি মহা বিস্ময় মানি,
কী যে অপরূপ স্নেহময়ী রূপে রাজে
মোমের খোকার মায়ের মূরতিখানি!
চেয়ে চেয়ে দেখি, কত সুখ-সমাদরে
খোকাটিরে তার দোলায় বক্ষে ক'রে
কানে কানে তার অফুরান মমতায়
শুনায় কত না স্নেহের প্রলাপ-বাণী॥

মায়ের জাতি যে—হোক্ না বয়স কম,
আছে বুকভরা স্নেহের পীযূষ-ধার ;
আছে প্রেম, আছে ভালবাসা মনোরম,
আছে মায়া, আছে মমতার পারাবার।
মায়ের জাতির মা না হওয়া বড় লাজ,
তাই সযতনে চাপিয়া বক্ষ-মাঝ
রাখিয়াছে ধরে মোমের পুতুলটিকে,
ওরি মাঝে দেখে স্বপন কোন্ খোকার॥

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅবনীনাথ রায়

আজকাল আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন যে, বাঙালীরা বিদেশে পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্মান পাইতেছেন না। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা প্রবাসে যেরকম প্রতিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা লাভ করিয়া গিয়াছেন আজকাল তাহা দুষ্প্রাপ্য। কথাটা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কোন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি-না জানিতে পারি নাই। আমার ধারণা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ যে চরিত্রবলের প্রভাবে এই অযাচিত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহার একান্ত অভাব হইয়াছে। First deserve, then desire—এই নীতি ক্ষেত্রে পুরাপুরিভাবে খাটে।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এই চরিত্রবলের জলন্ত দৃষ্টান্ত পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যের কিছু পরিচয় দিব। তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা এবং পণ্ডিত বলদেবরাম দাভের কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। যুক্তপ্রদেশের হিন্দুস্থানী মহলে তিনি কিরূপ সম্মানের সহিত পূজিত হইয়াছেন এই মন্তব্যের অংশ হইতে তাহা বোঝা যাইবে। মদনমোহন মালবীয়ের নাম ভারতবর্ষে বিখ্যাত। তাঁহার পরিচয়ের প্রয়োজন করে না। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝার নামও অনেকে শুনিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। পণ্ডিত বলদেবরাম দাভে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্যতম জজ স্যর সুন্দরলালের ভ্রাতা, কৃতী উকীল এবং এলাহাবাদ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় লিখিয়াছেন, "পণ্ডিতজী (আদিত্যরাম) বাল্যাবস্থা সে হি বলিষ্ঠ, তেজস্বী অউর উদ্যমশীল থে। ছাত্রাবস্থা সে প্রৌঢ়াবস্থা-তক বরাবর ব্যায়াম করতে রহে। বাদাম কা সেবন উন্ হোনে নিয়মপূর্ব্বক আজন্ম কিয়া। গৃহস্থী মে রহকর ভী ওয়ে ব্রহ্মচর্য্য কা পালন করতে থে। উন্‌কে ওজপূর্ণ নেত্র উনকে নাম কো সার্থক করতে থে। ওয়ে সত্যভাষী অউর স্পষ্টবক্তা থে। ঘুমাফিরাকর বাতেঁ করনা নহি জানতে থে। পরন্তু ব্যক্তিগত ভাব্‌সে ন তো কিসিকা প্রতিবাদ করতে থে অউর ন কটুবচন কহকর কিসিকো দুখী করতে থে। ওয়ে পরমার্থ সাধন মে নিয়মপূর্ব্বক লগে রহতে থে। অপনে জীবন কী নিত্যচর্য্যা মে ওয়ে ইয়ে বাত দিখ্‌লা গয়ে হেঁ কি অপনী গৃহস্থী কা কাম, জনতা কা কাম অউর পরমার্থিক কাম, ইন্ সভী কি তরফ ধ্যান রাখ্‌কর অউর ইনকা সামঞ্জস্য কর মনুষ্য কো কিস্ তরহ্ কর্ম্মশীল হোনা চাহিয়ে। বস্তুতঃ ওয়ে এক গৃহস্থ-যোগী থে।"

ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা লিখিয়াছেন, "ইস্‌কে রচয়িতা থে এক এইসে মহাপুরুষ জো মেরে শ্রদ্ধেয় পূজনীয় চিরস্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যজী কে শ্রদ্ধাপাত্র হুয়ে।"

পণ্ডিত বলদেবরাম দাভে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত আদিত্যরামজী স্বয়ং ভগবানকে ভক্ত অউর ভক্তজনো কে প্রেমী থে।"

উপরের উদ্ধৃত হিন্দী এত প্রাঞ্জল যে তাহার বাংলা অনুবাদ দেওয়ার প্রয়োজন হইল না।

আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য ইংরেজী ১৮৪৭ সালের ২৩এ নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণা জেলায় রাজপুর গ্রামে তাঁহাদের নিবাস ছিল। ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। আদিত্যরামের গোত্র ছিল ঘৃতকৌষিক, ইঁহারা শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত কণ্বশাখা। আদিত্যরামের মতামহের নাম পণ্ডিত রাজীবলোচন ন্যায়ভূষণ। ইনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিত কাশীরাম বাচস্পতির পৌত্র। রাজীবলোচনের বাড়ী ছিল বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর গ্রামে। একমাত্র পুত্র যুবাবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পর সেই শোকে মুহ্যমান হইয়া রাজীবলোচন সপরিবারে বাংলাদেশ ছাড়িয়া কাশী চলিয়া

যান। কাশীতে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে কাশীতেও মন না টেঁকায় তিনি শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিবেন মনস্থ করিয়া কাশী ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে কয়েক দিনের জন্য প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে যাহার ফলে তাঁহার প্রয়াগে বসবাস চিরস্থায়ী হইয়া যায়।

এই সময় রেওয়ার রাজা ছিলেন মহারাজা জয়সিংহজু দেব। তিনি প্রতি বৎসর মকর-স্নান উপলক্ষে মাঘ মাসে যমুনার দক্ষিণ তীরে মাসাধিক কাল কল্পবাস করিতেন। রেওয়া রাজ্যের পরিধি তৎকালে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একদিন স্নানের পর রাজীবলোচন নদীতীরে পূজা আহ্নিক এবং স্তোত্রপাঠ করিতেছিলেন। মহারাজা জয়সিংহ তাহা দেখিতে পান এবং রাজীবলোচনের ভক্তিভাব দেখিয়া মুগ্ধ হন। পরিচয় গ্রহণান্তর মহারাজা জয়সিংহ রাজীবলোচনকে বৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প হইতে নিরস্ত করেন এবং তাঁহার বসবাসের জন্য এলাহাবাদে কীডগঞ্জে একটি ছোট বাড়ী কিনিয়া দেন। আর তাঁহার চরণ পূজার বৃত্তি স্বরূপ নিজরাজ্যের একটি গ্রাম দান করেন। ইহা সংবৎ ১৮৯১-এর কথা।

ত্রিবেণীর জলে জপ করিতে করিতে রাজীবলোচনের দেহান্ত হয়। আদিত্যরামের পিতার নাম ছিল পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য। রাজীবলোচনের কন্যার সঙ্গে রামকমলের বিবাহও এক আশ্চর্য্যভাবে সংঘটিত হয়। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া রামকমল তাঁহার পিতৃব্যের সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে আসিয়া পণ্ডিত রাজীবলোচনের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। রাজীবলোচনের এক কন্যা ছিল, তাঁর নাম ধন্যগোপী দেবী। রাজীবলোচন কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক সংস্কৃত শাস্ত্রে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুলশীল ইত্যাদি মিলিয়া যাওয়ায় রাজীবলোচন দৈব-প্রেরিত রামকমলের সহিত স্বীয় পুত্রীর বিবাহ দেন। রামকমলের তিন পুত্র—বেণীমাধব, ঘনশ্যাম এবং আদিত্যরাম। ইঁহাদের মধ্যে দুই পুত্র এলাহাবাদেই থাকিয়া যান—মধ্যম ঘনশ্যাম বাংলা দেশে বাস করিতে আসেন।

ধন্যগোপী দেবী তাঁহার পিতার কাছে যথেষ্ট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সূতিকাগারেই তিনি আদিত্যরামের জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই জন্মকুণ্ডলী অদ্যাবধি সুরক্ষিত আছে। ধন্যগোপী দেবী এত দানশীলা ছিলেন যে তিনি অনেকবার নিজের গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দান করিয়াছেন। শোনা যায় যে যখন আদিত্যরাম গর্ভে ছিলেন তখন ধন্যগোপী স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর গর্ভে এক বিশিষ্ট পুরুষ আসিয়াছেন। বাংলা দেশে ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে ধন্যগোপী দেবীর মৃত্যু হয়।

বেণীমাধব প্রয়াগে সরকারী কর্ম্ম করিতেন। তৎকালে এলাহাবাদে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা না থাকায় আদিত্যরামকে ইংরেজী এবং সংস্কৃত পড়িবার জন্য তিনি কাশী পাঠান। কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, পণ্ডিত বেচনরাম ত্রিপাঠী এবং পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কারের নিকট তিনি সংস্কৃত পড়েন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আদিত্যরাম কাশীর সরকারী স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ সাহেব (R. T. H. Griffiths) খুব বিদ্বান এবং সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। গ্রিফিথ সাহেব বেদ, বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ এবং আরও অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। গ্রিফিথ সাহেবের দুইজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন—একজন পণ্ডিত লক্ষ্মীশঙ্কর মিশ্র, আর একজন আদিত্যরাম। কাশী হইতে বি-এ পাশ করিবার পর আদিত্যরাম স্থির করেন যে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়িবেন। কারণ তাহা হইলে তিনি গ্রিফিথ সাহেবের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইতে পারিবেন। কিন্তু গ্রিফিথ সাহেব নিজেই তাঁহাকে সংস্কৃতে এম-এ পড়িবার জন্য আদেশ করিলেন। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত এদিকে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। আগ্রা পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীমা ছিল। সেই কারণে আদিত্যরাম কলিকাতা আসিয়া এক বৎসর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া এম-এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় আদিত্যরাম অনেক বৃত্তি, সুবর্ণপদক এবং পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার পড়ার জন্য পৃথক ব্যয় লাগিত না। এই সময়

জন্ম—১৮৪৭ খৃঃ—২৩শে নভেম্বর মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মৃত্যু—১৯২১ খৃঃ—১৮ই অক্টোবর

COLOURED ILLUSTRATION

বিশ বৎসর বয়সে কাঁঠালপাড়ায় তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রীর নাম শ্যামাঙ্গিনী দেবী।

এম-এ পাশ করিবার পরই গ্রিফিথ সাহেবের চেষ্টায় আদিত্যরাম সাগর কলেজে (মধ্যপ্রদেশ) সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানে ৩।৪ মাসের বেশি থাকিতে হয় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গ্রিফিথ সাহেব যুক্ত-প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Public Instruction) হইয়া আসেন। ঐ সময় "মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ" নাম দিয়া এলাহাবাদে সরকারী কলেজ স্থাপিত হয়। গ্রিফিথ সাহেব সাগর হইতে আদিত্যরামকে ডাকিয়া পাঠাইয়া উক্ত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কাশীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে আড়াই বৎসর কাল আদিত্যরাম ইংরেজীর অধ্যাপকতা করেন। তৎকালে ঐ পদ ইংরেজদের জন্য সুরক্ষিত ছিল। আদিত্যরামের পর ঐ পদে থিবো সাহেব (G. Thibeaut) নিযুক্ত হন। তখন আদিত্যরাম পুনরায় এলাহাবাদে তাঁহার পুরানো পদে ফিরিয়া আসেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যথেষ্ট সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এম-এ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃতের পরীক্ষক হইতেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ এবং স্পষ্টবক্তা ছিলেন। সেই কারণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ৫৫ বৎসর বয়সে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন এক সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। উক্ত সভায় যুক্তপ্রদেশের তৎকালীন গবর্ণর, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার, মিওর কলেজের অধ্যক্ষ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকবর্গ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

হিন্দি ভাষা এবং হিন্দি সাহিত্যের প্রতি আদিত্যরামের বিশেষ অনুরাগ ছিল। এ সময়ে হিন্দি ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকা ছিল না। তাঁহার সময়েই ইণ্ডিয়ান প্রেস "সরস্বতী" নামক হিন্দি মাসিকপত্র বাহির করেন। তিনি কাশী নাগ্‌রী প্রচারিণী সভার সদস্য এবং শুভার্থী ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে আদিত্যরামের অচল প্রতিষ্ঠা ছিল। ছাত্রদের পক্ষ হইয়া তিনি অনেকবার কর্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়া করিয়াছেন। ইংরেজী সংবাদপত্রে তিনি মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তখনকার দিনে দেশভক্তি, দেশসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কেহ উচ্চবাচ্য করিত না। আদিত্যরাম কিছুকাল অস্থায়ীভাবে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান (Indian Union) পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। দেশী জিনিষ ব্যবহার করা সম্বন্ধে তিনি খুব একনিষ্ঠ ছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার যে তখনও বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই। আদিত্যরামের চেষ্টায় এবং উৎসাহে এলাহাবাদে "হিন্দুসমাজ" স্থাপিত হয়। তাঁহার উৎসাহ পাইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ঐ সমাজের সদস্য হইয়াছিলেন। ঐ সময় পণ্ডিত মদনমোহন এলাহাবাদ মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। আদিত্যরাম মদনমোহনকে খুব স্নেহ করিতেন। মদনমোহন লিখিয়াছেন যে, তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির বীজ আদিত্যরাম বপন করিয়াছিলেন।

ছাত্রাবস্থাতেই যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে সেই উদ্দেশ্যে মিসেস য়্যানি বেশান্ত, বাবু গোবিন্দদাস, ডক্টর ভগবানদাস, উপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের কথা। পণ্ডিত আদিত্যরাম এই কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যোগীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাহার পর কলেজের পরিচালক-মণ্ডলী যখন স্থির করিলেন যে এই কলেজের অধ্যক্ষতা একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হিন্দু বিদ্বান ব্যক্তির উপর অর্পিত হউক, তখন আদিত্যরামের ডাক পড়িল। পণ্ডিত আদিত্যরাম সরকারী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার অধ্যক্ষতা করিলেন। তাহার পর যখন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প হইল তখন আদিত্যরামের মনের বল যেন দ্বিগুণ হইয়া গেল। তখন আদিত্যরামের বয়স ৭১ বৎসর। কিন্তু ঐ বৃদ্ধবয়সেও তিনি এক নবীন আদর্শ স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদিত্যরাম কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্‌চান্সেলারের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইলেন এবং প্রয়াগে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর তিনি আর তিন বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই তিন বৎসর তিনি আর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। নিজের বাড়ীর সংলগ্ন

একটি সংস্কৃত পাঠশালা করাইয়াছিলেন, সেখানেই তিনি থাকিতেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়া আদিত্যরামকে সম্মানিত করেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর আদিত্যরাম দুইটি বড় বড় পারিবারিক শোক পান। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ঘনশ্যাম বাংলাদেশে মারা যান এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যবান ভট্টাচার্য্য মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এত মর্ম্মান্তিক বেদনার ফলেও আদিত্যরামকে অশ্রুপাত করিতে দেখা যায় নাই বা তাঁহার নিয়মিত কর্ম্মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁহার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যাইত এবং ছয়মাসের মধ্যে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ চুলের অর্দ্ধেক শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

যতদিন শরীরে বল ছিল, সন্ধ্যার সময় আদিত্যরাম ত্রিবেণী যাইতেন। রাত্রি তিনটার সময় উঠিতেন, পূজা-পাঠ করিতেন এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টোত্তর শতনাম জপ করিয়া সূর্য্যদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। আদিত্যরামের সঙ্গে একটি ঘটিতে সর্ব্বদা গঙ্গাজল থাকিত। যেখানেই সূর্য্যাস্ত হইত সেখানে জুতা খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গঙ্গাজলে সূর্য্যার্ঘ্য দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি মিটিং-এ কাজ করিতে করিতেও এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মকেই তিনি সমান সমাদর করিতেন। এলাহাবাদে দারাগঞ্জ মহল্লায় দশাশ্বমেধের নিকট তাঁহার বাসস্থান ছিল। এখানকার বাড়িখানি তিনি ১৮৭৯ সালে খরিদ করেন। যখন ঐ জায়গায় কোন বাড়ি তৈয়ার হয় নাই তখন শিবশর্ম্মা নামক একজন নেপালী সাধু কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ঐখানে থাকিতেন। ঈশ্বরের এমন লীলা যে, ঐ সাধু শিবশর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত "বাসুদেবরসানন্দ" নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ এক নিলামে পুরাতন গ্রন্থ ক্রয় করিবার ফলে আদিত্যরামেরই হস্তগত হয়। এই কারণে আদিত্যরাম নিজব্যয়ে এলাহাবাদে যে সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম "শিবশর্ম্মা সংস্কৃত পাঠশালা" দিয়াছেন। সাধু শিবশর্ম্মার নাম জাগ্রত রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য। "বাসুদেবরসানন্দ" নামক অমূল্য ধর্ম্মপুস্তক আদিত্যরামের সুযোগ্য পুত্র সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য টীকা-সহিত সুন্দরভাবে পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। আদিত্যরাম নিজের উপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়া গিয়াছেন। ঐ সংস্কৃত পাঠশালায় পড়িয়া কাশী সংস্কৃত কলেজে আচার্য্য পরীক্ষা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। ঐ পাঠশালা সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস আছে, যেখানে বিদ্যার্থীগণ বিনামূল্যে থাকিতে এবং খাইতে পায়। ঐ সংস্কৃত পাঠশালায় আদিত্যরাম নিজের মাতৃদেবীর নামে "ধন্যগোপী পুস্তকালয়" স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলের সমস্ত সংস্কৃত বই, হাতে লেখা পুঁথি প্রভৃতি ঐ পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। পাঠশালা, ছাত্রাবাস, লাইব্রেরি প্রভৃতির ব্যয় হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় আদিত্যরামের উক্ত গচ্ছিত অর্থ হইতে নির্ব্বাহ করেন।

১৯২১ সালে ১৮ই অক্টোবর ৭৪ বৎসর বয়সে আদিত্যরামের দেহান্ত হয়। মৃত্যুর দুই তিন মাস পূর্ব্বে রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইত না। তাহার জন্য বলিয়াছিলেন যে ভালই হইয়াছে, নিদ্রা দ্বারা আগার আর অপচয় হয় না। মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত সায়ংকালে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়াছিলেন এবং হোম করিয়াছিলেন। অধিক রাত্রে শরীর যায় যায় হইল, সময় কত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাত্রি তখন তিনটা বাজিয়াছিল। শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। মনে করিলেন রাক্ষসী সময়টা পার হইয়া যাইত, রাত্রে না মৃত্যু হয়। রাত্রি প্রভাত হইল, পূর্ব্বগগন রক্তিম আভা ছাইয়া গেল, ঠিক সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে পুণ্যশ্লোক আদিত্যরাম মনুষ্যজীবন সমাপ্ত করিলেন।

আদিত্যরামের একমাত্র পুত্র সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য এলাহাবাদে দারাগঞ্জে পৈত্রিক বাড়িতে বাস করেন। তিনি ইতিহাসশাস্ত্রে এম-এ পাশ করিবার পর অনেক বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন। বিপত্নীক হওয়ার পর আর তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার সন্তানাদি নাই। ইঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যাহা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একবার বলিয়াছিলেন, 'আপনাকে দেখিলে সত্যযুগের কথা মনে পড়ে।'

পণ্ডিত আদিত্যরাম আজ নাই, তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি আছে। আমি কেবল আশ্চর্য্য হইয়া এই কথাই ভাবিতেছি যে আদিত্যরামের স্বদেশপ্রীতি এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ভিত্তি কত সুদৃঢ় ছিল যাহাকে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর শত প্রলোভন এবং সুবিধাবাদও বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে নাই।

রতনের দিদি

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

খিড়কির পুকুর হইতে স্নান সারিয়া মালতী সবেমাত্র উনানে আগুন দিয়াছে, এমন সময় রতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। হঠাৎ ধাক্কার টাল সামলাইয়া মালতী রতনকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে রতন, কি ক'রে এলি? সঙ্গে কেউ এসেছে নাকি?"

রতন তখনও হাঁপাইতেছিল। দীর্ঘ পথ ছুটিয়া আসিয়া মুখখানা তাহার লাল হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কাদা মাখানো, হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি। দিদির পিঠে মুখ গুঁজিয়া সে বলিল, "দিদি, আমি আর ওদের ওখানে যাবো না। তোমার কাছেই থাকবো দিদি।"

তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া মালতী বলিল, "বেশ, তাই থাকবি এখন। তোকে আর যেতে হবে না। কিন্তু কার সঙ্গে এলি?"

আনন্দের আতিশয্যে মন তাহার নাচিয়া উঠিল। দিদির শেষের প্রশ্নটা না শুনিয়াই বলিল, "সত্যি বলবো? আমাকে আর ওখানে যেতে দেবে না? ওরা আমাকে ভয়ানক মারে। ঐ দেখো না, আজকে আমাকে বেত দিয়ে কি রকম মেরেছে।" বলিয়া পিঠের দাগ দেখাইল। ফর্সা পিঠের উপর বেতের দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। মালতীর চোখে জল আসিল। পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কে মেরেছে রে রতন? কি করেছিলি? মারামারি করেছিলি বোধ হয়।"

"মারামারি করবো কেন, বুড়ী আমার হাত থেকে পেয়ারাটা কেড়ে নিয়েছিল বলে মেরেছিলাম এক ধাক্কা। ছিঁচকাঁদুনী কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে জ্যাঠাইমার কাছে নালিশ কল্লে। জ্যাঠাইমা অম্নি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শপাং শপাং করে পাঁচ-ছ ঘা বেত বসিয়ে দিয়ে বল্লে—পড়তে যাসনি কেন?"

মা হইয়া এতটুকু ছেলের পিঠে যে কেমন করিয়া মানুষ বেত মারিতে পারে মালতী ভাবিয়া পাইল না। সস্নেহকণ্ঠে রতনকে বলিল, "তা তুই স্কুলে যাসনি কেন?"

"আমার ভালো লাগে না। বইগুলো আমার মোটেই মুখস্ত হয় না, পড়া বলতে না পাল্লে তোমাদের ঐ খেতু পণ্ডিত এম্নি মার দেয় যে স্কুলে যেতে ভয় করে। তার চেয়ে আমি তোমার কাছে পড়বো।"

"বেশ, তাই হবে। আচ্ছা, তুই এতখানি পথ এলি কি ক'রে!"

রতন তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। দিদির কোল হইতে নামিয়া সে তাহার বীরত্বের কাহিনী বলিতে লাগিল। সে যে এখন আর ছোট নয়, তাহার যে দিনের বেলায় কিছুতে ভয় নাই, এমন কি ঘোষেদের ভূতুড়ে বাড়ীটার পাশ দিয়াও সে একলা ছুটিয়া যাইতে পারে—সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করিল। জ্যাঠাইমার কাছে মার খাইয়া কাঁদিবার সময় বুড়ী মুখ ভ্যাঙচাইলে কেমন করিয়া তাহার পিঠে কঞ্চির বাড়ি বসাইয়া দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা বলিতে ত্রুটি করিল না। এতটুকু মেয়ে হইয়া সে নাকি রতনকে মুখ ভ্যাঙচাইবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা! তার শাস্তি সে দিয়া আসিয়াছে। তারপর এই দীর্ঘ চারি ক্রোশ পথ প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই সে আসিয়াছে। পালেদের বস্তীটার কাছ দিয়া আসিবার সময় একবার পড়িয়া গিয়াছিল মাত্র, তাহাতে লাগে নাই। পথে আসিবার সময় কেবলই মনে হইয়াছে জ্যাঠাইমা বুঝি ধরিয়া লইয়া গিয়া বেত মারিবে। কেষ্টপুরের মোড়ে আসিয়া যখন সে রাস্তা ঠিক করিতে পারিতেছিল না তখন পার্ব্বতীপুরেরই একটা বুড়ো-মত লোক যে তাহাকে সঙ্গে করিয়া পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, রতন দিদিকে সে কথাও বলিল। আবার এ কথাও জানাইয়া দিল যে, ও বুড়ো লোকটা রাস্তা না দেখাইলেও যে সে এখানে আসিতে পারিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মালতী অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল।

TIGHT BINDING

বীরত্বের কাহিনী শেষ হইলে উনানে ডাল চড়াইয়া দিয়া সে রতনকে জিজ্ঞাসা করিল, "সকালে কি খেয়েছিলি রতন ?"

"বা রে, খেলাম আবার কখন! মুড়ি খেতে বসেই তো বুড়ী আমার হাত থেকে পেয়ারাটা কেড়ে নিলে। আমিও দিলাম এক ধাক্কা। আমার সঙ্গে পারবে ঐ পুঁটকে বুড়ী। আবার বলে কি-না মার খাওয়াবো।"

এই দুর্দ্দান্ত ভাইটির পানে সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া মালতী তাহার সকল ব্যথা মুছিয়া দিতে চাহিল। রতনকে স্নানের ঘাটে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া গা মুছাইয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল।

নাহিয়া আসিয়া রতন মুড়ি খাইতে বসিয়াছে। আজ আর তাহার আনন্দ ধরিতেছিল না। আজ সে এমন এক জায়গায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যেখানে স্নেহ আছে তিরস্কার নাই, ভালোবাসা আছে মার খাইবার ভয় নাই। তাহার সমস্ত মুখ এক অনাস্বাদিত আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। এত আদর সে কোনদিন পায় নাই।

রান্নাঘর হইতে মালতী তাহার এই পিতৃমাতৃহীন ভাইটিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। আর সেই সঙ্গে নিজ মাতার নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

রাধাবল্লভপুরের বিশু পাগলার বৌ যেদিন একমাত্র পুত্র রতনকে রাখিয়া মারা গেল সেদিন হইতে তাহার দেখাশুনার ভার পড়িল বিশুর বড় ভাই শম্ভুনাথ ও তাহার স্ত্রী সরলার উপর। রতনের বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর। সরলা নিজের কচি-কাচা লইয়া ব্যস্ত থাকিত বলিয়া কন্যা মালতীই তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল।

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর নারী আছে—মাতা ও প্রিয়া—সঙ্গিনী ও স্নেহময়ী। ছেলেবেলা হইতেই মালতী স্নেহময়ী, মাতার মত স্নেহ দিয়াই সে সকলকে ভালবাসে। তাই কিশোরী মালতীর হাতে রতনের অযত্ন হইল না। মাতার স্নেহ দিয়া সে এই ক্ষুদ্র শিশুটিকে ঘিরিয়া রাখিল। মাতা ইহা দু চক্ষে দেখিতে পারিত না। মালতীকে সে প্রায়ই শাসন করিত, "আহা ছুঁড়ীর রকম দেখ। যেন পাকাবুড়ী! পরের ছেলেকে নিয়ে এত আদর মাখামাখি কেন? নিজের ভাইবোনেদের দিকে ত ফিরেও চাও না।" উত্তরে মালতী বলিত, "ওর যে কেউ নেই মা।" সরলা আরও জ্বলিয়া উঠিত, "আহা দয়াময়ী গো!" বলিয়া অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইত।

মালতী মাতার স্বভাব জানিত, কিছু বলিত না। বয়সের তুলনায় মালতীর বুদ্ধি বেশী। কাকীর কথা তাহার প্রায়ই মনে পড়ে। ভালোমানুষ কাকীকে তাহার পিতামাতা নির্য্যাতনে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, স্মরণ করিয়া তাহার চোখে জল আসিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাকা বিশ্বনাথ পাগল হইয়া গেলে কাকীমার অক্লান্ত সেবা আজও তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। পল্লীগ্রামের গরীবের সংসার, উপার্জ্জনের মানুষ যে, তাহারই এই অসুখ। এমন অবস্থাতেও বড় ভাই হইয়া তাহার বাপ-মা যে কি করিয়া নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়াছিল, একটি দিনের তরেও কিছু সাহায্য করে নাই, তাহা মনে করিয়া মালতী পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিত। তথাপি কাকীমার মুখে সে কোন দিন অভিযোগ শুনে নাই। ত্রিসংসারে আপনার বলিতে তাহার কেহ ছিল না। নিজের সাধ্যানুসারে স্বামীর চিকিৎসা সে করাইতে লাগিল। কিন্তু পাগলা বিশু যেদিন নিষ্ঠুর উন্মাদনায় গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল সেই দিন হইতে শরীর তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িল। একান্ত স্নেহের রতনের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সে স্বামীর অনুসরণ করিল।

সরলা যে রতনকে দেখিতে পারিত না তার আরও একটা কারণ ছিল। সে আশা করিয়াছিল বিশ্বনাথ ও রতনের মায়ের মৃত্যুর পর সম্পত্তিটা তাহাদেরই হইবে। দু বছরের শিশু রতন যে বেশী দিন ইহজগতে থাকিতে পারিবে না এইরূপ একটা আশা সে অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিল।

মালতীর আদরযত্নে রতনকে দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে দেখিয়া সে হিংসায় ছটফট করিতেছিল। এইজন্য মালতীও তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল। মালতীর নামে স্বামীর কাছে প্রায়ই অভিযোগ চলিতে লাগিল, "ধিঙ্গি মেয়ে নিজের ভাবেই বিভোর হয়ে আছেন। সংসারের কুটোটি নাড়েন না। কোথাকার কে একটা একরত্তি ছেলে তাকে নিয়েই দিন রাত্তির সোহাগ। আমার এত জ্বা

লাগে না বাপু! ও মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। বড় হয়েছে আর রাখা ভালো দেখায় না।"

কথাটা সত্যি। মালতী বড় হইয়াছিল। বয়স তাহার পনেরো হইলে কী হয়, বাড়ন্ত গড়নের জন্য তাহাকে আরও বড় দেখাইত। তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে পনেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে রাখা যায় না। তবে কি-না তাহারা রামাইৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। সংখ্যায় কম বলিয়া একটু বেশী বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত।

শম্ভুনাথ মালতীর জন্য পাত্র দেখিতে লাগিল। পার্ব্বতীপুরের বিনোদ দাসের ছেলে অভয়ের সঙ্গে মালতীর বিবাহ হইয়া গেল। অভয় ছেলে ভালো। গ্রামের জমিদার বাড়ীতে মুহুরীর কাজ করে, জমিজমাও কিছু আছে। সংসারে—বৃদ্ধা মা আর পাঁচ-ছয় বছরের একটি ছোট বোন। মালতী দেখিতে সুন্দরী না হইলেও কুৎসিত নহে। শ্যামবর্ণ দেহলতাতে তার যৌবনের জয়-শ্রী, কৃশতনু ঘিরিয়া নামিয়াছে জোয়ার, স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে মাতৃত্বমাখা। এ মুখ না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। অভয় মালতীকে ভালোবাসিল। মালতীও অল্পকাল মধ্যেই স্বামী ও শাশুড়ীকে আপন করিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে ছয়টি বৎসর অতীত হইল। স্বামীর সংসারে মালতী যে স্থান অধিকার করিল তাহার তুলনা হয় না। সেবা, যত্ন ও স্নেহ দিয়া শাশুড়ী, স্বামী ও ছোট্ট ননদীটিকে সে এমনি বশীভূত করিল যে, মালতী না হইলে কাহারও একদণ্ড চলে না।

অভয় বলে, "কি অপূর্ব্ব তুমি, মালতী! তুমি না এলে আমাদের চলতো কি ক'রে ভাবতে পারি না।" শাশুড়ী বলেন, "মালতী, আর জন্মে তুমি আমার মা ছিলে। তা নইলে বুড়ো মেয়ের এত আদর যত্ন কে আর কত্তে পারে।" ননদী রাণু বলে, "বৌদি, তুমি খুব ভালো মেয়ে। আচ্ছা বৌদি, রতনকে তুমি খুব ভালবাস, না?" সকলের উত্তরে মালতী হাসে, গর্ব্বে তাহার বুক ভরিয়া যায়। তবু মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা তাহার খালি মনে হয়। রতনকে কাছে পাইবার জন্য মন তাহার ব্যাকুল হইয়া ওঠে। বিবাহের পর দু-একবার সে বাপের বাড়ী গিয়াছে বটে, কিন্তু দুই-তিন দিনের বেশী থাকিতে পারে নাই। তাহার অভাবে অভয়ের সংসার অচল হইয়া পড়ে।

সুযোগ পাইলেই মালতী অভয়কে বলিয়া রতনকে আনাইত। দিদির গৃহে আসিয়া রতন যে আনন্দ পাইত তাহার তুলনায় দৌরাত্ম্য করিত ঢের বেশী। মালতী তাই বেশী দিন তাহাকে এখানে রাখিতে সাহস করিত না, নিজেই আবার পাঠাইয়া দিত। ইহা লইয়া কোন দিন কোন কথা ওঠে নাই; উঠিলে যে অপমান তাহা মালতীর মত মেয়ে সহ্য করিতে পারে না।

কিছু দিন হইতে রতনকে পার্ব্বতীপুরে আনানোও বন্ধ হইয়াছে। অভয় একদিন রতনকে আনিতে গেলে সরলা তাহাকে যে ভাষায় আপ্যায়িত করিয়াছিল তাহা জামাতার প্রতি প্রযোজ্য নহে। অভয়কে সেদিন শুষ্কমুখে একলা ফিরিতে দেখিয়া মালতী কিছু একটা ঘটিয়াছে অনুমান করিয়াছিল। পরে অভয়ের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মন তাহার ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইল। স্ত্রী হইয়া স্বামীকে সে অপমানিত হইতে দিয়াছে। মাকে তো সে ভাল করিয়াই চিনে, তবুও কেন সে স্বামীকে সেখানে পাঠাইয়াছিল? এখন হইতে সে স্থির করিল যে রতনের কথা সে ভাবিবে না। এই সঙ্কল্পের কয়েক দিন পরেই রতন পার্ব্বতীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়াছে। অভয়কে আজ কাছারী যাইতে হইবে না। বড় ঘরের রোয়াকে বসিয়া সে তামাক টানিতেছিল। রতন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, রাণু খিড়কির পুকুরে ডুবে গেছে। আমি তুলতে পাচ্ছি না। আসুন না একবার।"

তামাক টানা বন্ধ করিয়া অভয় বলিয়া উঠিল, "ডুবে গেছে কি-রে! তুই বুঝি ডুবিয়ে দিয়েছিস। পাজী ছোকরা, আজ আর তোমায় আস্ত রাখবো না।"

মালতী রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল, অভয়ের উদ্দেশে বলিল, "আস্ত না হয় না রাখলে কিন্তু মেয়েটাকে তো আগে বাঁচাতে হবে। যাবে না আমাকে যেতে হবে বল।"

"এই যে যাচ্ছি!" বলিয়া অভয় তাড়াতাড়ি গিয়া দেখে একগলা জলে রাণু হাবুডুবু খাইতেছে। চুলের মুঠি ধরিয়া অভয় তাহাকে তুলিয়া আনিল। জল খাইয়া তাহার পেট ফুলিয়া গিয়াছে, চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল।

TIGHT BINDING

দাদাকে দেখিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া বলিল, "আমি কিছু করিনি দাদা। রতন আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে বলেছিল। আমি শিখবো না বলেছিলাম বলে আমাকে চড় মেরেছে। তারপর টেনে জলে নামিয়ে দিলে।"

অভয় রতনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ওকে জলে টেনে নিয়ে গেছলি কেন?" ভয়ে রতন কাঁপিতেছিল। দুই চারিটা ঢোঁক গিলিয়া যাহা বলিল তাহাতে কিছু বুঝা গেল না।

মালতীকে অভয় বলিল, "রতনটার কাণ্ড দেখেছ, রাণুকে সাঁতার শেখাবে বলে ডুবিয়ে মেরেছিল আর কি। খিড়কীর পুকুর বলেই রক্ষে। অন্য পুকুর হ'লে দুটোই ডুবে মরত।"

আর কিছু না বলিলেও মালতী বুঝিতে পারিল অভয় রতনের উপর সন্তুষ্ট নয়। রাণুকে অভয় খুব ভালবাসে। তাহার প্রতি রতনের এই অত্যাচার সে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। বরদাস্ত সে নিজেও করে না। কারণে অকারণে যখন তখন রাণুর উপর তাহার মার-হাত উঁচাইয়াই ছিল। এই কয়দিনের মধ্যে তাহার অত্যাচারে বাড়ীর সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাই মালতী আজ মনস্থ করিল লোক দিয়া রতনকে রাধাবল্লভপুরে পাঠাইয়া দিবে।

তুচ্ছ ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া সংসারে এমন সব অঘটন ঘটে যে তাহা যেমন অচিন্তনীয় তেমি অনিষ্টকর। রতনের পার্ব্বতীপুর আগমনকে অবলম্বন করিয়া দুইটি পরিবারে এইরূপ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া মালতী একটু গড়াইয়া লইবে বলিয়া বাহিরের কাজগুলি সারিয়া লইতেছিল, এমন সময় মাতা সরলার আকস্মিক আবির্ভাবে ভিতরটা তাহার কাঁপিয়া উঠিল। মূর্ত্তিমান দুঃস্বপ্নের মত মাতার উপস্থিতি তাহাকে বিচলিত করিল। বিবাদের সঙ্কল্প লইয়াই যে মাতা তাহার এই দ্বিপ্রহরের রোদ অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে মালতী তাহা এক নিমেষেই বুঝিতে পারিল। মাতা যে তাহার কলহনিপুণা মালতী তাহা ভাল করিয়াই জানিত, কিন্তু ঝগড়া করিবার জন্য কোন মেয়ে যে জামাইবাড়ী তাড়া করিয়া আসিতে পারে সে কল্পনা করিতে পারে নাই। তথাপি মাতাকে সে সাদর-সম্ভাষণের ত্রুটি করিল না, তাড়াতাড়ি জল আনিয়া পা ধোয়াইয়া দিতে গেল।

পা ছাড়াইয়া লইয়া ঝাঁঝাল গলায় মাতা বলিল, "আর এত আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। খুব হয়েছে। বলি তোমাদের মতলব খানা কি? এমন শত্রুকেও পেটে ধরেছিলাম! আমাদের সব আশা-ভরসায় ছাই পড়লো।"

মালতী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "কি হয়েছে মা? তুমি এত রাগ করেছ কেন? চল, আমরা ঘরে গিয়ে বসি।"

সরলা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। গলার স্বর আরও একমাত্রা চড়াইয়া বলিল, "আহা, যেন কিছু জানেন না। কি শয়তান তুমি মা। তোমার পেটে পেটে এতও ছিল। কেন আমরা তোমার কি শত্রুতা করেছি। দশমাস দশদিন পেটে ধরেছি, খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করেছি, তারই কি এই পুরস্কার।"

সরলার চীৎকারে অভয় ও তাহার মা ঘরের বাহির হইয়া অবাক হইয়া শুনিতেছিল। রতন ভয়ে ভয়ে দিদির পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল জ্যাঠাইমার হাত হইতে একমাত্র দিদিই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

সরলা সমানে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "লজ্জা করে না মা-বাপের শত্রুতা কত্তে। গলায় দড়ি জোটে না? রতনাকে হাত করে তার সম্পত্তি নেবার ফন্দী করেছ। সরি বোষ্টুমী বেঁচে থাকতে তা হচ্ছে না।"

মালতী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। এইবার রাগে সে জ্বলিয়া উঠিল। একে আজ সকালে রতনের অত্যাচারে মেজাজ তাহার ঠিক ছিল না, তার উপর সেই রতনকেই উপলক্ষ করিয়া মাতার এই বিষ-উদ্গীরণ—তাহার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল। রতনকে টানিয়া মায়ের কাছে দিয়া বলিল, "নাও, মেরে ফেলো গে—যাও।"

এই একটি মাত্র কথাতেই সরলা বোষ্টুমী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ তা তো এখন বলবিই। আমিই তো সবাইকে মেরে ফেলি। বলি, এত বড় হলি কোত্থেকে? আজ কদিন না হয় শ্বশুরবাড়ী হয়েছে।"

কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইল সে তখন আর সেখানে নাই। ঘরের ভিতর মেজেতে শুইয়া

পড়িয়াছে। প্রতিপক্ষকে বিমুখ দেখিয়া সরলাও নিরস্ত হইল। রতনকে হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে রাধাবল্লভপুরের পথে রওনা হইল। অভয় ও তাহার মাতার শত অনুরোধও তাহাকে পার্ব্বতীপুরে রাখিতে পারিল না।

আশ মিটাইয়া ঝগড়া করিতে না পারিয়া সরলার রাগ পড়ে নাই। গৃহে ফিরিয়া রতনের উপর আক্রোশ মিটাইয়া প্রহার করিল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে এতখানি পথ আসিবার পর এই প্রহারের ফলে রতনের জ্বর হইল। অনাদরে জ্বর বাড়িয়াই চলিল, কেহ বিশেষ লক্ষ্য করিল না।

এদিকে কয়েক দিন হইতেই মালতীর শরীরটা ভাল যাইতেছিল না। অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। জ্বর লইয়াও সংসারের সকল কাজই সে করিতে লাগিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে আর শয্যা ত্যাগ করিবার ক্ষমতা রহিল না। জ্বর ক্রমশ বিকারে পরিণত হইল। অভয় জমিদারবাড়ীর মুহুরী। পাড়া গাঁ হইলেও ভাল ডাক্তার আনিল। ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হার্ট খুব দুর্ব্বল। সাত দিন পার না হইলে কিছু বলা যায় না।"

চতুর্থ দিন হইতেই মালতী বিকারে প্রলাপ বকিতেছিল। বার বার সে একই কথা; "ওরা রতনকে মেরে ফেল্লে—না,না, রতনকে মেরো না—ওগো, তুমি ছেলেটাকে নিয়ে এসো না।"

অভয় আশ্বাস দেয়, "আচ্ছা, তুমি ভাল হয়ে ওঠো। আমি রতনকে এনে দেবো। তুমি ভেবো না।"

মালতী ম্লান হাসিয়া বলে, "ছাখো, আমার কি মনে হচ্ছে জানো। আমি আর বাঁচবো না। অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে। ক্ষমা ক'রো। পায়ের ধূলো দাও।"

অভয় বলে, "তুমি বাঁচবে। ও কথা বলো না।"

মালতী করুণ হাসি হাসে।

সাত দিনের দিন। মালতী আজ সারাদিন ভাল আছে। জ্বর তাহার নাই বলিলেই চলে। আজ সে সকলের সঙ্গে কথা বলিল। শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইল, রাণুকে আদর করিল। অভয়ের সহিত বহুক্ষণ গল্প করিল। অভয় ভাবিল, বিপদ বুঝি কাটিয়া গেল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় রোগ হঠাৎ বাঁকিয়া বসিল। মালতী প্রলাপ বকিতে সুরু করিল।

রাত্রি প্রায় বারটা। মালতীর শিয়রে অভয় জাগিয়া বসিয়া আছে। অকস্মাৎ মালতী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "রতন এসেছিস! তোকে আর আমি যেতে দেবো না ভাই। আঃ।" তারপর সমস্ত নীরব। অভয় মালতীকে শোয়াইয়া দিতে গিয়া দেখিল রতনের দিদি কোন্ রতনের সন্ধানে তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে।

সামনের আম গাছটায় তখন একটা পেঁচা ডাকিতেছিল।

পরের দিন যে লোক রাধাবল্লভপুরে সংবাদ দিতে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া সে জানাইল যে গতকল্য রাত্রি বারটার সময় রতন মারা গিয়াছে।

চিত্রা

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

নয়ন কল্পনা করি' যারে প্রতিদিন
আঁকিয়াছে দৃষ্টিপটে চিত্র অতুলন,
অয়ি চিত্রা, কল্পাঙ্গনা, চির অমলিন,
তুমি মোর কল্পনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মনে হয় যেন কত জন্ম জন্ম ধরি'
রচিয়াছি চিত্র তব, ব্যগ্র প্রতীক্ষায়
পথ চাহি' কেটে গেছে কত বিভাবরী
দৃষ্টির প্রদীপ জ্বালি মিলন-আশায়।

আজো কি হ'বেনা সাঙ্গ তুলির লিখন!
তেমনি রহিবে বসি' মায়া-উপবনে
ছলনা-কুসুম রাজি, করিয়া সৃজন
হাসিবে কৌতুকহাসি আপনার মনে?

কল্পনার ধন ওগো মায়াবী প্রেয়সী,
দৃষ্টির অতীত, আছ অন্তর পরশি'।

বাঙ্গলা গদ্যের ইতিহাস

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

বাংলা মুদ্রিত গদ্যের আদি লেখক বহু হইলেও বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তই যে বাংলা গদ্যরীতির স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেন এরকম একটা ধারণা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়া আসিয়াছে। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলিয়াছেন—“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারি উপার্জ্জিত সম্পত্তি লইয়াই আমরা নাড়াচাড়া করিতেছি।” বাংলা গদ্যের যশস্বী লেখক রজনীকান্ত গুপ্তের মতে বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের পিতা না হইলেও মাতা। “দশভূজা প্রতিমার খড়, বাঁশ ও দড়ির উপর সামান্য মাটির কাজ হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর ঐ মাটী যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া এবং মৃত্তিকাময়ী মূর্ত্তি নানা বর্ণে সুরঞ্জিত ও বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া দেবমণ্ডল শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলেন।” হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক হিসাবে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে খ্যাতি নেহাত কম ছিল না। তাঁহার মতে “চলিত বাঙ্গলা সাহিত্য একাধিপত্য লাভ করিবার পূর্ব্বে এবং কাদম্বরীর একরূপ মৌরশীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই—এই দুইয়ের মাঝামাঝি সময়ে নবীন গদ্যসাহিত্য যে অনন্ত জ্যোতি বঙ্গসাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়, সেই জ্যোতি বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় করিয়া দিল। অর্থাৎ খুব চলিত নয়, অথচ খুব সংস্কৃতবহুলও নয়—এ দুইয়ের মাঝামাঝি বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ জ্যোতির অধিবাসী বঙ্গের দুইটি শক্তিশালী মহাত্মা। প্রথম স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।”

রবীন্দ্রনাথের মতও অনেকটা এইরূপ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর বার্ষিকী উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহাতে কবি বলিয়াছিলেন যে—“গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বঙ্গভাষাকে বিদ্যাসাগর পৃথিবীর ভদ্র সভার উপযোগী আর্য্য ভাষারূপে গঠন করিয়া দিয়াছেন।”

উপরে যে মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারই বাংলা গদ্যরীতির স্রষ্টা। এ কথার মানে এই নয় যে, বিদ্যাসাগরের পরবর্ত্তী সকল বাংলা গদ্যের লেখকের স্টাইল বা প্রকাশভঙ্গি অভিন্ন এবং সে ভঙ্গি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাদর্শে লিখিত। গদ্যরীতি এক, প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। প্রকাশভঙ্গির ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ফলে যে গদ্যাদর্শের পরিবর্ত্তন হয়, এ কথা অস্বীকার না করিলেও প্রত্যেক ভাষার গদ্যরীতির মধ্যেই যে একটা শব্দগত, শব্দ যোজনাগত, বিভক্তিগত ও অন্বয়গত মোটামুটি আদর্শ আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই আদর্শকেই মূলভাবে গদ্যরীতির আদর্শ বলা যাইতে পারে এবং যাঁহারা বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের মতে বাংলা গদ্য-রচনার এই সব লক্ষণগুলি ঐ দুই মহাত্মার রচনাতে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়।

কথাটা ঐতিহাসিক ভাবে বিচার করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ “বেতাল পঞ্চবিংশতি।” ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থ হইতে বিদ্যাসাগরের রচনার উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক্।

“রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজকুমারী উপবন বিহারে অভিলাসিনী হইয়া পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন রাজা সম্মত হইলেন এবং রাজধানীর অনতিদূরে, যোজন বিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন।”

ইহা অপেক্ষাও পরবর্ত্তী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “শকুন্তলা” হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক্—

“ইহারা তিন সখীতে কি অবলোকন করিতেছেন, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ শ্রবণ ও অবলোকন করি, এই বলিয়া রাজা উৎসুক মনে শ্রবণ ও সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন করিতে লাগিলেন।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য-রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁহার “বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবে।” উহাও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। কয়েকটি ছত্র এইরূপ—

“তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপু বশীভূত হইয়া ব্যাভিচার দোষে দুষ্ট হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ। কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া তাহাদের অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নও। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জ্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক আচার রক্ষা করাই পরমধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাগণ জন্মগ্রহণ না করে।”

উদ্ধৃতিবাহুল্যের আশঙ্কায় অক্ষয়কুমারের রচনার কোন উদাহরণ এখানে আর লইলাম না। বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃত রচনাগুলিতে, বিশেষতঃ “বিধবাবিবাহ” হইতে গৃহীত অংশে ভাষার যে গঠনপ্রাঞ্জলতা ও ধ্বনিলালিত্য রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় “পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরস শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া” বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গদ্যভঙ্গী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই ভঙ্গিমার চমৎকারিত্ব যতই থাক, যে গদ্যরীতির উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার প্রতিষ্ঠা তাহা কি তিনিই প্রথম বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কালে কি এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহৃত গদ্যরীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বাঙ্গলার গদ্যভাষা বিকাশ লাভ করিয়াছে? আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়, অসামান্য গদ্যশিল্পী হইলেও ঐতিহাসিক-ভাবে বলিতে গেলে তাঁহারা কোন গদ্যরীতি সৃষ্টি করেন নাই এবং কোন গদ্যরীতিকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী করিয়াও যান্ নাই।

প্রথমতঃ ধরা যাক তাঁহাদের শাব্দিক সম্পদের কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম পুস্তক ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত; অক্ষয়কুমারের “তত্ত্ববোধিনী” ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইলেও তাহার গদ্যরীতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে পরিপক্ক হয় নাই। শুধু তাহাই নহে—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত আরও দুইখানি গ্রন্থ—“বাঙ্গলার ইতিহাস” ও “বোধোদয়” সম্পূর্ণই শিশুপাঠ্য পুস্তক। এই সকল পুস্তকের রচনার কোন প্রভাব সমসাময়িক গদ্যলেখকের উপর না থাকাই সম্ভব। কাজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের যে গদ্যরীতির উদাহরণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা ঠিক বিদ্যাসাগর কিংবা অক্ষয়কুমারের আদর্শপ্রণোদিত নহে। নিম্নে দ্বারকানাথ রায় সম্পাদিত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র মাসের “সুলভ” পত্রিকা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা গেল—

“বিদ্যার প্রধান ফল জ্ঞানচর্চ্চা। ধনাগম তাহার আনুষঙ্গিক ফল বটে। কিন্তু এদেশীয় অধিকাংশ বিদ্যোজ্জ্বল ব্যক্তিকে প্রায় তদ্দ্বারা ধনার্জ্জন করিতেই হয়। জ্ঞানচর্চ্চার সহিত তাঁহারা প্রায় সম্পর্কই রাখেন না। ভাল। যদি তাঁহারা সেই ধন সৎকর্ম্মে ব্যয় করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের বিদ্যালাভের একপ্রকার সার্থকতা হয়। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, তাঁহারা কেবল অত্যন্ত দুরাচার বয়স্যদিগের সহিত সে সমুদয় অর্থ ক্ষয় করেন।”

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের “বিবিধার্থ সংগ্রহ” হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক—

“সাধারণতঃ মনুষ্য মাত্রেই অনুকরণে রত। অন্যের অবস্থা, অন্যের ভাব বা অন্যের রাগ দ্বেষাদি ধর্ম্ম উত্তমরূপে মনে বিকশিত হইলেই সেই ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের অনুকরণ করিতে প্রায়ই সকলের প্রবৃত্তি হয়। কদাপি ইচ্ছা না হইলেও এই প্রবৃত্তি স্বত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুকরণ ক্রিয়া মনুষ্যমাত্রেরই আনন্দজনক। বালকেরা সর্ব্বদাই ইহাতে তৎপর, পিতৃমাতৃ বয়স্য পরিজন প্রভৃতিরা জীবনযাত্রায় যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন, বালকেরা তাহার অনুকরণ করিতে নিয়ত অনুরত থাকে; তাহাদের অত্যন্ত প্রমোদজনক ক্রিয়ার মধ্যে ঐ অনুকরণ কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। ক্ষুদ্র গৃহের স্থাপন করা, তাহাতে মৃত্তিকাদি পদার্থদ্বারা কাল্পনিক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা, কাষ্ঠপুত্তলিকাকে পুত্রকন্যার ন্যায় লালনপালন করা, তাহার বেশভূষা ও কল্পিত বিবাহাদি সংস্কার সমাধা করা অপেক্ষা বালিকার পক্ষে প্রিয়তর আর কিছুই দেখা যায় না।”

উপরে উদ্ধৃত এই উভয় রচনায়ই ভাষা আড়ষ্ট ও লালিত্যহীন, কিন্তু গদ্যরীতির উদাহরণ হিসাবে দ্বারকা-

নাথের কিংবা রাজেন্দ্রলালের রচনার কোনটিই বিদ্যাসাগর কিংবা অক্ষয়কুমারের রচনা হইতে শব্দনির্ব্বাচনের হিসাবে অধিক সংস্কৃতানুরাগী নহে। বিশেষতঃ দ্বারকানাথের রচনায় "ভাল" এবং "সম্পর্কেই রাখেন না," এ দুইটি চলিত প্রয়োগের (idiom) উদাহরণ দেখিতে পাই। তা ছাড়া, এই উদ্ধৃতাংশ "বিদ্যোজ্জ্বল" এই পদটি ভিন্ন কথ্য বাঙ্গলায় ব্যবহার হয় না এমন একটীও সমাসসিদ্ধ পদের ব্যবহার নাই। রাজেন্দ্রলালের রচনায়ও "বৃত্তি" ও "প্রমোদজনক" প্রভৃতি সংস্কৃতানুরাগী বিশেষ্য বিশেষণ পদের ব্যবহার থাকিলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় "ব্যবহিত হইয়া" ও "অবলোকন করিলেন" প্রভৃতি সংস্কৃতানুরাগী ক্রিয়াপদের ব্যবহার নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "বিবিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের রচনা পড়িলে আরও বিস্মিত হইতে হয়। একটি অংশ এইরূপ—

"বাহকগণের ক্লান্তি দূর হইলে তিনি পুনরায় যানোপরি আরোহণ করিলেন এবং অরণ্যের শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। সেই সম্মুখে একটি ধূমাকৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছিল; ক্রমে ক্রমে ধূম অপসৃত হইলে তাহা কোন দুর্গের ন্যায় বোধ হইল। তাহাতে কৃষ্ণকুমারীর কতদূর যে ভয়ের সম্ভাবনা তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর; তাহাতে আবার এ সময় একদল অশ্বারোহী সেনা কিঞ্চিৎ দূরে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল।"

এ রচনার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব এক-প্রকার নাই বলিলেই চলে। এখানে "যানোপরি" ভিন্ন একটিও সংস্কৃতানুরাগী পদের ব্যবহার নাই এবং এ প্রকার শব্দ সংস্কৃত লব্ধ হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় ইহার প্রয়োগ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। কাজেই শব্দনির্ব্বাচন হিসাবে বিচার করিতে গেলে একথা বলা চলে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন গদ্যরীতি প্রবর্ত্তন করিয়া যান নাই, কেন না তাঁহার সমসাময়িক অনেক বাংলা রচনার মধ্যেও সমাসহীন শুদ্ধ ও সহজবোধ্য পদ নির্ব্বাচনের পর্য্যাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দযোজনা, বিভক্তি ও অন্বয়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন নিজস্ব গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনায় সমাসবহুলতা ছিল না সত্য কিন্তু তাহা হইলেও তিনি শব্দযোজনায় সংস্কৃত গদ্যের প্রভাব একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, বিশেষণবাহুল্যে তাঁহার রচনা ভারাক্রান্ত ছিল। তাহার কারণ, সংস্কৃত গদ্য-রচনার বাক্যার্থের অনেকখানি ভারবহন করে বিশেষণ পদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাই দেখিতে পাই তাঁহার বক্তব্য কথার অনেকখানি ভার বয় করেন বিশেষণের ও ক্রিয়া-বিশেষণের (Predicative) সাহায্যে, যথা—"রাজকুমারী উপবন বিহারে অভিলাষিণী হইয়া ইত্যাদি", "ধর্ম্মরাজ সেই স্থলে অবস্থিত আজ্ঞানুবর্ত্তী ভ্রাতৃগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন ইত্যাদি," "করতল কপোল বিন্যস্ত করিয়া স্পন্দহীন মুদ্রিতনয়না চিত্রাপিতার ন্যায় উপবিষ্টা আছেন।" এই বিশেষণ প্রয়োগপন্থা ও সমকর্তৃক একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বিদ্যাসাগরের ন্যায় ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দের রাজেন্দ্রলালের রচনায়ও দেখিতে পাই। বিভক্তি, লিঙ্গ ও ক্রিয়া রূপকের ব্যবহার সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার আসন্ন সমসাময়িক লেখকের রচনার প্রভেদ অল্পই আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন "কন্যা ব্যাভিচার দোষে দুষ্ট হইলে", রাজেন্দ্রলাল তেমনি "ঐন্দ্রিজালিক শক্তি" ব্যবহার করেন। রাজেন্দ্রলাল "দুগ্ধ গৃহের স্থাপন" প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু অক্ষয়কুমারের ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকেও "অধর্ম্ম সংশের বৃদ্ধি করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্রিয়ারূপ অতিশয় সংস্কৃতানুরাগী, যথা—"লিখন সমাপন।" "সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার অবসর নাই।" "সম্বোধিয়া" "জিজ্ঞাসিলেন" ইত্যাদি এই হিসাবে সমসাময়িক লেখকের রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাক্যের অন্বয় হিসাবে এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার কোনও বৈয়াকরণিক সঙ্গতি ছিল বলিয়া হয়ত বিশ্বাস করিতেন না, যদি করিতেন তবে কমা চিহ্নের এত মারাত্মক অপব্যবহার করিতেন কি-না সন্দেহ। আমরা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত "শকুন্তলা" হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। "একদিন, মধ্যাহ্নকালে, রাজা, নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শকুন্তলার দর্শন ব্যতিরেকে, আমার প্রাণরক্ষার উপায় নাই।" বাক্যের প্রথম এগার শব্দের মধ্যে ছয় বার কমা চিহ্ন ব্যবহার হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কোন নিজস্ব গদ্যরীতির করিয়া যান্ নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয়

অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। আর তাঁহার রচনায় যে গদ্যাদর্শ স্থান পাইয়াছে তাহার উপর যে পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের গদ্য-রচনা প্রতিষ্ঠিত নয় তাহা বোধ হয় একেবারেই কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বাংলা গদ্যরীতি যথার্থ-ভাবে পরিণতি লাভ করে ১৮৭৫ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের আদি রচনার মধ্যেও পরিণত বাংলা গদ্যরীতির যথার্থ উদাহরণ পাওয়া যায় না। এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা গদ্য "ভুঁই ফোঁড় হইয়া জন্মায় নাই।" বাংলা নাটক ও বাংলা সাময়িকপত্র হইতে প্রকৃত বাংলা গদ্যরীতির উৎপত্তি। ঈশ্বর গুপ্তের শব্দ-সম্ভার ও রামনারায়ণ-মধুসূদনের ব্যবহৃত কথ্য বাংলার কাঠামো লইয়াই "বঙ্গদর্শনের" শেষ যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার প্রভৃতি লেখকের হস্তে যথার্থ বাংলা গদ্য-রীতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যাঁহারা এই গদ্যরীতি-গঠনে সাময়িক-পত্রের প্রভাব স্বীকার করিতে অসম্মত, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধ ১৮৭১ ইংরেজীতে প্রকাশিত "সাহিত্য মুকুর" নামক সাপ্তাহিক পত্র হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। ২৮ জানুয়ারীর সংখ্যায় এইরূপ লেখা আছে:—

"বাংলাভাষার গদ্য তিন প্রকারের—প্রথম গৌড়ী, দ্বিতীয় চলিত সাধুভাষা, তৃতীয় সামান্য। গদ্যরচনা প্রথমতঃ গৌড়ীয় রীতিতে ছিল। ঐ রীতিটা অবিকল সংস্কৃত হইতে নকল করা। যে সকল পুরাতন গদ্য পুস্তক আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই প্রায় গৌড়ীয় সাধুভাষায় রচিত এবং আমরা ঐ গৌড়ীয় সাধুভাষাকেই গৌড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। গৌড়ীরীতি আজকাল লোকে বড় পছন্দ করে না এবং পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত শক্ত কথা দিয়া এইরূপ কঠিন রচনায় আর আমাদের তত আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় চলিত সাধুভাষা। এইটী আধুনিক কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার নামগন্ধও ছিল না—এখন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সহজ হইয়া এই রচনাটী প্রচলিত হইয়াছে। বক্তৃতা কোন বিষয়ের রচনা ও আপরাপর কাব্য (নবাখ্য) প্রভৃতি আজকাল এই রীতিতে রচিত হইতেছে। বস্তুতঃ এইটীই এ সকল রচনায় যথার্থ উপযুক্ত। ইহাতেই চলিত ভাষা অধিক মিশ্রিত করিয়া সংবাদপত্রাদি লিখিত হয়।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয় নাই এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য "সোমপ্রকাশ"ই এই যুগের একমাত্র সাময়িকপত্র ছিল না।

নূতন-পথে

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

'ঘর ছেড়ে আজ' শুধাও প্রিয়, 'যাচ্ছি কোথায় আমি ?'
শুন্‌ছ নাকি ? বাঁশীর সুরে ডাকছে স্বামীর স্বাগী ?
বাঁশীর ও সুর শুনি কানে,
থাকি বলো কোন্ পরাণে,
তোমার কোলে রাখি মাথা বদ্ধ দিবসযামী !

থাকবে কোথায় ছেলেমেয়ে ? ভাবনা কিগো তার !
রইল তাদের জগন্মাতা, খেয়ার পারাবার।
বিপদ যদি কভুই আসে,
থাকবে তুমি তাদের পাশে ;
সময় হ'লে এসো পরে রইবে খোলা দ্বার।

ঘরের বধূ একা যাব ? নাইক কোন ভয় ?
বাঁশীর ও সুর লজ্জা সরম সব করে যে জয়।
সবার চোখে দিয়ে ফাঁকি,
অসীম পথে দৃষ্টি রাখি,
চলব নিয়ে বিশ্বজয়ী-সাহস পরাণময়।

চাইছ দিতে ধনদৌলত ? মলিন কেন মুখ ?
পাওয়ার যা তা সব পেয়েছি, পাইনি শুধু সুখ।
যদিই পথে বিপদ ঘটে,
যদিই কোন কুৎসা রটে,
যদিই মরি তাঁকে পেতে নাহিক কোন দুখ।

যাবার পথে তোমার চোখে অশ্রুবারি নামি',
যেতে আমায় দেবে নাকি ? যাব কি গো আমি ?
কি হবে আর হেথায় থাকি !
নাইক কিছু, সবই ফাঁকি ;
অচিন পথে চলব আমি—সে পথ ঊর্দ্ধগামী।

TIGHT BINDING

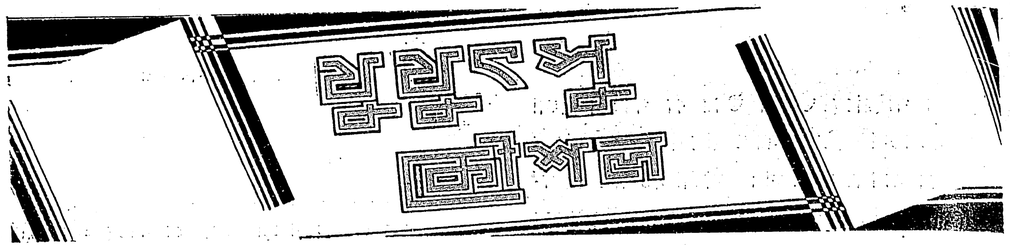

যুযুৎসু কৌশল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

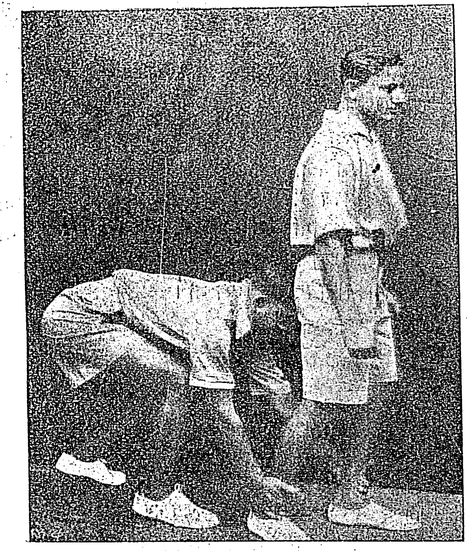

১১৬নং প্যাঁচ

১১৬নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

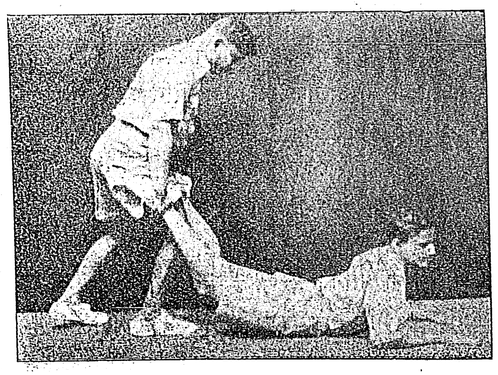

১১৬নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

অপরের পিছনে গিয়া তাহার ডান পায়ের গোছটি নিজের ডান হাত দিয়া ও বাঁ পায়ের গোছটি বাঁ হাত দিয়া জোরে ধরিয়া টানিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথা দিয়া তাহার পাছায় জোরে ধাক্কা মারিলে (১১৬নং—১ম চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১১৬নং—২য় চিত্র)

১১৭নং প্যাঁচ

যদি কেহ পিছনে গিয়া দুই হাত দিয়া কোমরটি জোরে জড়াইয়া ধরে তবে নীচু হইয়া দুই পায়ের মধ্য দিয়া হাত দুইটী

১১৭নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

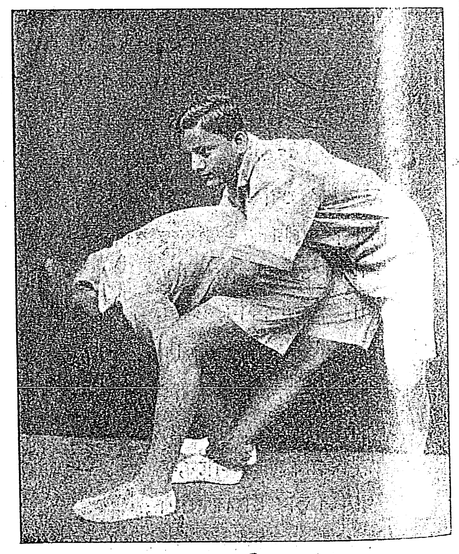

চালাইয়া দিয়া তাহার আগান পায়ের গোছটি জোরে ধরিয়া (১১৭নং—১ম চিত্র) সোজা ভাবে উপরে তুলিতে তুলিতে সামনে আগাইয়া দিয়া তাহার হাঁটুর উপর জোরে চাপ দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১১৭নং—২য় চিত্র)

১১৭নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

১১৮নং প্যাঁচ

অপরের পিছনে গিয়া নিজের বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ কব্জি ও ডান হাত দিয়া তাহার ডান কব্জি জোরে ধরিয়া তাহার হাত দুইটি সোজা রাখিয়া টানিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান পা-টি তুলিয়া তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে টানিলে (১১৮নং—চিত্র) তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

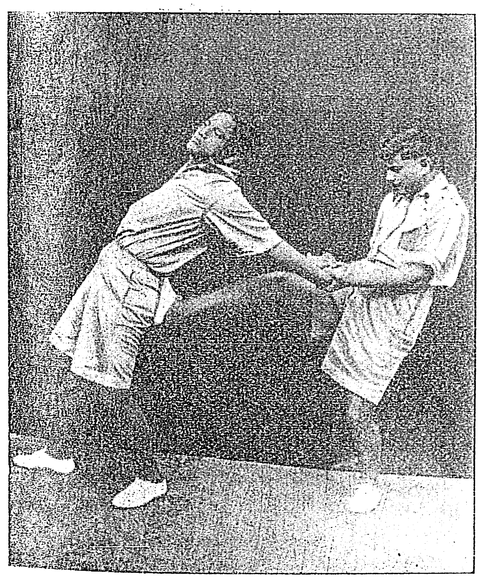

১১৮নং প্যাঁচের চিত্র

১১৯নং প্যাঁচ

অপরে যদি তাহার দুই হাত দিয়া কোমরটি জড়াইয়া ধরে এবং তাহার মাথাটি যদি নিজের ডান ধারে থাকে

১১৯নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

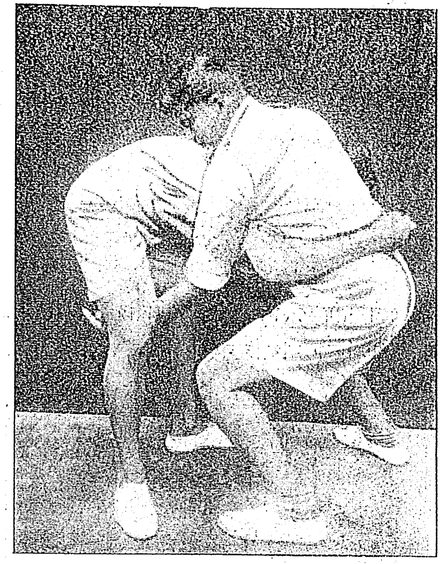

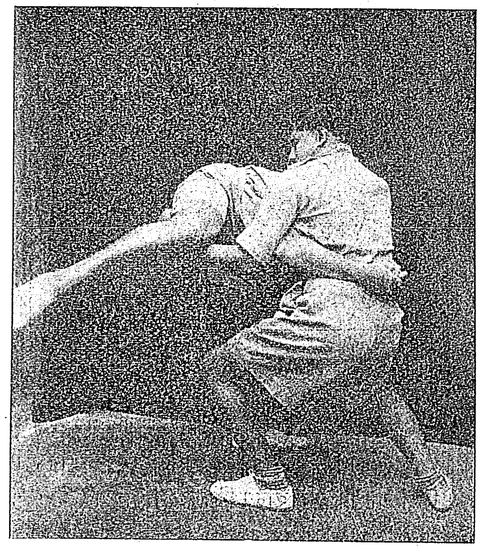

১১৯নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

একটু নীচু হইয়া ডান ধারে ঘুরিয়া বাঁ হাতখানি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান উরুতে রাখিয়া (১১৯নং—১ম চিত্র) জোরে ডান ধারে ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের জোরে তাহার ডান পা-টি তুলিয়া (১১৯নং—২য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

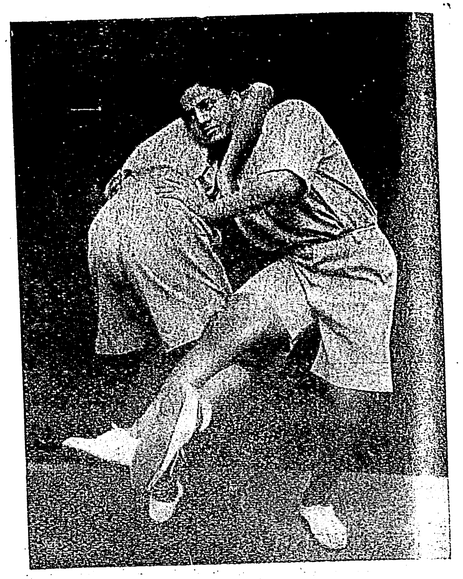

১২০নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

১২০নং প্যাঁচ

অপরে যদি কোন প্যাঁচ মারিবার জন্য নিজের ডান বগলের নীচু দিয়া মাথাটি লইয়া যায় তৎক্ষণাৎ নিজের ডান

১২০নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

বাহু দিয়া তাহার গলাটি জোরে জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান হাঁটুর পিছনে লাগাইয়া (১২০নং—১ম চিত্র) জোরে ঝোঁক দিয়া পিছনে তুলিতে তুলিতে (১২০নং—২য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২১নং প্যাঁচ

অপরে যদি কোন প্যাঁচ মারিবার জন্য নিজের ডান

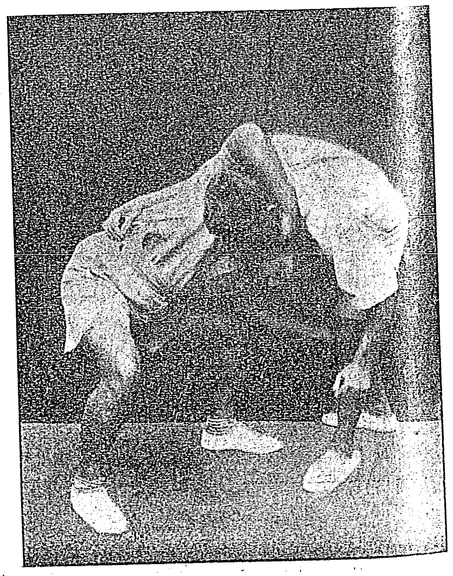

১২১নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

বগলের নীচু দিয়া মাথাটি লইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ নিজের ডান বাহু দিয়া তাহার গলাটি জোরে জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নীচু হইয়া ডান ধারে ঘুরিয়া তাহার কোলের মধ্যে দিয়া বাঁ হাতটি তাহার দুই পায়ের মধ্যে চালাইয়া

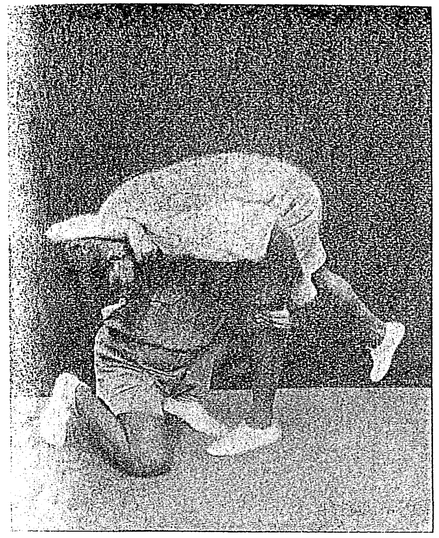

১২১নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

দিয়া তাহার বাঁ হাঁটুর পিছনে জোরে ধরিয়া (১২১নং—১ম চিত্র) ডান হাঁটু নীচে ও বাঁ হাঁটু উপরে তুলিয়া জোরে বসিয়া (১২১নং—২য় চিত্র) ডান দিকে কাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডান বাহু দ্বারা ধরা তাহার গলাটি জোরে টানিলে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

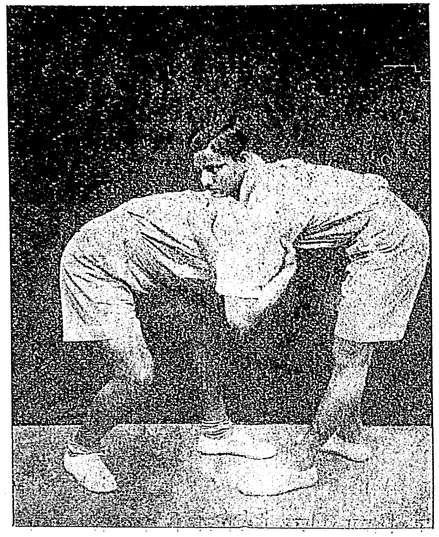

১২২নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

১২২নং প্যাঁচ

নীচু হইয়া অপরকে কোন প্যাঁচ মারিতে গেলে অপরে যদি নিজের দুই বগলের মধ্যে তাহার দুই হাত চালাইয়া দেয় তৎক্ষণাৎ দুই বগল দিয়া তাহার দুই হাতটি জোরে চাপিয়া ধরিয়া (১২২নং—১ম চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে নীচু হইয়াই বাঁ হাঁটু মাটিতে রাখিয়া ও ডান হাঁটু তুলিয়া বাঁ দিকে কাৎ হইলে (১২২নং—২য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

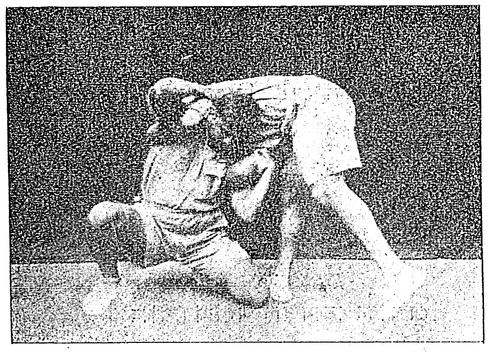

১২২নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

১২৩নং প্যাঁচ

নীচু হইয়া অপরকে কোন প্যাঁচ মারিতে গেলে অপরে যদি নিজের দুই বগলের মধ্যে তাহার দুই হাত চালাইয়া দেয় তৎক্ষণাৎ দুই বগল দিয়া তাহার দুই হাতটি জোরে চাপিয়া ধরিয়া (১২২নং—১ম চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে নীচু হইয়াই

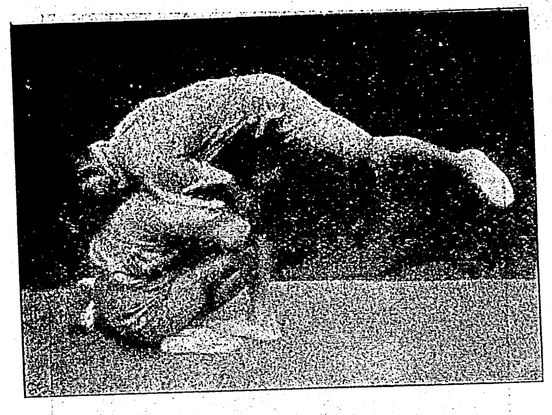

১২৩নং প্যাঁচ

বাঁ হাঁটু মাটিতে ও ডান হাঁটু তুলিয়া রাখিয়া তাহার পেটের কাছে মাথাটি রাখিয়া (১২৩নং চিত্র) তাহার শরীরটিকে নিজের পিছন দিকে উল্টাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে পিছনে শুইয়া পড়িলে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২৪নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটি টিপিয়া ধরে এবং যদি তাহার বাঁ পা-টি আগান থাকে, তবে সেইরূপ ধরা অবস্থাতেই নিজের দুই হাত দিয়া তাহার মুঠো দুইটি জোরে ধরিয়া নিজের বাঁ কনুই দিয়া তাহার ডান কনুইয়ে জোরে মারিয়া ও বাঁ পা-টি আগাইয়া তাহার বাঁ হাঁটুতে মারিয়া তৎক্ষণাৎ জোরে ডান দিকে ঘুরিয়া (১২৪নং চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১২৪নং প্যাঁচের চিত্র

বিহ্বল

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

যে জীবন ভেসে যায় অজানার পানে
কোথা হতে কাল স্রোতে কোথা ভেসে যায়,
যে উৎসব দু দিনের অশ্রু ও আশায়—
নয়ন সলিলে তারে বাঁধিব কেমনে ?

যে স্বপন মুছে যায় আঁধার-মরণে,
যে কুসুম যায় ঝরে—কালের পাখায়
ভেসে চলে যে জীবন কোন অজানায়—
ফিরাব কেমনে তারে ফিরাব কেমনে ?

সেই স্মৃতিটুকু শুধু—যা গিয়েছে ঝরে
ভরিয়া রেখেছে মোর স্বপ্ন-জাগরণ,—
ছিল যে আমারই চির একান্ত আপন
গিয়েছে সে কোথা আজ অজানা আঁধারে !

আমি হেথা বসে আছি বেদনা-বিহ্বল,
অতীতের পানে চেয়ে ফেলি অশ্রুজল।

বেতার বা রেডিও

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য এম্-এস্-সি

(২)

পূর্ব্বে বেতার বা রেডিওর মূল তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি খুবই জটিল।

বার্ত্তা-প্রেরকযন্ত্রের সহিত আরও একটু সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইতে হইলে বিজ্ঞানের কতকগুলি সাধারণ কথার সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। এস্থলে যতটুকু না বলিলে নয়, তাহাই শুধু বলা হইল।

বার্ত্তাপ্রেরক কিম্বা বার্ত্তা-গ্রাহকযন্ত্রে একটি বায়ুস্থ তার, ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্, ভ্যাকুয়াম্ টিউব্ অথবা বিশেষ কোন স্ফটিক, টেলিফোন্, মাইক্রোফোন্—মূলত এই কয়েকটি জিনিষেরই প্রয়োজন হয়। ইহারা কি এবং কি ইহাদের কাজ, এখানে তাহাই বলা হইবে।

কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে আমাদের জানা উচিত—বিদ্যুত যে প্রবাহিত হয়, তাহা কি করিয়া ঘটে। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই অণু (molecule) আছে এবং অণু পরমাণু দ্বারা (atoms) গঠিত। এই পরমাণুও আবার ইলেক্‌ট্রন্ ও নিউক্লিয়াস্ হইতে সৃষ্ট। প্রত্যেক ইলেক্‌ট্রন্ ঋণাত্মক বিদ্যুতের একটি অংশ (Negative charge)। ইহা বিদ্যুতযুক্ত ক্ষুদ্র পদার্থ নয়, ইহা নিজেই বিদ্যুত। সে যাহা হোক্, এই ইলেক্‌ট্রন্ চলিলেই বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। বিদ্যুত তামার তার দিয়া ভাল চলে, তার অর্থ—তামার তারে অনেকগুলি আল্‌গা (loosely bound) ইলেক্‌ট্রন্ আছে—ডায়নামো বা ব্যাটারী হইতে একটা ধাক্কা পাইলেই এই ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমাদের ঘরে সুইস্-বোর্ডে যে দুইটি "প্লাগ্ হোল্" আছে, উহারা খুব নিকটবর্ত্তী, তবু যে কোন বিদ্যুত প্রবাহিত হইতেছে না তার কারণ বাতাসের ইলেক্‌ট্রন্ অত আল্‌গা নয়। ভোল্ট্ কথাটি আমরা হয় ত শুনিয়াছি। কলিকাতায় ২২০ ভোল্টে আলো জ্বলে—রাজসাহী কলেজে ১১০ ভোল্টে বিদ্যুত চলে; কোন কোন স্থলে আমরা হয় ত ইহাও লেখা দেখিয়াছি যে "বিপদ্, চল্লিশ হাজার ভোল্ট"—অর্থাৎ সেখানে চল্লিশ হাজার ভোল্টে বিদ্যুত চলে। কত জোরে ইলেক্‌ট্রন্‌কে ধাক্কা দেওয়া হইতেছে ভোল্ট্ তাহারই পরিমাণ। যত বেশী ভোল্ট্, তত বেশী জোরে ইলেক্‌ট্রনকে ধাক্কা দেওয়া হয়।

ইহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে "ক" হইতে ইলেক্‌ট্রন্ যদি "খ"-তে যায়, তবে "ক" ও "খ"-এর মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহিত হইবে।

"কন্‌ডেন্‌সার" জিনিষটি কি করিয়া তৈরী করে, তাহা আমাদের না জানিলেও চলিবে—কিন্তু কন্‌ডেন্‌সারের কি কাজ তাহা আমাদের জানা চাই। ইহা আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। (১নং চিত্র দেখুন)।

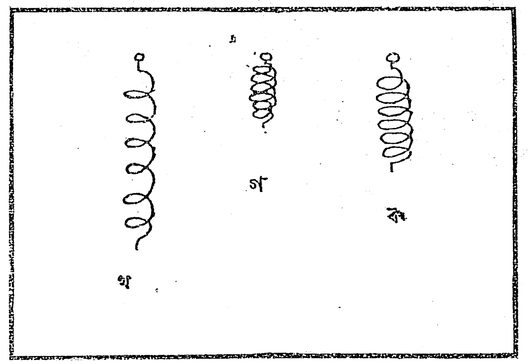

১নং চিত্র

১নং চিত্রে "ক" অংশে একটি স্প্রীং ঝুলিতেছে, ইহার উপরের দিক্‌টা একটা হুকে আট্‌কানো। নীচের দিকে ধরিয়া ইহাকে টানিলে ইহার যে আকার হইবে, তাহা চিত্রের "খ" অংশে দেখানো হইতেছে। এখন যদি ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে ইহা তৎক্ষণাৎ চিত্রের "গ" অংশের অনুরূপ হইবে অর্থাৎ ইহার দৈর্ঘ্য "ক" অংশের দৈর্ঘ্যের (স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য) চেয়ে কম হইবে; স্প্রীংটি কাঁপিতে থাকিবে অর্থাৎ ইহার দৈর্ঘ্য একবার ছোট, একবার বড়

হইতে থাকিবে—এই রকম কাঁপিতে কাঁপিতে স্প্রীংটি অবশেষে থামিয়া যাইবে। ইহাও দেখা যাইবে যে, স্প্রীংয়ের স্পন্দনমাত্রা ক্রমে কমিয়া আসিবে। এই যে স্প্রীং কাঁপে, ইহা স্প্রীংয়ের একটি ধর্ম্ম—ইহাকে "springiness" বলা যাইতে পারে।

কন্‌ডেন্‌সারের ভিতর দিয়া সাধারণত বিদ্যুত যাইতে পারে না। স্প্রীংকে টানিয়া ধরিলে ইহা শক্তি (energy) সংগ্রহ করিয়া রাখে। স্প্রীংকে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে ইহা যে কাঁপে তাহা এই সংগৃহীত শক্তির বলেই। ইহাই springiness. কন্‌ডেন্‌সারও তাহার গঠনজনিত বৈশিষ্ট্যের ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে। ইহার নাম "ক্যাপাসিটি" বা ধারণ-ক্ষমতা। স্প্রীংয়ের বেলায় যাহা springiness, কন্‌ডেন্‌সারের বেলায় তাহাই ক্যাপাসিটি। স্প্রীংকে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা কাঁপিতে কাঁপিতে অবশেষে থামিয়া যায়; কম্পন-মাত্রা ক্রমে কমিতে থাকে। কন্‌ডেন্‌সারের বৈদ্যুতিক শক্তিও এই রকম কাঁপিয়া কাঁপিয়া নষ্ট হয়। ইহাই কন্‌ডেন্‌সারের ডিস্‌চার্জ (এইখানে "নষ্ট" কথাটি ব্যবহার করিলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কোন শক্তিরই নাশ নাই—ইহা শুধু অন্য আকারে রূপান্তরিত হয়—সেই শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তির আকারে থাকে না বলিয়াই "নষ্ট" কথাটি ব্যবহার করিয়াছি)।

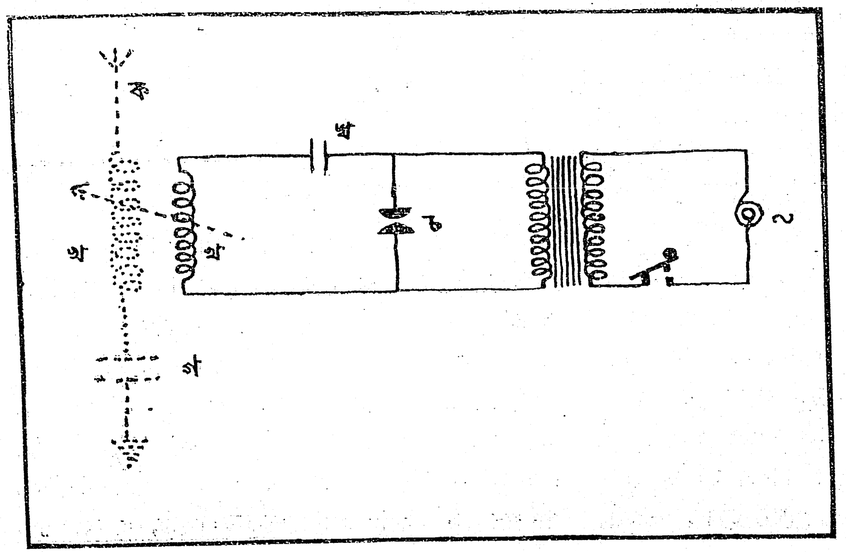

২নং চিত্র

কিন্তু, স্প্রীংটিতে (১নং চিত্র) যদি একটা ভারী জিনিষ ঝুলাইয়া দেওয়া হইত এবং পরে তাহাকে একটু টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলেও স্প্রীংটি এদিক্ ওদিক্ কাঁপিত সত্য, কিন্তু কম্পনের পৌনঃপুন্য কমিয়া যাইত। সুতরাং এই ওজনের মাত্রা বাড়াইয়া বা কমাইয়া আমরা স্প্রীংয়ের কম্পনের পৌনঃপুন্য বাড়াইতে বা কমাইতে পারি।

স্প্রীংয়ের ক্ষেত্রে ওজনের সাহায্যে আমরা যাহা করিতে পারি, বিদ্যুতের বেলায় আমরা "ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স" সাহায্যেও তাহাই করি। "ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স"-এর সাহায্যে কন্‌ডেন্‌সারের ডিস্‌চার্জের পৌনঃপুন্য বাড়ানো বা কমানো হয়—ঠিক যে ভাবে ওজনের সাহায্যে স্প্রীংয়ের কম্পনমাত্রা পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে।

এইরূপেই অর্থাৎ কন্‌ডেন্‌সার ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্সের সাহায্যে বার্ত্তা-প্রেরকযন্ত্রের বায়ুস্থ তারে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কম্পনমাত্রা সংযুক্ত দোলায়মান বিদ্যুত প্রস্তুত করা হয়। কন্‌ডেন্‌সার একটি স্প্রীংয়ের কাজ করে এবং ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স একটি ওজনস্বরূপ। কন্‌ডেন্‌সারের ডিস্‌চার্জ হইল স্প্রীংয়ের কম্পনের অনুরূপ।

২নং চিত্রে একটি বার্ত্তাপ্রেরকযন্ত্রের ছবি দেখানো হইল।

"ক"—বায়ুস্থ তার; খ, খ—ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স; গ—বায়ুস্থ তারে কন্‌ডেন্‌সার; ঘ—কন্‌ডেন্‌সার। যন্ত্রের অন্যান্য অংশের সহিত আমাদের বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজন নাই।

এই অংশে যন্ত্র সাহায্যে দোলায়মান বিদ্যুত প্রস্তুত করা হয় এবং এই কন্‌ডেন্‌সার ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স সাহায্যে উহার কম্পনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

বার্ত্তা-গ্রাহক-যন্ত্রেও এই ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স ও কন্‌ডেন্‌সার সাহায্যে বায়ুস্থ তারকে সহধ্বনিত করা হয়। (৩নং চিত্র দেখুন)।

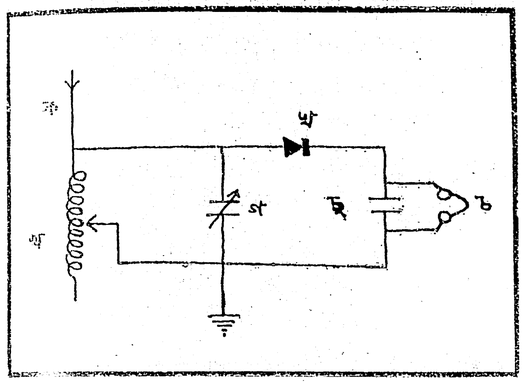

৩নং চিত্র

ক—বায়ুস্থ তার; খ—ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স; গ—কন্‌ডেসার। অন্যান্য অংশের সহিত আমাদের বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজন নাই। সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুতকে কথায় পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই কন্‌ডেন্‌সার ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স সাহায্যে বায়ুস্থ তারকে সহ-ধ্বনিত করিয়া রেডিও-ঢেউ গ্রহণোপযোগী করিয়া তোলা হয়।

কন্‌ডেন্‌সার ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্‌এর এই ধর্ম্ম যে বিদ্যুতের চলার পথে যতই বেশী কন্‌ডেন্‌সার্ দিব, ততই বিদ্যুতের পথের "springiness" বাড়িবে এবং "ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্" বাড়ানো অর্থ স্প্রীংয়ের নীচে ওজন বাড়ানো। যেমন, রেডিও বিদ্যুতের ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য যদি ১০০ মিটার হয়, (এক মিটার এক গজের কিছু বেশী) তবে তাহার স্পন্দনসংখ্যা হইবে সেকেণ্ডে ত্রিশ লক্ষ। গ্রাহক যন্ত্রের কন্‌ডেন্‌সার ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্সের সাহায্যে এমন অবস্থা করা হইবে যে বায়ুস্থ তারে যে বিদ্যুত হইবে—সেই বিদ্যুতের কম্পনসংখ্যাও সেকেণ্ডে ত্রিশ লক্ষ হইবে। এইরূপে শুধু একশত মিটারের রেডিও-ঢেউই যন্ত্রে ধরা পড়িবে—অন্য কোন ঢেউ যন্ত্রে সাড়া দিবে না।

সহধ্বনিত করার পর—"ডিটেক্‌শন" অর্থাৎ রেডিও বিদ্যুতকে একাভিমুখী করিয়া লওয়া। ৩নং চিত্রের "ঘ"-অংশ দেখুন। ইহা একটি "ক্রীষ্ট্যাল্"। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কতকগুলি ক্রীষ্ট্যাল্ আছে, যেমন, "কারবোরেণ্ডাম্", "গেলেনা"—যাহার ভিতর দিয়া শুধু এক দিকেই বিদ্যুত প্রবাহিত হইতে পারে। এইরূপে রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করিয়া পরে টেলিফোনে পাঠানো হয়। ৩নং চিত্রের "চ"-অংশ একটি টেলিফোন বা লাউড্-স্পীকার। এই যন্ত্র বিদ্যুত হইতে অনুরূপ কথার সৃষ্টি করে। এই ক্রীষ্ট্যাল-ব্যবহার-করা-যন্ত্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; বহু দূরের রেডিও ঢেউ-এর পক্ষে ইহা কার্য্যকরী নয়। কাজেই এবং অন্যান্য কারণে ইহার ব্যবহার আজকাল খুব কমিয়া গিয়াছে। তবু ইহা খুব স্বল্প-আয়াসসাধ্য এবং এই রকম বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্র তৈরী করিতে খরচও বেশী পড়ে না।

বর্ত্তমানে ভ্যাকুয়াম্ টিউব্ সাহায্যে বার্ত্তাপ্রেরক ও বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্র উন্নত ধরণের করা হইয়াছে। আধুনিক বার্ত্তাপ্রেরক ও বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের বর্ণনা করা কঠিন। কিন্তু ইহার মূল তথ্যটি অপেক্ষাকৃত সহজ, সুতরাং এখানে সংক্ষেপে তাহাই বলা যাইতেছে।

ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌বে যে তার জ্বলে, তাহাকে ফিলামেণ্ট্ বলে। ইহার ভিতর দিয়া বিদ্যুত চলিলে ইহা উত্তপ্ত হয় এবং পরিশেষে সাদা আলো দেয়। এডিসন্ সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করিলেন যে এই জ্বলন্ত তার হইতে ইলেক্‌ট্রন্ বাহির হইয়া আসে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইলেক্‌ট্রন্ ঋণাত্মক বিদ্যুত। কাজেই এই তারের নিকটে যদি একটি ধনাত্মক বিদ্যুত-বিশিষ্ট তার থাকে, তবে ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি এই শেষোক্ত তারে আসিয়া পড়িবে; কারণ ধনাত্মক বিদ্যুত ঋণাত্মক বিদ্যুতকে আকর্ষণ করে। তেমনি এই তারের নিকট যদি ঋণাত্মক বিদ্যুত-বিশিষ্ট কোন তার থাকে, তবে যে সমস্ত ইলেক্‌ট্রন্ জ্বলন্ত তার হইতে বাহিরে আসিতেছে, তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে; কারণ ঋণাত্মক বিদ্যুত ঋণাত্মক বিদ্যুতকে বিকর্ষণ করে। কোন্ বিদ্যুত কোন্ বিদ্যুতকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিবে, সে সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, সমধর্ম্মীর সমধর্ম্মীর উপর বিকর্ষণ এবং বিধর্ম্মীর উপর আকর্ষণ। আমরা ইহাও জানি যে ইলেক্‌ট্রন্ চলিলেই বিদ্যুত চলে, আর তাহাদের সংখ্যার তারতম্যের উপরেই বিদ্যুতের শক্তি কম বা বেশী হইয়া থাকে। এইরূপে বাল্‌বের উত্তপ্ত তারের নিকটে আর একটি ধনাত্মক বিদ্যুত-বিশিষ্ট "প্লেট্" রাখিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রবর ফ্লেমিং একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন—এই যন্ত্র সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুতকে

অতি সহজে একাভিমুখী করা যাইতে পারে। ইহার পরে এই বাল্‌বের আরও উন্নতি করা হইল। "ফিলামেণ্ট্" ও "প্লেট্"—ইহাদের মাঝখানে আর একটি তারের জাল (ইহাকে "গ্রিড্" বলে) দিয়া ইলেক্‌ট্রন্-প্রবাহকে আরও সংযত ও করায়ত্ত করা হইল। আমরা এই প্রকার বাল্‌বের কার্য্য-প্রণালী চিত্র সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিব। (৪নং চিত্র দেখুন)।

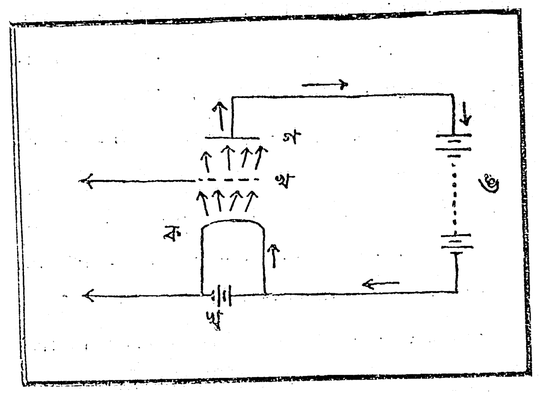

৪নং চিত্র

এই চিত্রের ক, খ, ও গ অংশ লইয়া বাল্‌ব্‌টি তৈরী। ক—ফিলামেণ্ট্; খ—গ্রিড্; গ—প্লেট্; ঘ ও ঙ—দুইটি ব্যাটারী অর্থাৎ বিদ্যুত-সরবরাহ করার যন্ত্র। "ঘ" হইতে বিদ্যুত "ক" ফিলামেণ্টে গিয়া ইহাকে উত্তপ্ত করে; কাজেই "ক" হইতে ইলেক্‌ট্রন্ বাহির হইতে আরম্ভ করে। এই ইলেক্‌ট্রন্ তারের জাল "খ"-এর ফাঁকের মধ্য দিয়া "গ" প্লেটে আসে। "ক" হইতে ইলেক্‌ট্রন্ "গ"-তে আসে, কাজেই "ক" ও "গ"-এর মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। এখন মনে করা যাক্ যে "খ"-তে ধনাত্মক বিদ্যুত আছে; এই ধনাত্মক বিদ্যুত "ক"-এর ইলেক্‌ট্রন্‌কে আকর্ষণ করিবে, কাজেই এবার বেশীসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন্ "ক" হইতে আসিয়া "খ"-এর ফাঁক দিয়া "গ"-তে আসিয়া পৌঁছিবে। বেশীসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন্ আসা অর্থই বেশী শক্তির বিদ্যুত প্রবাহিত হওয়া। তেমনি "খ"-তে যদি ঋণাত্মক বিদ্যুত থাকে, তবে এই বিদ্যুত "ক"-এর ইলেক্‌ট্রন্‌কে বাধা দিবে এবং খুব কম সংখ্যক ইলেক্‌ট্রনই "গ"-তে যাইবে এবং প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি কমিয়া যাইবে। সুতরাং "খ"-এর বিদ্যুতের রকমের উপর প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি নির্ভর করে। রেডিও-বিদ্যুত একবার এক দিকে, আর একবার অন্যদিকে প্রবাহিত হয়; কাজেই এই বিদ্যুত যদি "খ"-এর উপরে পড়ে, তবে "খ"-এর বিদ্যুতের প্রকৃতি যখন ধনাত্মক হইবে, তখনি শুধু প্লেটে বিদ্যুত হইবে, অন্য সময়ে হইবে না; কাজেই দিরাভিমুখী রেডিও-বিদ্যুতের শুধু এক-দিকে-প্রবাহিত হওয়া অংশটুকুর অনুপাতেই প্লেটে বিদ্যুত সৃষ্টি হইবে, অন্য দিকে প্রবাহিত-হওয়া অংশটুকু কার্য্যত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপেই বাল্‌ব সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা হয়।

রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তি-বর্দ্ধিতও এই বাল্‌ব্ সাহায্যেই করা হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, "খ" যদি ঋণাত্মক বিদ্যুত হয়, তবে প্লেটে এক রকম কোন বিদ্যুতই প্রবাহিত হইবে না এবং "খ" যদি ধনাত্মক বিদ্যুত হয়, তবে প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। একথা বলাই বাহুল্য যে "খ"-এর উপরে অর্পিত বিদ্যুতের শক্তির (Voltage) উপর প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি নির্ভর করিবে। নানা কারণে (Space charge) প্লেটের বিদ্যুত যথেচ্ছ বাড়ানো যায় না। যদি "খ"-এর ভোল্ট্ "নিগেটিভ্" হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে "পজিটিভে"র দিকে ওঠে, তবে "গ"-এর বিদ্যুতের মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া সর্ব্বশেষে আর বাড়িবে না। এই প্রক্রিয়া (experiment) হইতে আমরা ইহাও লক্ষ্য করিব যে, "খ"-এর উপরে একটি বিশেষ ভোল্ট্ অর্পিত হইলে "গ"-তে যে বিদ্যুত সৃষ্ট হয়, সেই বিদ্যুত "খ"-এর ভোল্টের সামান্য একটু পরিবর্ত্তনে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়। আরও একটি বিশেষ ভোল্ট্ আছে, যে সময়ে "গ"-এর বিদ্যুত হঠাৎ-বেশী করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে। এই দুইটি বিশেষ ভোল্ট্‌কে আমরা "প্রথম" ও "দ্বিতীয়" বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের অন্যান্য অংশ এমনভাবে তৈরী যে, যে বাল্‌বে রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা হয়, সেই বাল্‌বে "খ"-এর উপর "দ্বিতীয়" বিশেষ ভোল্ট্‌টি অর্পিত হয়; যে বাল্‌ব্ রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তিসম্পন্ন করে, সেখানে "খ"-তে "প্রথম" বিশেষ ভোল্ট্ ব্যবহৃত হয়। কেন এইরূপ করা হয়, তাহা আমরা রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তি-সম্পন্ন করা বা একাভিমুখী করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেই বুঝিতে পারিব। যে বাল্‌ব্ রেডিও-ঢেউকে শক্তি-বর্দ্ধিত করিবে, সেই বাল্‌ব দুইদিকে প্রবাহিত রেডিও-ঢেউয়ের উভয় দিককেই সমভাবে

বর্দ্ধিত করিবে—তাহা না হইলে নিশ্চয়ই শব্দবিকৃতিদোষ ঘটিবে—এই জন্যই "খ"-এর উপর "প্রথম" বিশেষ ভোল্ট্ অর্পিত হয়, কারণ "খ"-এর ভোল্ট্ যদি এই বিশেষ ভোল্ট্ হইতে সমপরিমাণে বাড়িয়া বা কমিয়া যায় তবে "গ"-এর বিদ্যুতও সমপরিমাণে বাড়িবে বা কমিবে। এই বাল্‌বের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই—রেডিও বিদ্যুতের উভয় অংশকেই ইহা সমান চোখে দেখে; কাজেই এই "প্রথম" বিশেষ ভোল্টের ব্যবহার। কিন্তু যে বাল্‌ব্ রেডিও বিদ্যুতকে একাভিমুখী করিবে তাহার পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকা চাই; সে উভয় দিকে প্রবহমান রেডিও-বিদ্যুতের এক-দিকে প্রবাহিত অংশকেই শুধু বর্দ্ধিত করিবে, অন্যদিকে-প্রবাহিত অংশটিকে তেমন বর্দ্ধিত শক্তি করিবে না—কাজেই মোটের উপর রেডিও-বিদ্যুত-একাভিমুখী হইয়া যাইবে। এই জন্যই এই স্থলে "খ"-এর উপরে "দ্বিতীয়" বিশেষ ভোল্ট্‌টি ব্যবহৃত হয়। "খ"-এর ভোল্ট্ যদি এই বিশেষ ভোল্ট্ হইতে সমপরিমাণে বাড়িয়া বা কমিয়া যায়, তবে "গ"-এর বিদ্যুত সমপরিমাণে বাড়িবে বা কমিবে না। এক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে হইবে, অন্যক্ষেত্রে হ্রাস শুধু নাম মাত্র হইবে; কাজেই উভয়মুখী সম্পূর্ণ রেডিও-ঢেউয়ের শুধু একদিকের অংশ-অনুপাতেই "গ"-এর বিদ্যুতের শক্তি কমিবে বা বাড়িবে। এইরূপেই রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা হয় এবং এই জন্যই "দ্বিতীয়" বিশেষ ভোল্টের ব্যবহার।

রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা কথাটি আমরা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, রেডিও-বিদ্যুতের কম্পনসংখ্যা সেকেণ্ডে দেড় লক্ষ হইতে ত্রিশ লক্ষ বা আরও বেশী হইতে পারে—এই সমস্ত ঢেউয়ের বিস্তার উভয় দিকেই সমান—কাজেই আমরা দেখিয়াছি যে, টেলিফোনে এই বিদ্যুত গেলে—ইহার বিস্তার উভয় দিকেই সমান বলিয়া টেলিফোনের পর্দা একরকম নিশ্চলই থাকিবে; অথবা যদি উহা কাঁপেই, তবু উহার কম্পনসংখ্যা এত বেশী হইবে যে উহাতে কোন শব্দ শোনা যাইবে না। কাজেই রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করার উদ্দেশ্য দুইটি—(১) রেডিও-ঢেউয়ের একদিক্—হয় উপরের দিক (crest), নয় নীচের দিক্ (through) মুছিয়া ফেলিতে হইবে; এবং (২) অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ঢেউকে মিশাইয়া একটি ঢেউ-এ পরিণত করিতে হইবে।

ক্রীষ্ট্যালের বেলায় আমরা দেখিয়াছি যে ইহার একদিকে বিদ্যুত অতি সহজে যায়, অন্যদিকে যায় না। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক্ যে, একটি ঢেউয়ের উপরের দিকে (crest) ধনাত্মক এক ভোল্ট্ এবং নীচের দিকে (through) ঋণাত্মক এক ভোল্ট্। যখন ধনাত্মক বিদ্যুত আসিয়া ক্রীষ্ট্যালের গায়ে পড়িবে, তখন মনে করা যাক্ যে, বিশ মাইক্রো-র‍্যাম্‌পিয়ার্ (এইগুলি বিদ্যুত মাপিবার পরিমাপ, যেমন দূরত্ব—গজ ফুট্ বা ইঞ্চের সাহায্যে মাপে, অথবা সময় মাপে ঘণ্টা, সেকেণ্ড্ বা পল অনুপল দিয়া) বিদ্যুত প্রবাহিত হইবে; এই ক্রীষ্ট্যালের উপরে যখন ঋণাত্মক বিদ্যুত আসিয়া পড়িবে তখন হয় ত শুধু তিন মাইক্রো-র‍্যাম্‌পিয়ার্ বিদ্যুত এই ক্রীষ্ট্যালের মধ্য দিয়া যাইবে। কাজেই ক্রীষ্ট্যালের মধ্য দিয়া মোটের উপর সতের মাইক্রো-অ্যাম্‌পিয়ার্ বিদ্যুত প্রবাহিত হইল, এবং রেডিও-বিদ্যুত প্রকৃত পক্ষে একাভিমুখী হইয়া গেল। টেলিফোনের সঙ্গে একটি কন্‌ডেন্‌সার ব্যবহার করা হয়। (৩নং চিত্রের "ছ"-অংশ দেখুন)। একাভিমুখীকৃত রেডিও-বিদ্যুত আসিয়া কন্‌ডেন্‌সারে পড়িলে তবে টেলিফোনে একবার বিদ্যুত যাইবে—কন্‌ডেন্‌সারের এই ধর্ম্ম তাহার চরিত্রগত—ইহা তাহার "ক্যাপাসিটির" উপরে নির্ভর করে এবং এইরূপে অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রেডিও-ঢেউকে একটি ঢেউয়ে পরিণত করা হয়, তবেই আমরা কথা শুনি। টেলিফোনের সঙ্গে এই "কন্‌ডেন্‌সার" ব্যবহার না করিলেও হয়, সে সময়ে এই "কন্‌ডেন্‌সারের" কাজ টেলিফোনে ব্যবহৃত বিদ্যুতবাহী তারগুলিই করিয়া থাকে।

বাল্‌বের বেলাতে পদ্ধতিটি একটু ভিন্ন; কিন্তু উদ্দেশ্য একই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে "খ"-এর উপরে একটি ভোল্ট্ দিলে "গ"-এর বিদ্যুতের (৪নং চিত্র) শক্তি হঠাৎ বাড়িয়া যায় এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, কেন এই বিশেষ ভোল্ট্‌টি রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করার সময় বাল্‌বের "গ্রীড্" "খ"-তে ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ ভোল্ট্‌টির এই রকম বিশেষ গুণ যে, "খ"-এর ভোল্ট্ যদি ইহার চেয়ে সমপরিমাণে কমে বা বাড়ে, তবে "গ"-এর বিদ্যুতের পরিবর্ত্তন খুবই অসমান হইবে; কাজেই গড়-

পড়তায় দ্বিরাভিমুখী বিদ্যুত হইতে একাভিমুখী (যদিও সামান্য কম শক্তিশালী) বিদ্যুতই এই বাল্‌ব্ সাহায্যে সৃষ্ট হইবে। গ্রাহক-যন্ত্রে অন্যান্য যন্ত্রের সমাবেশে যে বাল্‌ব্ রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করিবে, সেই বাল্‌বে যাহাতে "খ"-এর উপর এই বিশেষ ভোল্‌টটি অর্পিত হয়, সেই ব্যবস্থাই করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমানে "গ্রীডের" সঙ্গে একটি "কন্‌ডেন্‌সার" ব্যবহার করা হয় এবং গ্রীড্‌কে একটি খুব সরু তার দিয়া মাটীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। (৫নং চিত্র দেখুন।) এই চিত্রের "ঙ"-অংশ একটি সরু তার, এবং "ণ" অংশ একটি কন্‌ডেন্‌সার। অন্যান্য অংশ বিষয়ে পরে বলিতেছি।

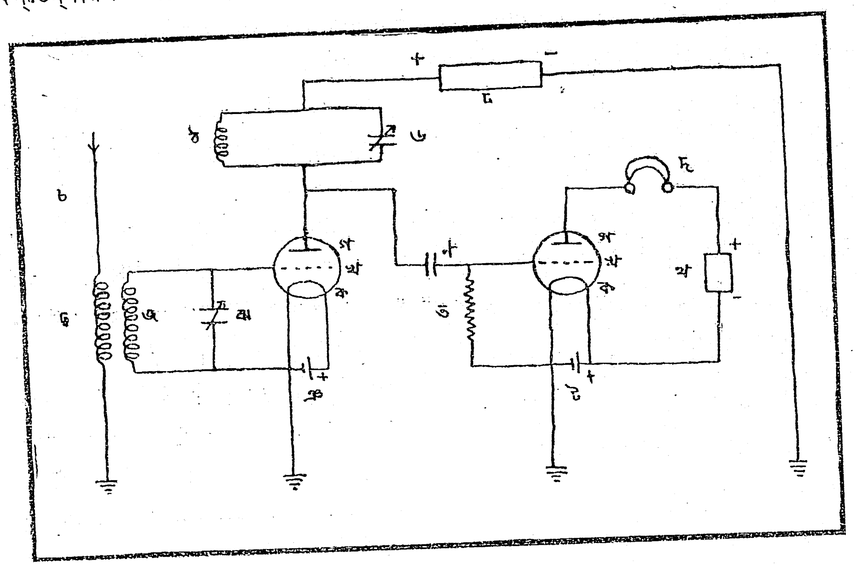

৫নং চিত্র

এই "গ্রীড্" কন্‌ডেন্‌সারের ফলে গ্রীডে শুধু দোলায়মান বিদ্যুতই প্রবাহিত হইতে পারে। মনে করা যাক্ যে, এই দোলায়মান বিদ্যুতের ঋণাত্মক অংশ আসিয়া গ্রীডের উপর পড়িয়াছে—"ক" হইতে যখন ইলেক্‌ট্রন্ বাহির হইয়া আসিবে তখন ইহাদের কিছু অংশ এই গ্রীডে আট্‌কা পড়িবে। এখন যদি দোলায়মান বিদ্যুতের ধনাত্মক অংশ আসিয়া গ্রীডে পৌঁছে, তাহা হইলে এই সঞ্চিত ইলেকট্রন্‌গুলির খানিকটা নষ্ট হইয়া যাইবে (কারণ, ইহারা বিপরীতধর্ম্মী বিদ্যুত)। তখন "ক" হইতে "খ" পর্য্যন্ত বিদ্যুত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে। এখন এই বিদ্যুত-প্রবাহ অর্থাৎ গ্রীডে ইলেক্‌ট্রন্ জমা—কাজেই, গ্রীড্ ক্রমে ক্রমে ঋণাত্মক বিদ্যুত-বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে এবং প্লেটের বিদ্যুতের শক্তি কমিয়া যাইবে। গ্রীডে বিদ্যুতের মাত্রা বেশী হইয়া পড়িলে ইহা সরু তারের সাহায্যে মাটীতে চলিয়া যাইবে।

কাজেই দেখা গেল যে এই রকম ব্যবস্থাতে দোলায়মান বিদ্যুতের ঋণাত্মক অংশটুকুই বেশী কার্য্যকরী ও একটার পর একটা বিদ্যুত আসিয়া গ্রীডের উপরে ঋণাত্মক বিদ্যুতের সৃষ্টি করে এবং এই বিদ্যুত বাড়িলে প্লেটের বিদ্যুত কমিয়া যায়। এইরূপে রেডিও-বিদ্যুতকে একাভিমুখী করা হয় এবং অনেকগুলি রেডিও-বিদ্যুত মিলিয়া একটি বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়।

৫নং চিত্রটি একটি সাধারণ বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের ছবি।

চ—বায়ুস্থ তার; ঠ, ছ, জ—ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স; ঝ, ঞ—পরিবর্ত্তনীয় কন্‌ডেন্‌সার; ক—ফিলামেণ্ট; খ—"গ্রিড্", গ—প্লেট। ঙ, ট—ছোট ব্যাটারী; চ, থ—বড় ব্যাটারী; ণ—গ্রিড্ কন্‌ডেন্‌সার; ত—মাইক্রোফোন তার; দ—টেলিফোন্ বা লাউড্ স্পীকার।

রেডিও ঢেউ চ-এর উপর পড়ে; ছ, জ ও ঝ সাহায্যে বায়ুস্থ তারকে সহধ্বনিত করা হয়; ক, খ, গ ও ঙ এবং ঠ, ড, ঢ সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুতের শক্তি-বর্দ্ধিত করা হয়। ণ, ত, ক, গ, ট, থ সাহায্যে ইহাকে একাভিমুখী করা হয়। পরে "দ" বিদ্যুতকে কথায় রূপ দেয়।

বার্ত্তাপ্রেরক-যন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি, বর্ত্তমানে এই যন্ত্রেও বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের মত বাল্‌ব্ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটি সহজ পন্থার কথা বলিতেছি। (৬নং চিত্র দেখুন।) ঝ—বায়ুস্থ তার; চ, ছ, জ—ইন্‌ডাকট্যান্স; ক, খ ও গ—বাল্‌বের তিনটি অংশ; ণ—পরিবর্ত্তনীয় কন্‌ডেন্‌সার। ঞ—কন্‌ডেন্‌সার। ঢ—লো-ফ্রিকোয়েন্সি ট্র্যান্‌স্‌ফরমার; ট—ছোট ব্যাটারী; ঠ—বড় ব্যাটারী; ত—মাইক্রোফোন।

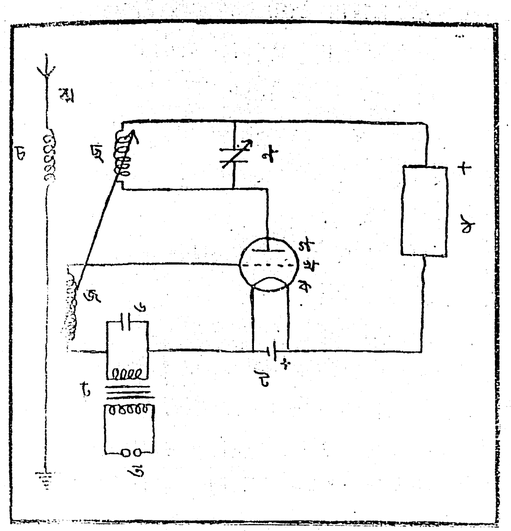

৬নং চিত্র

মাইক্রোফোনে কথাকে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। "ড"-এর ভিতর দিয়া বহুকম্পনযুক্ত বিদ্যুত যাইতে পারে। ইহা আছে বলিয়াই অবিচ্ছিন্ন ঢেউ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়। "ণ"কে পরিবর্ত্তন করিয়া রেডিও-ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। ইহার সাহায্যেই একটি বিশেষ বেতার প্রতিষ্ঠান হইতে একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউ প্রেরণ করা হয়। এস্থলেও আমাদিগকে ১নং চিত্রের স্প্রীং ও ওজনের কথা মনে করিতে হইবে।

ছ ও জ এমনভাবে সংযুক্ত যে একটিতে বিদ্যুতের পরিবর্ত্তন হইলে অন্যটিতেও অনুরূপ বিদ্যুতের পরিবর্ত্তন হয়। ইহার সাহায্যেই নিরবচ্ছিন্ন ঢেউ প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়। যেমন, মনে করা যাক্ যে কোন কারণে "জ"-তে ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়িয়া গেল; তাহাতে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, "স"-তে বেশী বিদ্যুত প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ "ছ"-তেও বিদ্যুতের মাত্রা বাড়িয়া গেল। "ছ"-এর বিদ্যুত বাড়িয়া বাড়িয়া এক সময়ে আবার কমিতে থাকিবে, কাজেই "জ"-এর বিদ্যুতও কমিতে থাকিবে—পরে এক সময়ে "গ"-এর বিদ্যুত একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে। পরেই আবার "গ"এর বিদ্যুত বিপরীত দিকে বাড়িয়া বাড়িয়া ইহার আবার কিছুক্ষণ পরে কমিতে কমিতে শূন্য হইয়া যাইবে। এইরূপে একটি দ্বিরাভিমুখী বিদ্যুতের সৃষ্টি হইবে। "ঘ"এর সাহায্যে এই বিদ্যুতের কম্পন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে এবং "চ"এর সাহায্যে এই বিদ্যুতকে "ঝ"-এর মধ্যে সঞ্চারিত করা হইবে। এইরূপে বায়ুস্থ তারে বার্ত্তাবাহী ঢেউয়ের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে ত, চ ও ড সাহায্যে এই বার্ত্তাবাহী ঢেউয়ের উপর কথার ঢেউ ফেলা হইবে। ফলে বাগাশ্রিত ঢেউয়ের সৃষ্টি হইল।

নিম্নের ৭নং ও ৮নং চিত্রে আমরা ঢেউগুলিকে আঁকিয়া দিতেছি।

৭নং চিত্রে—ক—বার্ত্তাবাহী ঢেউ; খ—শব্দের ঢেউ; গ—বাগাশ্রিত ঢেউ।

৮নং চিত্রে ক-অংশে রেডিও-ঢেউকে বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রে বর্দ্ধিতশক্তি করা হইতেছে; "খ"-অংশে—ইহাকে একাভিমুখী করা হইতেছে; গ-অংশে ইহাকে পুনরায় শক্তিবর্দ্ধিত করা হইতেছে।

রেডিও-ঢেউ কি করিয়া প্রেরিত ও গৃহীত হয়, সে সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এই সব কথা বলা হইলেও প্রকৃত

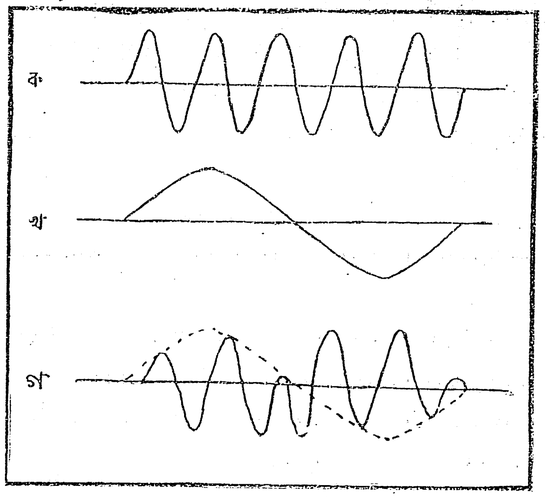

৭নং চিত্র

ব্যাপারটি আরও জটিল। আমরা এখানে কয়েকটি উপায়ের শুধু নাম বলিয়া যাইব মাত্র। প্রথমত—বার্ত্তা-প্রেরক-যন্ত্র। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, কি করিয়া রেডিও-ঢেউ প্রস্তুত করে? পূর্ব্বে—রেডিওর অতি শৈশবে—বিদ্যুতের স্পার্ক সাহায্যে রেডিও-বিদ্যুত প্রস্তুত হইত। (২নং

চিত্রের "ঢ"-অংশ)। এই ঢেউগুলির ধাবনমাত্রা অতি অল্প সময়েই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। কাজেই এই ঢেউগুলি

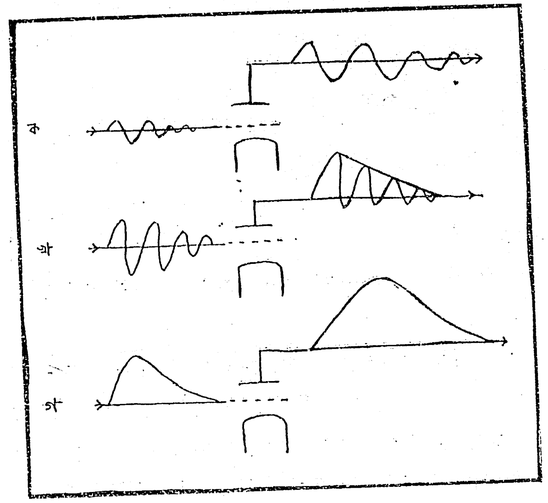

৮নং চিত্র

বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়। কিন্তু আজকাল অবিচ্ছিন্ন রেডিও-ঢেউই বার্ত্তাপ্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা নিম্নলিখিত উপায়গুলি দ্বারা উৎপাদিত হয়—(১) হাই-ফ্রিকোয়েন্সি অল্টারনেটার, (২) অসিলেটিং ইলেক্‌ট্রিক্ আর্ক; (৩) ভ্যাকুয়াম্ টিউব্। বহুশক্তিসম্পন্ন বড় ঢেউ প্রেরণে প্রথম উপায় ব্যবহৃত হয়; কম শক্তিসম্পন্ন ছোট ঢেউ প্রেরণে তৃতীয় উপায়টিই ভাল। পূর্ব্বে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। অবিচ্ছিন্ন রেডিও-ঢেউ কেন ভাল ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, (১) বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রকে সহধ্বনিত (tuned) খুব ভালভাবে করা যায় এবং (২) অল্পশক্তি ব্যয়ে বহুদূরে রেডিও-ঢেউ প্রেরণ করা যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাগাশ্রিত ঢেউ কি করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহা মাইক্রোফোন্ যন্ত্র সাহায্যে হয় এবং ইহার অনেক পন্থা আছে, যেমন—Heising system ; Microphone in the antenna circuit ; Microphone in the grid circuit. আমরা একটি উপায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তার পর—সাধারণত কোনও একটি বিশেষ বেতার প্রতিষ্ঠান হইতে একটি বিশেষ সংখ্যক পৌনঃপুন্য সম্বলিত ঢেউ প্রেরিত হয়। যেমন কলিকাতা হইতে যে ঢেউ প্রেরিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ৩৭০·৪ মিটার্ অর্থাৎ চারশত গজের কিছু বেশী। সুতরাং বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের বায়ুস্থ তারকে কি করিয়া সহধ্বনিত করা হয় সেইটাই প্রশ্ন। ইহাও জটিল। যে যে উপায়ে ইহা করা যায় তাহা এই :—(১) ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্ কয়েল্ মেথড্, (২) ভেরিওমিটার মেথড্ (৩) ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্ এণ্ড ক্যাপাসিটি কম্‌বাইণ্ড্ মেথড্ (৪) ডাবল্ সার্‌কিট্ ওয়্যারিং, (৫) ভেরিয়েব্‌ল্ কন্‌ডেন্‌সার্ ইন্ সিরিজ্ এণ্ড পেরালেল্ সার্‌কিট্‌স্। এ সম্বন্ধেও মূল তথ্য আমাদের বলা হইয়াছে।

আর একটা দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে—বার্ত্তাপ্রেরক-যন্ত্রের বায়ুস্থ তারে যে বিদ্যুত প্রবাহিত হয় তাহার পৌনঃপুন্য এমন বেশী হওয়া উচিত যাহাতে উহা হইতে শ্রবণযোগ্য কোনও শব্দ সৃষ্টি না হয়। কারণ, তাহা হইলে এই শব্দের প্রেরিত শব্দে দ্বন্দ্ব (interference) উপস্থিত হইবে। মানুষের কথার ঢেউয়ের পৌনঃপুন্য সাধারণত প্রতি সেকেণ্ডে আটশত। অবশ্য ইহা যে স্বরের কোমলতা ইত্যাদির উপরে নির্ভর করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তারপর, বার্ত্তাগ্রাহক-যন্ত্রের খুঁটিনাটির কথা। প্রথমে রেডিও-বিদ্যুত কমশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে ডিটেক্‌টারে পাঠাইবার পূর্ব্বে শক্তিবর্দ্ধিত (amplified) করিয়া লওয়া হয়। যে যন্ত্র সাহায্যে ইহা করা হয় তাহার নাম আমরা জানি। ইহা "বাল্‌ব্"। তিনটি বিভিন্ন উপায়ে (যেমন (১) রেজিষ্ট্যান্স্ কাপ্‌লিং, (২) ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্ কাপ্‌লিং ও (৩) ট্র্যান্‌সফর্‌মার্ কাপ্‌লিং) ইহা ব্যবহৃত হইয়া রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তিবর্দ্ধিত করিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়টিতে অনেক অসুবিধা থাকায় তৃতীয় উপায়টিই সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেডিও-ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য পাঁচশত মিটারের অর্থাৎ প্রায় পাঁচশত বিয়াল্লিশ গজের বেশী হইলে প্রথম উপায়টিই ব্যবহৃত হয়।

এই রকম ভাবে রেডিও-বিদ্যুতকে বর্দ্ধিতশক্তি করিতে অনেকগুলি ভ্যাকুয়াম্ টিউবের প্রয়োজন হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বর্ত্তমানে তিনটি টিউব্ দিয়াই এই কাজ সাধিত হয়। উপরন্তু তৃতীয় টিউব্‌টি ডিটেক্‌টারের কাজ করে।

আর্মষ্ট্রং রেডিও-বিদ্যুতকে বর্দ্ধিতশক্তি করার আর একটি উপায় (super-heterodyne amplification

উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই উপায়টিতে বায়ুস্থ তারের রেডিও-বিদ্যুতের বহুসংখ্যক কম্পনকে যন্ত্রসাহায্যে (Local generator or Oscillator) কমসংখ্যক কম্পনে পরিবর্ত্তিত করিয়া পরে শক্তিবর্দ্ধিত করা হয়। পরবর্ত্তীকালে এই উপায়কে আরও উন্নত করা হইয়াছে (Reflex arrangement and the use of an oscillator-detector tube)। তার পর ইহাকে ডিটেক্‌টারের ভিতর দিয়া পাঠাইয়া একাভিমুখী করিয়া লওয়া হয়। এই বিদ্যুতের শক্তিও যথেষ্ট নয়। কাজেই পুনরায় ইহাকে শক্তি-বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া দরকার। রেডিও-বিদ্যুতকে ডিটেক্‌টারে পাঠাইবার পূর্ব্বে শক্তিবর্দ্ধিত না করিলে—পরে তাহার শক্তিবর্দ্ধিত করা যায় না; তবু অনেক রকম উপায় অবলম্বন করিয়া রেডিও-বিদ্যুতকে ডিটেক্‌টারের ভিতর পাইয়া পরে শক্তিবর্দ্ধিত করা হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের তিনটি উপায় আছে—১। ট্রান্‌সফর্‌মার্ কাপ্‌লিং ২। রেজিষ্ট্যান্স্ কাপ্‌লিং ৩। ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স্ কাপ্‌লিং। দ্বিতীয় উপায়টিতে শব্দ বিকৃতি না ঘটিলেও ইহা দ্বারা বিদ্যুতের শক্তি বিশেষ বাড়ানো যায় না। প্রথম উপায়টিতে শব্দ-বিকৃতি দোষ আছে, কিন্তু তৃতীয় উপায়টিতে এই দোষের মাত্রা অনেক কম বলিয়া প্রথম উপায়টিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আধুনিক গবেষণার ফলে তিনটি ভ্যাকুয়াম্ টিউব্ দিয়াই রেডিও-বিদ্যুতকে বর্দ্ধিতশক্তি করা হয় এবং রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি র‍্যাম্‌প্লিফিকেশন্ (অর্থাৎ ডিটেক্‌টারে পাঠাইবার পূর্ব্বে ও পরে রেডিও-বিদ্যুতকে যে ভাবে বর্দ্ধিতশক্তি করা হয়)—এই দুইটা কার্য্যই একসঙ্গে সাধিত হয়। এই উপায়কে ইংরেজীতে Reflex circuit বলে। এই উপায়গুলির নাম—(১) Acme Reflex circuits ; (২) Harkness Reflex circuits ; (৩) Erla Reflex circuits (৪) Four tube Acme Reflex circuits, এবং (৫) Grimes Inverse duplex circuits.

রেডিও-বিদ্যুতকে শক্তিবর্দ্ধিত করার যন্ত্রে অনেক সময় অদ্ভুত ও বিকট শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় তাহা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যন্ত্রের দোষ। এই দোষের নাম "রি-জেনারেশন।" কিরূপে ঘটে তাহা সহজ বাংলাতে বলা শক্ত; তবে এটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, রেডিও-বিদ্যুত টেলিফোনে যাইবার পথে ইহার কিছু অংশ ফিরিয়া যায় এবং পুনরায় ভ্যাকুয়াম্ টিউবে পতিত হইয়াই এই দোষ ঘটায়। নানা উপায়ে এই অসুবিধা দূর করা যায়—যেমন :

১। Grid potentiometer for regeneration control. এই উপায়টি সহজসাধ্য বলিয়া অনেকে পছন্দ করেন।

২। Shunt resistance on transformers.

৩। High resistance transformer windings.

৪। Iron-core transformers.

৫। Tickler coil control of regeneration in superdyne receiver.

৬। Reversed capacity control of regeneration i. e., Neutrodyne receiver, এই উপায়টিও জনপ্রিয়। তাহা ছাড়া ইহার আর একটু সুবিধা এই যে, এই জাতীয় গ্রাহক-যন্ত্র কোন শক্তি (অর্থাৎ energy) বিকীরণ (radiate) করে না বলিয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাহক-যন্ত্রের সহিত কোনো দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না।

৭। Inductance coupling for regeneration control. এই উপায় অনেক উপায় হইতে সুবিধাজনক।

৮। Capacity for regeneration control. ফ্রান্সে এই উপায়ই বেশী ব্যবহৃত হয়।

৯। Balanced circuit for regeneration control.

১০। Rice circuit—ইহা নয়-চিহ্নিত উপায়েরই প্রকারান্তর।

এই সমস্ত "খটমট" ইংরেজী ও বাংলা কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, যদিও ঘরে বসিয়া "সুইস্" টিপিলেই আমরা বহুদূরের কথা, গান, বাজনা ইত্যাদি শুনিতে পারি, তবু এই যন্ত্রটির কলকব্জা খুবই জটিল এবং রেডিওকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে অনেক চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি ব্যয়িত করিতে হইয়াছে।

ভবিষ্যতে গবেষণা রেডিও যন্ত্রকে আরও কত দূর উন্নত মজবুত করিয়া তুলিবে তাহা বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকের বহুমুখী প্রতিভা রেডিওকে জগতের কাজে আরও কতদূর ব্যাপৃত করিয়া তুলিতে পারিবে, তাহাও অনিশ্চিত। কিন্তু ইহা ঠিক যে রেডিও যদি আবিষ্কৃত না হইত, তবে আমরা যে রকম পৃথিবীতে বর্ত্তমানে বসবাস করিতেছি, পৃথিবী ঠিক তেমন হইতে পারিত না এবং মানুষের সভ্যতাও অন্তত পক্ষে পাঁচশত বৎসর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। রেডিও আবিষ্কারকদের পক্ষে ইহা খুব গৌরবের কথাই বটে।

উপনিবেশ-আবদার

শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী

বিগত পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপীয় শক্তিনিচয় এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ছলে বলে কৌশলে এবং অস্ত্রবলে দেশের পর দেশ দখল করিয়া বহু জাতির সমাজ, ধর্ম্ম এবং অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। সম্প্রতি জার্ম্মানীও উপনিবেশের দাবী লইয়া জোর আন্দোলন সুরু করিয়াছে, জার্ম্মানীর কথা এই যে, ইউরোপের অন্যান্য শক্তি যখন নানা দেশে বিপুল উপনিবেশ স্থাপন করিয়া অজস্র কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, তখন জার্ম্মানী কেন উপনিবেশ অধিকার করিতে দাবী করিবে না? এখন ধরা যাক্, পৃথিবীর বর্ত্তমান্ অধিবাসীগণ ঐ সকল ইউরোপীয় শক্তিবর্গ দ্বারা কে কতটা পদানত হইয়াছে।

চার কোটী সত্তর লক্ষ ইংরেজ। এই ইংরেজ জাতি তাহাদের মাতৃভূমির একশত চল্লিশ গুণ বড় স্থান উপনিবেশ হিসাবে দখল করিয়া আছে।

চার কোটী ফরাসী তাহাদের জন্মভূমি ফ্রান্সের একুশ গুণ বড় দেশ রাজ্য উপনিবেশ হিসাবে শাসন করিতেছে।

আশী লক্ষ ডচ্ (হলাণ্ডবাসী) তাহাদের জন্মভূমির ষাট গুণ বড় উপনিবেশ হিসাবে শাসন করিতেছে।

আশী লক্ষ বেলজিয়ান্ তাহাদের দেশের আশী গুণ রাজ্য উপনিবেশ হিসাবে শাসন করিতেছে।

সত্তর লক্ষ পর্টুগিজ তাহাদের রাজ্যের ছাব্বিশ গুণ রাজ্য উপনিবেশস্বরূপ শাসন করিতেছে।

চার কোটী ত্রিশ লক্ষ ইতালীয়ান তাহাদের জন্মভূমির দশ গুণ বড় রাজ্য উপনিবেশরূপে শাসন করিতেছে।

সাত কোটী আশী লক্ষ জার্ম্মান—কিন্তু বলিতে গেলে তাহাদের কোন উপনিবেশ নাই।

জার্ম্মানীর এখন উপনিবেশ চাই। কেন না, সে কাঁচা মাল পাইতেছে না। তার শিল্পবাণিজ্যের অসুবিধা হইতেছে। কাজেই তাহাকে রাজ্যবিস্তার করিতেই হইবে।

ইতালী যেমন তিউনেশিয়া, জিবুতি এবং উত্তর আফ্রিকার আরও কতিপয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য দখল করিতে চায়, জার্ম্মানীও আফ্রিকায় এবং মধ্য ইউরোপে তেমনি রাজ্য বিস্তার করিতে চাহিতেছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পূর্ব্বে আফ্রিকায় ক্যামারুন প্রভৃতি রাজ্য জার্ম্মানীর দখলে ছিল; তারপর সবই গিয়াছে, এখন আবার সবই চাই, কিন্তু দেয় কে?

প্রায় আঠারো লক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ধোঁকাবাজীতে পড়িয়া চেকোশ্লাভ-রা জার্ম্মানীকে আপনাদের রাজ্য ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। এখন তাহার ইউক্রেনিয়া চাই, কেন না শস্য-সম্ভারে ও খনিজসম্পদে ইউক্রেনিয়া সমৃদ্ধিশালী। অপর দিকে জুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে জার্ম্মানী লালায়িত। ইতালী আবিসিনিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াও ক্ষান্ত নহে, এখন ফরাসী-সোমালিল্যাণ্ড, তিউনেসিয়া এবং পারে ত ব্রিটিশ-সোমালিল্যাণ্ড, এমন কি মিশর রাজ্য আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত নহে।

ইউরোপের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয় জাতি ভারত মহাসাগরস্থিত বহু দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়াছে, প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপপুঞ্জও ইউরোপীয় শক্তিসমূহের কবলে পড়িয়া আছে।

অন্য দিকে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দখল পাইয়াও সুখী নয়। এখন চীন সাম্রাজ্য দখল করিতে চায়। ইংরেজ যেমন পঁয়ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর দেশ ভারতবর্ষ দখল করিয়া নির্ব্বিবাদে শাসন করিতেছে, তেমনি জাপানও চল্লিশ কোটী চীনার বিরাট দেশ অধিকার আনিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

এই কয় শতাব্দীর ভিতরে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ পৃথিবীর নানা দেশের জনসাধারণের কি পরিমাণ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে প্রায় ধ্বংস করিয়াছে, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগের রাজ্য, ধন-সম্পত্তি সকলই কাড়িয়া লইয়াছে, ভারতবাসীর ন্যায় প্রাচীন সুসভ্য জাতিকে অসভ্যতার পথে চালিত করিয়াছে, এশিয়ার যে দুই-একটি দেশ নিজেদের সীমাবদ্ধ ধনসম্পদ লইয়া বাস করিতেছে, ইতালী ও জার্ম্মানী তাহাদেরও ধন-সম্পদ লুঠ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

কথাটা হইতেছে এই: কার ধনে কে পোদ্দারী করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা প্রকার মারণ অস্ত্র আবিষ্কার করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ আজ পৃথিবীর উপরে দানবীয় লীলা প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। আবিসিনিয়ায় ইতালী যে বর্ব্বরতা দেখাইয়াছে, সুসভ্য জার্ম্মানীও মধ্য-ইউরোপে, এমন কি, নিজেদের দেশেই তাহা দেখাইতেছে।

ইহারাই আজ ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিতে কিছুমাত্র শঙ্কাবোধ করিতেছে না। অস্ত্রবলে বলীয়ান এই সকল জাতি আজ যে নিষ্ঠুরতা লইয়া দেশের পর দেশ দখল করিতেছে, তাহাদিগকে বাধা দিবার মতন শক্তি কোন প্রাচীন জাতিরই নাই।

পৃথিবীর দুইটি পুরাতন সভ্যজাতি এবং দুইটি রত্নপ্রসবিনী দেশ—ভারতবর্ষ ও চীন, হিন্দুজাতি ও চৈনিকজাতি দুরাগ্রস্ত বৃদ্ধের ন্যায় আজ অকর্ম্মণ্য। হিন্দুস্থানে হিন্দু আজ নন্-মহমেডান। স্বাধীন হওয়া দূরের কথা—আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতিকরা এই প্রাচীন সুসভ্য জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতেও কাতর নহে। হিন্দু বলিয়া তাহাদের পরিচয় লোপ পাইতেছে।

ভারতের সমৃদ্ধিতে ইংরেজ ধনী। ভারতের ধনরত্ন কাঁচা মাল এবং অগণিত লোকবলে ইংরেজ আজ পৃথিবীতে প্রথমশ্রেণীর শক্তিশালী রাজ্য। আর সাতাশ কোটী হিন্দু গোলামী করার সৌভাগ্যকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। জাপানও আজ লোলুপ দৃষ্টিতে ভারতের দিকে চাহিয়া আছে, আজ তাহারা প্রায় ব্রহ্ম-সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ-চীন জয় করিতে পারিলেই তাহারা একবারে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং অনায়াসে বঙ্গসাগরের তীরস্থ প্রসিদ্ধ বন্দর রেঙ্গুন ও চট্টগ্রাম দখল করিতে চেষ্টা করিবে। ভারতে উপনিবেশের দাবী লইয়া যদি জাপান ব্রহ্মসীমান্ত দিয়া অগ্রসর হয়, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

জার্ম্মানী ও ইতালী যদি একযোগে মধ্য-ইউরোপ দিয়া এসিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হয় তাহা হইলে এমন শক্তি এশিয়ার নাই যে তাহাদের গতিরোধ করে। ইংরেজ যদি পেলেস্তাইনে স্বাধীন আরব রাজ্য ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলেও জার্ম্মানীর উপনিবেশ-ক্ষুধার নিকটে আরবগণ কতক্ষণ টিকিতে পারিবে?

আমাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি; আজ পৃথিবীর যে-কোন শক্তিই আমাদিগকে পদানত করিতে পারে। আমরা রাজ্যরক্ষার উপযোগী কোন শক্তিই অর্জ্জন করিবার অভিলাষ করি নাই। আমরা নির্বীর্য্য অজগর সর্পের ন্যায় বিশাল দেহ লইয়া হিমালয়ের প্রান্তদেশে পড়িয়া আছি। আজ যদি ইংরেজ সরিয়া যায়, ক্ষুদ্র আফ্‌গানিস্তানও আজ অস্ত্রবলে ও শক্তিবলে ভারতবর্ষ দখল করিতে পারে। ডজন ডজন কলম লইয়া এবং দিস্তা দিস্তা কাগজের দ্বারা আমরা ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে পারিব না! বোমা ও গ্যাস, তরবারি ও বন্দুকের নিকটে আমাদিগের অবনত হইতে কতক্ষণ লাগিবে? কাজেই পৃথিবীর শ্বেত জাতি-সমূহের কোন দাবীই মিটাইতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। এই বৈষ্ণবের দেশে আমরা নীরবে শ্বেতজাতির পদভার মস্তকে তুলিয়া লইব।

জার্ম্মানী বা ইতালীর উপনিবেশের দাবী আজ বড় সমস্যা। এই দাবী হইতেই যুদ্ধ বাধিবে, নতুবা ইংরেজকে ও ফরাসীকে তাহার বহু রাজ্য বিনাযুদ্ধে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অবশ্য ভারতীয় উপনিবেশ রক্ষার জন্য ইংরেজ প্রাণপণ করিবে। যদি কোন রাখালকে ত্রিশকোটী ভেড়ার পাল রক্ষা করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে গুটি কতক নেকড়ে বাঘই ভেড়ার দলকে নিধন করিতে পারে।

আজ এই 'দাবী'র বহর দেখিয়াও যদি ভারতীয় হিন্দুরা ঘুমাইয়া থাকিতে চায়, তবে তাহাদের নিশ্চিহ্ন হইবার দিন কত দূরে আছে তাহারই প্রশ্ন ওঠে নাকি?

৩রা জুলাই

শ্রীজনরঞ্জন রায়

এক ফোঁটা ফেল—এক ফোঁটা। এখনও যদি তোমার চোখে জল থাকে তবে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করো বাঙালী। আজ ৩রা জুলাই[১]। আজ সিরাজের স্মৃতি-তর্পণের দিন। বাঙলার শেষ স্বাধীন অধীশ্বরের রাজমুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইয়াছিল এই দিনে। ১৮২ বৎসর পূর্ব্বে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ১৭৫৭, ৩রা জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কে করিল, কেন করিল তাহা জানিতে চাও? কিন্তু সে কথা জানিয়া তোমার কি লাভ?

"যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে
পলাশির রণ-রক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
কহিবে, স্মরিবে, নাহি ভাবিবে অন্তরে,
কল্পনে! সে কথা মিছে কহ কি কারণ?"

—'পলাশির যুদ্ধ,' নবীন সেন

হে দুর্ভাগা বাঙালী, তুমি এই জানিয়া রাখ যে, সিরাজ ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা বীর যোদ্ধা যুবক। সুজলা সুফলা বাঙলার রসশোষণোন্মুখ ফিরিঙ্গী বণিকদের যমস্বরূপ ছিলেন তিনি। আলিবর্দ্দীর শেষ উপদেশ, বিশেষ করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে তাঁহাকে অবহিত করিয়াছিল[২]। আর এই ইংরেজবণিক ও জগৎশেঠের স্বার্থে আঘাত দেওয়ায় সিরাজকে মস্তক দান করিতে হইয়াছিল[৩] —ইহাই ইতিহাস বলে। যদিও হত্যা ব্যাপারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎ শেঠকে কোথাও পাওয়া যায় না।

ইতিহাস বুঝি কখনও কখনও ভুলিয়া এক-আধটা সত্য কথা বলে। নিজের দিকে ঝোল টানিয়া কত ইতিহাস কত সময়ে সত্য ঘটনাকে মসীময় করিয়া দিয়াছে। নিজেকে মহৎ সাজাইতে গিয়া প্রায়ই অন্যকে হেয় ঘৃণিত প্রতিপন্ন করিয়াছে। শত্রুকে পাপের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে প্রচার করিতে সকল দেশে সকল সময়ে একই প্রকার আগ্রহ দেখা যায়। বিশেষত পরাস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অকথ্য কুকথা বলিবার বাধা কোথায়? কারণ, সেখানে আপত্তি করিবার কেহই নাই।

পরাজিত শত্রু সিরাজের চরিত্রেও এইরূপ মসীলেপন করা হইয়াছিল। অনায়াসে তিনি গর্ভবতী নারীদের পেট কাটিয়া দিয়া আনন্দলাভ করিতেন। নদীবক্ষে লোক পরিপূর্ণ নৌকা ডুবাইয়া দিয়া অট্টহাস্য করিতেন। কুল-নারীদের তাঁহার ভয়ে সতীত্ব রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। এইসব গল্পের রচয়িতা জনৈক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর। এই কর্ম্মচারীটি নীচ স্বভাব ও মাতাল ছিল। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ইংলণ্ড হইতে তাহার অসচ্চরিত্রের জবাবদিহি চাহেন। সে তখন নিজের সব দোষ সিরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া সাধু সাজে[৪]। আর এই সাধুটির লেখায় বিশ্বাস করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকলেই সিরাজকে শয়তানের মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিল। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। অন্ধকূপহত্যার কাহিনীও যে ঐতিহাসিকগণের করিত একটি অসম্ভব মিথ্যা রটনা তাহাও ভালভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

সুচতুর ক্লাইব জানিতেন যে, ২৩শে জুন যে যুদ্ধ হইয়া তাহা অভিনয় মাত্র[৫]। মীরজাফর এখনও ইং

(১) মুতক্ষীরণের মতে ১৭৫৭ সালের ৩রা জুলাই, কিন্তু স্ক্রাফ্‌টনের মতে তাহার পরদিন সিরাজের হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(২) "ইংরেজদিগকে দমন করিতে পারিলে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা আর মাথা তুলিয়া উৎপাত করিতে পারিবে না। ইংরেজদিগকে কিছুতেই দুর্গ নির্ম্মাণ বা সেনা সংগ্রহ করিবার প্রশ্রয় দিও না;—যদি দাও, এদেশ আর তোমার থাকিবে না"—*Ive's Journal.*

(৩) "Sirajudoula was put to death at the instigation of the English chiefs and Jagat Set"—*Riyaz-us-Salateen.*

(৪) Hill's Bengal in 1756-57.

(৫) "Plassy can never be considered a great battle."—*Decisive Battles of India*: Col. Malleson. "It was not a fair fight."—*Ibid,*

করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা—বাঙলার কি অপরিসীম লজ্জার কথা! পলাশি যুদ্ধের পর মীরজাফর এক অপূর্ব্ব 'ভেট' লইয়া ক্লাইবের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সিরাজের অন্তঃপুর-চারিণীগণকে তিনি ক্লাইবকে উপহার প্রেরণে ব্যস্ত[৬]—বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর যে তাঁহার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে তাহাও ক্লাইভ নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, মীরমদন মরিয়াছে বটে কিন্তু সিরাজের অন্যতম বিশ্বাসী সেনাপতি মোহনলাল তখনও জীবিত আছে। আর সিরাজ যদি এখনও মঁসিয় লা'র সহিত মিলিত হইতে পারেন তাহা হইলেও দারুণ অশান্তির কথা।

ক্লাইবের তাড়নায় মীরজাফর যখন সিরাজকে কারারুদ্ধ করিতে রাজধানীতে আসিলেন তখন সিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। প্রাণভয়ে নহে—তাহা করিলে তিনি ভিন্ন পথে যাইতেন। তিনি হৃতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টায় বাহির হইলেন। সঙ্গে পতিপ্রাণা বেগম লুৎফ্-উন্‌নিসা ও জনৈক বিশ্বাসী অনুচর মাত্র। তিনি নৌকাযোগে গোদাগাড়ীর পাদদেশবাহিনী মহানন্দা হইয়া উত্তর দিকে চলিলেন। মঁসিয় লা'কে পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল। তাঁহার সৈন্যসহ সিরাজের বিহারে যাওয়ার সংকল্প ছিল। বিহারের শাসনভারপ্রাপ্ত রাজা রামনারায়ণের সেনাদলকে পাটনা হইতে লইয়া পুনর্ব্বার বঙ্গ জয় করিবেন এই আশায় তিনি বহির্গত হইলেন[৭]। তিনি কালিন্দী দিয়া নাজিরপুরের মোহনায় আসিলেন। সেখান দিয়া বড় গঙ্গায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জলশূন্য নাজিরপুরের নদী-মুখে তাঁহার নৌকা আটকাইয়া গেল[৮]। সেই স্থানে বরহাল নামক গ্রাম। সিরাজের বজরার মাঝি-মাল্লারা নদী হইতে বাহির হইবার পথ চারিদিকে খোঁজ করিতে লাগিল। স্বয়ং সিরাজও গ্রামের মধ্যে গিয়া আহার্য্যের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজমহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সিরাজের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত হইয়াছে। মীর দাউদ রাজমহলের ফৌজদার। সেখানকার সেনাধ্যক্ষ মীরকাশিম। এরূপ একটা বজরা এখানে আসিয়া আটকাইল। তাহাতে এক বেগমসহ অপূর্ব্ব সুন্দর এক যুবক। লোকপরম্পরামুখে মীরকাশিম এই সংবাদ পাইল। ভোজনরত সিরাজকে লুৎফ্-উন্‌নিসা সহ মীরকাশিম বন্দী করিল। ভাগ্যের কি পরিহাস! মঁসিয় লা তখন ঐ স্থান হইতে পনের ক্রোশের মধ্যে ছিলেন। সসৈন্যে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতেন[৯]। মীরজাফর-পুত্র মীরণ সেখান হইতে সিরাজকে বাঁধিয়া আনিল।

২৯শে জুন ক্লাইব মুর্শিদাবাদে আসিয়াছেন এবং মীরজাফরকে নবাব বলিয়া কুর্ণিশ করিয়াছেন। ক্লাইব না আসা পর্য্যন্ত মীরজাফর সিংহাসনে বসেন নাই। ক্লাইবও রক্ষীদলের সহিত বিশেষ সাবধানে আসিলেন, সঙ্গে দুই শত গোরা সৈন্য ও পাঁচ শত ভারতীয় সিপাহী ছিল। ক্লাইব নিজে বলিয়াছেন যে, এক মুর্শিদাবাদ শহরে সেদিন যত লোক জড় হইয়াছিল তাহারা ইচ্ছা করিলে ইট লাঠি দ্বারাই ইংরেজদের ধ্বংস করিতে পারিত[১০]। কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। কারণ পলাশীর আম্রশাখার পশ্চাতে ভারতে মুসলমানের সৌভাগ্য-সূর্য্য তৎপূর্ব্বে ২৩শে জুন তারিখে চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে[১১]। আর সে সূর্য্য উঠিবে না।

মোহনলালকেও ভগবানগোলার পথে দন্দী করা হইল। তিনি সিরাজের সন্ধানে ঐ পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

(৬) "Many of Suraj-a-Dowla's women···had been offerd to Clive by Mirjaffier immediately after the battle of Plassy."—*Travels of Hindu.*

(৭) "It was his intention to escape to Mr. Law and with him to Patna, the Governor of which province was a faithful servant of the family."—*Orme, ii.*

(৮) "Sirajudowla was obliged to stop at Bahral as the Nazirpur mouth was found closed."—*Beveridge.*

(৯) M. Law and his party came down as far as Rajmehal to Surajuddaula's assistance and were within three hour's march when he was taken.—*Clive's Letter*, 26-7-1757.

(১০) "···if they had had an inclination to have destroyed the Europeans, they could have done it with sticks and stone."—*Clive's Evidence.*

(১১) "This is the battle in which India was lost for Islam."—*Trikh-i-Mansuri.*

মীরজাফরের সেনাধ্যক্ষ রায়দুর্ল্লভ তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিল[১২]।

সিরাজকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। এইবার এই বিয়োগান্ত ঘটনার যবনিকাপাত হইবে। ঐতিহাসিকগণ এখানে অতি সাবধানী। প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক সকলেই ইংরেজ। তাঁহারা ক্লাইবের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগিতে দেন নাই। এমন কি, ক্লাইবের গাধা মীরজাফরের[১৩] কাঁধটা যেন আলগোছে ছুঁইয়া সতেরো বছরের ছোকরা মীরণের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইলেন। 'মুতক্ষরীণ' লেখকও ইংরেজ কোম্পানীর অর্থভোগী। সুতরাং বিচার করিয়া ঠিক ঘটনাটি বাহির করিতে হইবে। যেহেতু কেহই নিরপেক্ষ নহে সন্দেহ হয়।

মীরজাফরের নিকট সিরাজ জীবন ভিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কৃতঘ্ন মীরজাফর তাহা দিতে পারেন নাই, ইহা স্বাভাবিক। জাফ্‌রাগঞ্জের প্রাসাদে সিরাজ অবরুদ্ধ হইলেন। দেশের লোক না-কি তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিল—বিশেষত সিপাহীরা[১৪]। সিরাজকে হত্যা করিতে কাহাকেও সম্মত করা অসম্ভব হইল। কিন্তু অর্থলোভে এই অধম কার্য্য করিতে রাজী হইল এমন একটা লোক যে মীরজাফরের মতই চিরদিন সিরাজের মাতামহ ও মাতামহীর দ্বারা প্রতিপালিত। পাপাত্মা কলির অবতার মহম্মদী বেগ খড়্গ উত্তোলন করিয়াছে। সিরাজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—স্তব্ধ হইয়া বলিলেন, একটু জল দাও, উজু করিয়া নমাজ করিব। কিন্তু মহম্মদী বেগ অপেক্ষা করিতে পারিল না। নিরস্ত্র অসহায় অন্নদাতা বীর যুবকের স্কন্ধে সজোরে খড়্গ বসাইয়া দিল। মস্তক ছিন্ন হইল না। আবার—আবার আঘাত করিল। হোসেন কুলী তোমার প্রতিহিংসা মিটিল—মিটিল কি?—যথেষ্ট—যথেষ্ট। আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

তারপর কি হইল? যাঁহার রচনা অদ্য আমাদের প্রধান অবলম্বন, সিরাজদ্দৌলার সেই পরম দরদী জীবনচরিতকার অক্ষয়কুমারের ভাষাতেই বলি—"তাহার পর কি হইল? মুর্শিদাবাদের নরনারী এই রাজহত্যার আকস্মিক সংবাদে হাহাকার করিয়া উঠিল। ** বিদ্রোহীদল তখন বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়া সিরাজের ক্ষতবিক্ষত শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়া নগরপ্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছিল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সিরাজ-জননী হাহাকার করিতে করিতে লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া রাজপথে আসিয়া ধূলি বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শববাহক হস্তী সহসা রাজপথে বসিয়া পড়িল; স্নেহময়ী জননী সন্তানের মাংসপিণ্ড বুকে ধরিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন।"

মুর্শিদাবাদের খুশবাগে পিতামহ আলিবর্দ্দীর সমাধির পাশে তাঁহার আদরের দৌহিত্রের সমাধি হইল। স্বামীর আটত্রিশ বৎসর কাল বিরহ সহ্য করিয়া লুৎফ্-উন্-নিসা ১৭৯০ সালে নবেম্বর মাসে দেহত্যাগ করেন। প্রবাদ এই যে, সিরাজের সমাধিস্থল মার্জ্জনা করিয়া সজ্জিত করিবার কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। স্বামীর সমাধি পার্শ্বেই তিনি সমাহিত হইলেন।

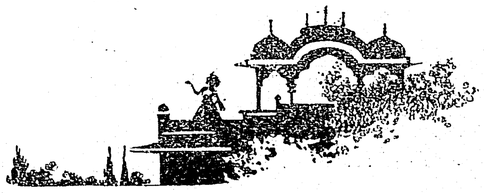

(১২) "The Diwan Mohun Lal had before this been seized at Moorshidabad and his effects and life were taken by Doolubram."—*Scott's History of Bengal.*

(১৩) "A very few months after Meer Jaffier's accession, he was nick-named, by one of the wits of the Court—'Col. Clive's ass' and retained the title till his death."—*Stuarts History of Bengal.*

(১৪) "It is said that several jammadars, as he passed their quarters, were so penetrated with grief and anger, as to prepare to rescue him, but were prevented by their superiors."—*Ibid.*

"Meer Jaffier apologised for his conduct, by saying that he (Sirajadowla) had raised a mutiny among the troops."—*First Report of Clive,*

কৃষি

শ্রীসুরপতি জানা

আমাদের দেশ হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্যই বা এতদিনে হয়েছে কি? শোনা যায় পাঞ্জাবে নাকি অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায়, সেখানে কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রতি হাজার অধিবাসীর উপর সরকারী খরচ হয়েছে মাত্র ৭৯৲ উনাশী টাকা, আর ইংলণ্ড আমেরিকা শিল্পপ্রধান হলেও ইংলণ্ডে প্রতিহাজার অধিবাসীর উপর ৯৬০৲ টাকা এবং আমেরিকায় ১০২০৲ টাকা সেই সেই দেশের সরকার খরচ করেন।

সেরূপ সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় এবং দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও কতক কৃষক জনসাধারণের অজ্ঞতার দরুণ আমাদিগকে তাই প্রাক্‌সভ্যযুগের কৃষি পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ২০০ বছর পূর্ব্বে এদেশের অধিবাসীরা শুধু যে কৃষির উপর নির্ভর করত তা নয়। এদেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এদেশের অভাব মিটিয়ে বিভিন্ন দেশ বিদেশে চালান যেত। কিন্তু বিদেশী প্রতিযোগিতায় এদেশে শিল্প আজ ধ্বংস প্রাপ্ত। তাই মাটী ছাড়া উপায় নাই দেখে এদেশের লোকেরা কৃষিকার্য্যের দিকে কিরূপ ঝোঁক দিয়াছে তার হিসাব দেখ্‌লেই আপনারা বুঝ্‌তে পারবেন।

১৮৮১ সালে ভারতের লোক সংখ্যার শতকরা ৫৮ জন কৃষিকর্ম্মের উপর নির্ভর করত। ১৯২১ সালে অনুপাত ছিল শতকরা ৭১·৬; ১৯২৭ সালে রয়াল কমিশনের হিসাবে হল শতকরা ৭৩·৯। যে দেশের ১০০ জনের ৭৪ জন কৃষক, যারা এই প্রচণ্ড রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতকে অগ্রাহ্য করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাঠে খাটে, সেই সমস্ত কৃষক পরিবার কি ভাবে দৈন্য ও অভাব অনটনের মাঝখানে তাদের দিনগুলি কাটায়, তার একটা সরকারী হিসাব আপনারা জেনে রাখুন। যুদ্ধের পর থেকে ভারতের প্রত্যেক কৃষক পরিবার বছরে গড়ে ২২৲ টাকা মূল্যের শস্য উৎপাদন করে। তার সিকি যায় ট্যাক্স খাজনায় ও দেনার সুদে, আর সিকি যায় শস্য উৎপাদন খরচে। কাজেই মাসে বাকী ১১৲ টাকায় প্রতি মাসে গড়ে পড়ে ৸৵৮ পাই।

প্রত্যেক কৃষক পরিবারের গড়ে লোকসংখ্যা প্রায় ৬ জন; প্রতিমাসে এই ৸৵৮ পাই আয়ে কৃষক পরিবারের ছয় জন লোকের খোরাক আর পোষাক চালাতে হয়।

আবার দেখুন কৃষক পরিবারের এই ছয় জনের ঋণের ভার ১৮৭৲ টাকা অর্থাৎ মাথাপিছু ৩১ টাকার উপর; সারা ভারতের কৃষক পরিবারের মোট ১৩শত কোটী টাকা ঋণ। এই অবস্থায় এই দেশ থেকে প্রতি বছর ৬৮ কোটী টাকা বিলাতে চলে যায়। এটা সারা ভারতের কৃষকদের প্রায় দুমাসের আয়। এক কালে সত্যই যে এই বাংলা দেশ সুজলা সুফলা ছিল, ইতিহাসে তার বহু নজির আছে। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক বার্নিয়ার সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গদেশের উর্ব্বরতা, ধন সম্পদ ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বলেছেন—

"প্রাকৃতিক সম্পদে মিশরই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই কথাই চিরকাল প্রচার হয়। কিন্তু আমি মনে করি, সে গৌরব এই বঙ্গদেশের প্রাপ্য। এই দেশে এত প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় যে দেশের অভাব পুরণ করিয়াও বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিবার মত শস্য বহু পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। সুস্বাদু বিস্কুট তৈয়ারির জন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে গমও উৎপন্ন হয়। জিনিষ এত সুলভ যে অতি সামান্য ব্যয়ে লোকেরা প্রত্যহ তিন চারি প্রকার ব্যঞ্জন সহ অন্ন ঘৃত প্রভৃতি আহার করিতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে মানুষের জীবন যাত্রার যাহা কিছু প্রয়োজন বঙ্গদেশে সবারই প্রাচুর্য্য রহিয়াছে।"

কিন্তু আজ সেই দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণসমূহ আলোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে এ দেশের প্রধান শিল্প কৃষিকার্য্যকে প্রকৃতির উপর অতি মাত্রায় নির্ভর করিতে হয়। বাংলা নদীমাতৃক দেশ, ইহার নদনদীর গতিবিধি যদি সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়, তা হলে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে; বাংলার কৃষককুলকে বর্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হয় না। এজন্য যাহাতে কৃষিকে বৃষ্টির উপর একান্ত নির্ভর না করিতে হয় তজ্জন্য অতীত কালের

শাসকগণ খাল খননের ব্যবস্থা করিতেন। পর্য্যটক বার্ণিয়ার বলেন যে তাঁহার ভ্রমণ কালে রাজমহল হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার দুইধারে তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত খাল দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যবস্থার লোপ পাইয়াছে। অন্যদিকে কৃষককুল আর্থিক দুর্গতিবশতঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে অক্ষম। পুনঃ পুনঃ কর্ষিত জমির উর্ব্বরতাশক্তি উপযুক্ত সার অভাবে বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কৃষকেরা অজ্ঞতাবশতঃ নূতন প্রণালীতে শস্য বপন করিতেও অক্ষম। অথচ ক্রমবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যার জীবনধারণের জন্য একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

নদীমাতৃক বাংলা দেশের কৃষিকার্য্যের জন্য যদি নদনদীর গতি সুচারু রূপে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা দেশের প্রচুর অনিষ্ট সাধন হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে পদ্মার হার্ডিং পুলের কথা উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর পূর্ব্বে এই পুল রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট এককোটি টাকার অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। ঐ টাকা যদি ঐরূপে ব্যয় না করিয়া গবর্ণমেণ্ট পদ্মার যে সকল শাখা নদী মজিয়া গিয়াছে তাহার উদ্ধার সাধন এবং নূতন খালসমূহ খননে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে মনে হয় পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা আজ এরূপ হইত না। কৃষির অবস্থা ত ভালই হইত, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার গতি নিয়ন্ত্রিত হইত।

বাংলার কৃষিকার্য্যের এই দুর্গতির জন্য কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিয়া কাজ নাই, আমাদের দেশের লোক ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ আমাদের দেশের কৃষক পরিবারের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্যের জন্য ছয় মাস খাটে, আর ছয় মাস বেকার বসে বসে কাটায়। এই ছয় মাস তারা কুটীরশিল্পের দিকে নজর দিলে সারা বছরে তাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করেও অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত হতো। বিহার ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি দেশে সেখানকার কৃষকেরা একই মাঠে বছর বছর ২।৩টা ফসল উঠায়। কিন্তু আমাদের দেশে বছরে একটা ফসল—এক ধান্য ছাড়া অন্য কোন ফসল উঠাইবার আমরা চেষ্টা করি না। এর মূলে আমাদের কৃষককুলের অবহেলা ও অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছুই নাই। সাধারণতঃ আমাদের দেশের অগভীর মাঠে অর্থাৎ যে মাঠে আমাদের সরুধানের চাষ আবাদ হয়, তাহাতে কলাই দিলে প্রচুর পরিমাণে কলাই উৎপন্ন হইতে পারে। তবে কলাই চাষের মজা হচ্ছে এই যে আপাততঃ ২।৩ বছর তেমন ভাল ফসল উৎপন্ন হবে না। কেবল বীজ সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কিছুই চলিবে না। ২।৩ বছর প্রত্যেক গৃহস্থকে ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ সুঁটী জাতীয় উদ্ভিদ একপ্রকার সার মাটীতে রেখে যায়। ২।৩ বছর ক্রমাগত সে সার জমিতে সংগৃহীত হলে, তবে ঐ কলাই জাতীয় জিনিষ ভাল উৎপন্ন হয়। আর তা ছাড়া কলাই জাতীয় জিনিষ জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, এই জন্য যে জমিতে কলাই হয়, সে জমিতে ধানও ভাল হয়। এইরূপ একটা ভাল জিনিষ আমাদের দেশের লোক হেলায় অগ্রাহ্য করছে। আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক বাড়ীতে ধান রাখবার জন্য মরাই আছে, সেইরূপ কলাই চাষ করিলে আমাদের দেশে প্রত্যেকের বাড়ীতে মরাই বাঁধতে হবে। কলাই যেমন মানুষে খেয়ে বাঁচবে, তেমনি গৃহপালিত পশু গরুছাগলও খেয়ে বাঁচবে।

দেশে আজ দুধের অভাব কেন? গরু না খেতে পেলে কোথা থেকে দুধ দেবে। যে গাভী প্রতিদিন এক সের দুধ দেয়, সে প্রতিদিন একসের কলাই সিদ্ধ খেলে দৈনিক দু সের দুধ দেবে। এটা কি কম দুঃখের কথা, যে কলাইর উপর গরু ও মানুষের স্বাস্থ্যসুখ নির্ভর করছে, সেই কলাই চাষ আমরা করছিনা। এই অজুহাতে যে গরুছাগল সব নষ্ট করে বলে, অথচ যদি ধান্য ক্ষেত্র রক্ষার জন্য আমরা মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত গরু ও ছাগল বেঁধে রাখতে পারি, তাহা হইলে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আর একমাস গরু ছাগল রক্ষা করে কলাই চাষের মত এত বড় একটা লাভজনক চাষ থেকে কেন আমরা বঞ্চিত হব। পরাধীন জাতি বলেই আমাদের এই অধঃপতন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতি, তারা এই মাটী খুঁড়েই সোনা দানা ফলিয়ে নেয়; আজ আমাদের প্রধান শস্য কম ফলার কারণ শুধু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নয়, প্রধানতঃ ধান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত সারের অভাব। বছরের পর বছর পুনঃ পুনঃ আবাদী জমিতে যদি ভুলেও একবার সার না দেওয়া হয়, তা হলে সেই জমি থেকে আমরা কতটুকু ফসল আশা করতে পারি। যে মাটীর ফলে জলে আমরা মরতে মরতেও বেঁচে আছি, তার উন্নতির জন্য আমরা কতটুকু ভাবি? বরং পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করে তার উপর আমাদের অত্যাচারের অন্ত নাই। ধিক্—আমাদের যে গরুর গোময় আমরা দেশে একমাত্র শ্রেষ্ঠ সার বলে গণ্য করি, তার কতটুকুই বা আমরা ভূমিতে দেই। বরং মাঠের মধ্যে গরু বাছুরের দেওয়া অযাচিত সার আমরা কুড়িয়ে এনে জ্বালানির জন্য ব্যবহার করি; স্বাধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট হলে আইন করে এ প্রথা উঠিয়ে দিত। দেশের ও দশের উন্নতির জন্য আমরা হিসেব করে দেখেছি—আমাদের দেশের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে যে গরু বাছুর আছে, তাদের মোট ৩ মাসের গোময় হলে প্রতি বৎসর তাদেরই আবাদী জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বাকী ৯ মাসের গোময় আমরা জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহার করলেও কোন ক্ষতি হয় না। পোড়ান ঘুঁটের ছাই প্রত্যেক বাড়ীর আনাচে কানাচে পড়ে আছে; সেগুলি জল পেলে একপ্রকার জলসারের কার্য্য করে, তাও আমরা জমিতে দিই না। এর চেয়ে কৃষিকার্য্যের পক্ষে আমাদের কি অজ্ঞতা থাকতে পারে, তা আমরা বুঝিনা। মানুষের বিষ্ঠা এক প্রকার উত্তম সার, অথচ তাকে আমরা যেখানে সেখানে ত্যাগ করি, গর্ত্ত

পায়খানা করে আমরা তাতে যদি মলত্যাগ করি, সেখানকার মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি সহস্র গুণ বাড়বে।

বেশী দূরের কথা বলিব না, কল্‌কাতার ধাপার মাঠের যে বড় বড় কফি খান তা এই মানুষের বিষ্ঠার সারে জন্মে এত বড় হয়েছে। কলিকাতার সহরবাসীর বিষ্ঠা জার্ম্মাণী কিনে নিয়ে গিয়ে সার তৈরি করে টিনে ভর্ত্তি করে দেশবিদেশে চালান দিচ্ছে; ভগবান এই মানুষের হাতের কাছে উন্নত ধরণের জীবন যাত্রা চালাবার সব রকম কিছু উপাদান দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের এই অবহেলা ও অজ্ঞতার দরুণ তার রীতিমত সদ্ব্যবহার না করতে পেরে জীবনযাত্রার প্রণালীকে খাটো করে বসেছি।

সুজলা সুফলা বঙ্গজননী রত্নপ্রসবিনী, তাই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দীক্ষাগুরু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী বঙ্গজননীর যে চিরঅভিনব চিরঅপরূপ মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সার্থক হউক, কবে সেইদিন আসিবে তাহার প্রতীক্ষায় আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্, বন্দেমাতরম্।

মেঘদূতের কবি

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

কাজল্ মেঘের বাদল্-নাচন
জাগায় কবি তোমার কথা,
জানাও তুমি মেঘের মুখে
যক্ষরাজের বুকের ব্যথা!

আষাঢ়েরই বিষাদ ঘোরে
কোন্ বিরহীর নয়ন ঝোরে
সেই কাহিনী বাণীর কৃপায়
লভেছে আজ অমরতা!

যুগ পরে যুগ গেছে চ'লে
মেঘ উঠেছে মেঘের কোলে
তুমি ছাড়া আর কে রচে
মেঘদূতেরই কাব্য-গাথা—
ধন্য কবি, তোমার পায়ে
বিশ্ব আজি লুটায় মাথা!

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সকাল থেকেই মনটা কেমন এলোমেলো, কেমন একটা বিশ্রী বিশৃঙ্খলতায় বিকল হ'য়ে আছে। ভোরের বিপ্লবটা দিনের আলোয় মাঝে মাঝে প্রখর হ'য়ে ওঠে। দীনুর সব অনুভূতি ছাপিয়ে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে রাত্রিশেষের সেই অপ্রীতিকর ক্লেশটুকু। ওর চোখের পাতায় তখন ঘুমটুকু সবেমাত্র গাঢ় হ'য়ে এসেছে; স্নায়ুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জমে উঠেছে চেতনাহীন অবসাদ; হঠাৎ সারা গা শিরশির্ ক'রে উঠ্ল উষ্ণ কোমল ছোঁয়ায়: বুকে-মুখে লাগল কার ঘন নিঃশ্বাস! দীনু চম্‌কে উঠ্ল; সুপ্তি আর চেতনার মাঝখানে মগজটা কেমন একটু পাক খেয়ে গেল।

অতসী! মাথার মধ্যে তখনও ঘুমের নেশায় চেতনাটা মূর্চ্ছিত হ'য়ে আছে; আকস্মিক আলোড়নেও এতটুকু জেগে উঠ্‌তে চায় না। অন্ধকারেই দীনু হাত বাড়িয়ে আধ-ঘুমে অনুভব ক'রবার চেষ্টা করে। একবার মনে হয়, হয়ত অতসী কখন উঠে এসেছে ও-ঘর থেকে। অতসী, যার দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর জন্যে অতর্কিত মুহূর্ত্তে ওর রক্তে—ওর সারা দেহমনে জাগে অদম্য লালসা, সে যে হঠাৎ অম্‌নি ক'রে উঠে আস্‌বে ওর শয্যায়—একথা দীনু কোনদিন ভাব্‌তেও পারে নি, স্বপ্নেও না। ভাব্‌বার শক্তি ওর সত্যি ছিল না তখন; তবু মনে হ'ল—কেন এলো অতসী অমন অযাচিতভাবে ওর বিছানায়? মনটা বিষিয়ে উঠ্ল। নিমেষে দীনুর অর্দ্ধ-জাগ্রত অনুভূতিগুলো সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়ল ঘৃণায়। অতসীকে একটু দূরে ঠেলে দিয়ে ও আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল ছেঁড়া মাদুরখানার বাইরে, একেবারে মাটিতে।—কেন এলো, কেন এলো ও এমন ক'রে না চাইতে? এর চেয়ে বরং দীনু থাক্‌ত অনন্তকাল ধ'রে ওর প্রতিটি লোমকূপের প্রতীক্ষায়। ক্ষতি ওর ছিল না, লাভও ও চায় নি কোনদিন। কিন্তু আজকে হঠাৎ এই লাভ ক্ষতির বাইরে অপ্রত্যাশিত পাওনায় দীনুর সারা গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠ্ল।

চোখের পাতাদুটো আবার নিবিড় হয়ে আসে ঘুমে। হয়ত তেমনি ক'রেই কেটে যায় নিস্তব্ধ রাত্রির বিলম্বিত পলগুলি। হঠাৎ আবার কখন লাগে বুকের ওপর অতসীর হাতের ছোঁয়া। এবার আর দীনু উৎক্ষিপ্ত হ'য় না। আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্ত আগে যে বিরক্তি ওকে অকস্মাৎ পেয়ে বসেছিল, সেই বিরক্তি যেন নিমেষে ধুয়ে যায় নতুনতর অনুভূতির প্রবাহে। দীনুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাণপণে কাটিয়ে উঠ্‌তে চায় সেই গুরুভার ঘুমের জড়তা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে; অতসীর গায়ে গা দিয়ে ছেঁড়া মাদুরখানার ওপর আগের মতই স্বচ্ছন্দে ছড়িয়ে দেয় দেহটা। তারপর আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নেয় অতসীর মাথাটা; রুক্ষ চুলগুলোয় বারবার হাত বুলিয়ে দেয় প্রগাঢ় মমতায়।

কপালে একটী রেখাও পড়ে নি এই কঠোর দারিদ্র্যের। মসৃণ ভ্রূর নীচে চোখের পাতাদুটো প্রদীপের শিখার মত দপ্ দপ্ ক'রে কাঁপে। চুলগুলো নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে দীনু দু'হাত দিয়ে সযত্নে চেপে ধরে অতসীর মুখখানা। ঠোঁটের ওপর চঞ্চল গতিতে আঙুলগুলো চালিয়ে যায় ঠিক অর্গ্যানের রীডের জলদ সুরে গৎ বাজানোর মত।—তারপর? তারপর আচম্বিতে সাপের গায়ে হাত লাগার মত চম্‌কে ওঠে। ওপরের ঠোঁটখানা লম্বালম্বি কাটা! মস্ত বড় একটা দাঁত মাড়িসুদ্ধ মাথা জাগিয়ে আছে সেই কাটা ঠোঁটের মাঝখানে। দীনু ভয় পেয়ে যায়; ওর পাশে এসে শুয়েছে পদ্ম! সেই গন্নাকাটা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটা।

অস্ফুট শব্দের সঙ্গে দীনু একটু পিছিয়ে আস্‌তেই, পদ্ম ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আঁচলের ঝাপ্‌টা লেগে কানিস্তারের কপাটটা ঝন্ ঝন্ ক'রে ওঠে। সে শব্দ দীনুর কানে যায়, কিন্তু কোন কথা ব'লবার মত, এমন কি এক ইঞ্চি এ-পাশ ও-পাশ হ'য়ে শোবার মত শক্তিটুকুও তখন লুপ্ত হ'য়েছে। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে দীনু চেয়ে থাকে সেই অন্ধকারে।

সকাল থেকে যতবার কথাটা মনে হ'য়েছে, ততবারই

যেন ওর চিন্তাশক্তি ঘোলা হ'য়ে উঠেছে বিক্ষিপ্ততায়। দীনু জান্‌তে পারে না; চেষ্টা ক'রেও ভেবে উঠ্‌তে পারে না, সেটা ওর স্বপ্ন না প্রত্যক্ষ বাস্তব! সারাদিন মনটা শুধু তোলপাড় করে। সেই সূত্র ধ'রে ছোট বড় নানা কথার স্তূপ জমে' ওঠে বুকের ভিতর। অতসীর মুখপানে ভাল ক'রে চাইতেও যেন ওর আজ লজ্জা হয়। হয়ত জানে অতসী! হয়ত সেই ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙেছে অতসীর ঘুম। দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে পদ্মকে বেরিয়ে যেতে।

দিনের আলো নিবে যায়: আবার ধীরে ধীরে নামে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার কালো পর্দ্দা। দীনু ইচ্ছে ক'রেই ঘরের আলোটা আজ জাল্‌তে দেয় নি। পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে প্রচণ্ড সূর্য্যের তীব্র কটাক্ষে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে আগুনের জ্বালা এখনো হু হু করে ওর হৃৎপিণ্ডে।

ভাড়াটেদের কলরবে বস্তিটা আবার জেগে উঠেছে। ওপাশের দিকে ভিখিরীরা তখনো ফেরে নি। বাড়ীওয়ালার খোট্টা দারোয়ানটা ঘরে ঘরে ভাড়া আদায় ক'রে বেড়ায়। দীনু বিছানায় পড়ে কানপেতে শোনে। কেউ জানায় কাতর মিনতি, কেউ বা ভয়ে লুকিয়ে বেড়ায় এ ঘর থেকে সে-ঘরে।

অতসীর রান্না তখনো শেষ হয় নি। চৌকাঠে ঠেস দিয়ে ব'সে উপেন আপন মনে কি যেন ব'লে চলেছে অতসীকে। কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যায় না, তবুও তাৎপর্য্যটুকু গ্রহণ করতে দীনুর কষ্ট হয় না। হয়ত পয়সার কথা। এখুনি আস্‌বে দারোয়ান; চোখ রাঙিয়ে ব'ল্‌বে—"তিন রোজের ভাড়া বাকী প'ড়েছে। আবার বাকী?—নেই হোগা।"

দীনু আর এখন ভিক্ষে করে না। অতসী বারণ করে লোকের দরজায় হাত পাত্‌তে। তার চেয়ে চাক্‌রি, না-হয় যে কোন একটা কাজ খুঁজে নিতে পারলে সত্যি থাকবে না দীনুর কোন ভাব্‌না; হয়ত অতসীও হবে নিশ্চিন্ত। সে চায় না দীনুর রোজগার খেতে। ওরা যেমন ভিক্ষে করে, তেমনিই ভিক্ষে ক'রে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনটা। উপেন গেরস্ত ঘরের ছেলে, কিন্তু অতসী ত তা নয়। ও জাত-ভিখিরী। অতসীর যখন আপন-পর জ্ঞান হ'য়েছে, তখন আর আপন ব'ল্‌তে কিছুই ছিল না ওদের।

সত্যিই তাই! দারোয়ানটা বুঝি চোখ রাঙিয়ে তর্জ্জন করে! অতসী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলে—"এ ক'দিন ভিক্ষেয় বেরিয়ে যা পাই, তাতে একবেলার খোরাকীও জোটে না। শুধু চাল দু'মুঠো পাই ব'লেই রক্ষে। নইলে—"

দারোয়ানটা শোনে না ওর অনুনয়। পয়সাগুলো ছড়িয়ে ফেলে দেয়। ভাঙা ভাঙা বাংলায় সুর কেটে কেটে বলে—খোরাকী জুটুক আর না-জুটুক, সে চায় ভাড়া। তিন দিনের ভাড়া বাকী প'ড়েছে, আবার বাকী সে রাখ্‌বে না, কিছুতেই না; মনিবের হুকুম নেই তার।—দু'খানা ঘরের ভাড়া, মোটে সাতটা পয়সা! বাকী পয়সা কা'ল মিটিয়ে না দিলে, ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে ওদের।

দীনু উঠে এসে দরজার সাম্‌নে দাঁড়ায়; মুখ বাড়িয়ে দেখে দারোয়ানটার চেহারা আর অতসীর অসহ দীনতা। হেঁটমুখে কেরোসিনের ডিবে হাতে নিয়ে পয়সাগুলো একটী একটী ক'রে কুড়িয়ে সে দারেয়ানটার হাতে তুলে দেয়। সেই ক্ষীণ আলোকেও স্পষ্ট দেখা যায় ওর চোখের জল। ওর মুখপানে চাইলে হয়ত স্থবির ভগবানের চোখও ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌ত জলে।

* * * *

রাত্রি তখন প্রায় দুটো। সারা বস্তি ঘুমে অচেতন। দীনুর চোখে ঘুম নেই। একটানা ঘুম ওর একটি রাতের জন্যেও হয়না আর। মগজটায় ঘুরে বেড়ায় কখনো দুঃস্বপ্ন, কখনো অতীত আর বর্ত্তমানের সংমিশ্রণে গ'ড়ে ওঠা অদ্ভুত কতকগুলো চিন্তার কবন্ধ। অশ্রু ওর শুকিয়ে গেছে ব'লেই যেন কতকটা স্বস্তির সঙ্গে বাঁচে। নইলে, কতকাল আগে ধুয়ে যেত ওর এই অকিঞ্চিৎকর বেঁচে থাকা, জীবন্ত মানুষের চোখের জলে। দীনুর সন্দেহ হয়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে বর্ত্তমান আর অতীতকে পাশাপাশি রেখে নিজের কথা ভাব্‌তে সত্যি ওর সন্দেহ হয় যে, আজও সে বেঁচে আছে কিনা! ওর আশে-পাশে যারা বেঁচে আছে, তারা কি মানুষ, না মানুষের প্রেতাত্মা!—মানুষ হ'তেই পারেনা। তবে ছিল, কোন-দিন; বোধহয় ছিল তারা: পৃথিবীর ওই চলমান জীবন

স্রোতের মাঝখানে মানুষের মত বেঁচে। ওদের সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে কখন হঠাৎ পড়েছে অন্ধকারে পিছিয়ে। ধাক্কা খেয়ে দেহগুলো লুটোপুটি ক'রে গড়িয়ে এসেছে পিছনের পথে, কিন্তু ওদের এই দুর্দ্দম চলার আবর্ত্ত থেকে অসহায় ক্ষীণ জীবনগুলোকে পারেনি তারা ছিনিয়ে আন্‌তে।—They were men. That's there only solace.

চোখ দুটো কেবল জমে' এসেছে; হঠাৎ দীনুর ঘুম ভেঙে গেল ভয়ার্ত্ত শিশুর আর্ত্তনাদে। কে কাঁদে! করুণ কান্নায় নিশুতি রাতের নিস্তব্ধ বাতাস যেন শিউরে ওঠে। তারই সঙ্গে নারীকণ্ঠের কাতর মিনতি, আর নির্ম্মম পুরুষের ক্রুদ্ধ আস্ফালন!

দীনু ধড়ফড়িয়ে উঠে ব'স্‌ল। সে কান্না যেন থাম্‌তে চায় না। ছেলেটা অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে কাঁদে। আলোটা জাল্‌বে ব'লে দীনু হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই কুড়িয়ে নিল; কিন্তু আলো আর জ্বালা হ'ল না। হঠাৎ কি ভেবে ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।—ওদেরই বস্তির পূব-দিকের ঘরগুলো থেকে আসে সেই কান্নার শব্দ।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শব্দটা লক্ষ্য ক'রে সেই দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ পিছন থেকে কে শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রল ওর ডান হাতের কব্জিটা। দীনু চম্‌কে উঠল: "কে?"

অতসী তাড়াতাড়ি দীনুর মুখের ওপর হাতখানা চাপা দিয়ে বলে—"চুপ!"

দীনু থতমত খেয়ে যায়। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উ'ঠতে পারেনা। "অতসী?"

"হাঁ। যেও না ওদিকে।" অতসী অনুনয় করে, প্রাণপণ শক্তিতে টানে ওর হাতখানা ধ'রে।

দীনু হতভম্বের মত জিজ্ঞেস ক'রে—"কেন?"

"কেন! এখুনি ছুরি মারবে তোমার বুকে। ফিরে চল; যেন টের না পায় ওরা।"—অতসী হাঁপিয়ে ওঠে। কথা ব'ল্‌তে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসে।

অতসীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দীনু বলে—"শুন্‌তে পাচ্ছনা, ছেলেটার কান্না? যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রছে।"

অতসী তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দেয়—"তা ক'রবে না? চোখ! সব্বের সেরা ধন চোখ ওর জন্মের মত গেল।"

"তোমার কথা বুঝ্‌তে পারছি না অতসী। কি হ'য়েছে ওর চোখে? অত কান্না!"—বিহ্বলভাবে দীনু অতসীর মুখপানে চায়।

অতসী দুহাত দিয়ে দীনুর হাতখানা আরও শক্ত ক'রে ধ'রে বলে—"ঘরে চল; সব ব'লছি।"

ওর ভাব দেখে দীনু অস্থির হ'য়ে ওঠে; ভাব্‌তে পারে না, এমন কি আতঙ্ক লুকিয়ে আছে ওই শিশুর করুণ আর্ত্তনাদের পিছনে। এবার জোর ক'রে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে দাঁড়ায়—"না। আগে বল, কি হয়েছে ওর?"

অতসী জবাব দিতে পারে না। কথা ব'ল্‌তে কান্নায় ওর কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে আসে। দু'হাত বাড়িয়ে দীনুকে আট্‌কাবার চেষ্টা করে: "না, না। যেও না তুমি।"

এবার দীনু দৃঢ়তার সঙ্গে অতসীর হাত দুখানা সরিয়ে দিয়ে বলে—"পাগ্‌লামি ক'র না অতসী। ফিরে যাও।"

"না। সব পারে ওরা। পরশু রাত্তির থেকে ছেলেটাকে তুলিয়ে এনেছে ভিখিরী ক'রবে ব'লে। চোখ দুটো গালিয়ে অন্ধ ক'রে দিচ্ছে।"—অতসীর নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে; কথার চেয়েও স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

"অন্ধ! অন্ধ তৈরি ক'রছে?"—দীনু বজ্রাহতের মত অসাড় হ'য়ে গেল।

"হাঁ; লোহার কাঁটা দিয়ে চোখদুটো উপ্‌ড়ে দিয়েছে।"

বিশ্বাস হয়না। ওর মরচে-ধরা তন্ত্রীগুলো কেঁপে কেঁপে থেমে যায়। একটুক্ষণ কি ভেবে দীনু উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠল—"তুমি ঘরে যাও অতসী, আমি দেখে আসি। মানুষ মানুষকে অন্ধ তৈরি ক'রছে! না না, মিথ্যে—মিথ্যে অতসী!"

অতসী শঙ্কিত হয়ে একহাতে দীনুর হাতখানা জড়িয়ে ধ'রে, আর-এক হাত পায়ের দিকে বাড়িয়ে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলে—"তোমার পায়ে ধরি যেও না ওদিকে। ওরা মারতে পারে। এখুনি খুন ক'রে ফেল্‌বে।"

"তা হোক।"—দীনু মানে না; অতসীর হাত ছাড়িয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। অতসীও চলে তার পিছু পিছু।

দরজা বন্ধ। ঘরের ভিতর একটা মেটে প্রদীপ মিট্ মিট্ করে। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে। ও-পাশের ভাঙা জানালাটার ধারে গিয়ে দীনু চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়ায়।

বাইরে বোষ্টুমি কাকুতি-মিনতি করে—"ওগো দিও না অমন ক'রে পুত্তুর ছেলেটাকে একেবারে জখম ক'রে। আর কখনো ও বলি নি। দুধের ছেলে—"

মাণিক পেয়াদা! যমদূতের মত কটমটিয়ে রাধির মুখপানে চায়। ওর চোখের দিকে চাইলে সত্যি বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে ভয়ে। ছেলেটার বুকের ওপর চাপ দিয়ে বসে এক হাতে মুখটা টিপে ধ'রেছে; নড়বার শক্তিও নেই ওর। দুই গাল বয়ে গড়াচ্ছে তাজা রক্ত।

ছোটার চোখে তুঁতের গুল ছড়িয়ে দিতেই সে আবার চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল প্রাণপণে। রাধি তখন মাণিকের হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রেছে; মাণিক হাঁটু দিয়ে এমন জোরে ধাক্কা দিল রাধির বুকে যে রাধি হুম্‌ড়ি খেয়ে উল্টে পড়ল মেঝেয়। শিশুর করুণ আর্ত্তনাদে সে কর্ণপাতও করে না।—তারপর ছেলেটাকে জোর ক'রে গিলিয়ে দিল খানিকটা কালো জল; হয়ত আফিং-ঘোঁটা।

দীনুর সংজ্ঞা বোধহয় তখন লুপ্ত হ'য়ে আসছিল। আপাদমস্তক থর থর ক'রে কাঁপে। অতসী তার অবস্থা বুঝে জোর টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এলো উঠানের এপারে। দীনু দাঁড়াতে পারে না; পা দুটো অসাড় হ'য়ে গেছে। সারা গা চন্‌চন্ করে ঘামে।

অতসীর ঘাড়ে ভর দিয়ে দীনু বিভ্রান্ত স্বরে বলে—"অতসী, পৃথিবীটা চৌচীর হ'য়ে যাবে। শোন! কান্না! নিশুতি রাতে দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ কাঁদ্‌ছে।"

দীনুকে ধ'রে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে এনে অতসী আঁচলের বাতাস দিতে লাগ্‌ল। ওর কপাল ব'য়ে তখন ঘাম ঝরছে। মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে—"এখনো গা-ঘুর্‌ছে দীনু?"

—"না।"

—"তবে অমন ক'রছ যে?"

—"কই? করিনি ত কিছু; ভাব্‌ছি। ভাব্‌ছি, মানুষের খিদের আগুনে এখনো পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হয় নি কেন!"—কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দীনু হঠাৎ থেমে যায়। অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবে; তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবার ব'লে ওঠে—"ভূমিকম্প—বিহারের মত অম্‌নি একটা ভূমিকম্প হ'ত!"

"কি ব'লছ?"—অতসী অভিভূতের মত জিজ্ঞেস করে। দীনুর অবস্থা দেখে ওর ভয় হয়। বোধহয় মাথার গোলমাল হ'য়েছে।

"বলিনি কিছু। ওই বাড়ীগুলো, জোঁকের বাচ্চার মত কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে পথের দু'পাশে ওই যে অসংখ্য লোক—ওই সব জ্যান্ত মানুষগুলো সব ম'রত ইট-কাঠ চাপা পড়ে, তা হ'লে পৃথিবীটা দু'দণ্ড নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ত। আর পারে না, পারে না ওদের ভার সইতে।—হায় রে!"—দীনু হেসে ওঠে। হাসির বেগে ওর জীর্ণ পাঁজরাগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে।

অতসী এমনিতেই বোঝে না দীনুর সব কথা; তার ওপর আবোল-তাবোল! এ সবের একবর্ণও প্রবেশ করে না ওর মগজে। দীনুর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে চিন্তিত ভাবে বলে—"উপোসে উপোসে মাথা তোমার খারাপ হয়ে গেছে। খিদেয় পেট পুড়ে যায়; ঘর-বাড়ী পোড়ে কখনো?"

"সব পোড়ে অতসী, সব্ হয়। আস্ত আস্ত মানুষ পুড়ে যায়; পাকস্থলী, ফুস্‌ফুস্, কল্‌জে, পাঁজরার হাড়—তাজা মগজটা পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। অন্ধ অসহায় শিশু পথে পথে কেঁদে যোগাবে সেই ক্ষুধার অন্ন!"—দীনু আবার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; সিধে হ'য়ে উঠে ব'স্‌তে চায়।

এক হাতে দীনুর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে, আর-এক হাত মাথায় বুলোতে বুলোতে অতসী বলে—"একটু থির হও। আচম্‌কা মাথাটা গরম হ'য়ে উঠেছে।"

দীনু হেসে ওঠে, সেই বিকৃত হাসি। অতসীর কোল থেকে মাথাটা টেনে নিয়ে উঠে বসে। ওর পেশিগুলো তখন শক্ত হ'য়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ লেগে এমন একটা কিট্‌কিট্ শব্দ হয় যে অতসী ভয় পেয়ে যায়। মনে হয়, হয়ত দাঁতি লাগ্‌বে এখুনি।—"বেঁচে গেছ অতসী, তোমার চোখ নেই। আমার চোখের সাম্‌নে কলরব ক'রছে লাখ লাখ ভিখিরী; অন্ধ পঙ্গু প্রেতাত্মা সব! পথের দু'পাশে ভিড় ক'রে চলেছে। মাথা ঠুকে মরে; হুম্‌ড়ি খেয়ে কে কার গায়ে উল্টে পড়ে, ঠিক নেই। রাস্তার

পাথরে ঠোকা লেগে লেগে মাথাগুলো থেঁতো হ'য়ে গেছে। এমন এক ফোঁটা রক্ত নেই যে ঝরে' পড়ে।"

এবার অতসী বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। শাসনের সুরে বলে—"চুপ ক'রে শোও দেখি চারদণ্ড। অত ব'কো না।"

"না। আর বক্‌ব না। তুমি শোওগে যাও।"—দীনু অবসন্নভাবে মাদুরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দেয়।

অতসী নিশ্চল হ'য়ে ব'সে থাকে বিছানার পাশে। কখনো আঁচল দুলিয়ে একটু বাতাস দেয়, কখনো বা হাতখানা শিথিল হ'য়ে আসে অন্যমনস্কতায়।—'বেশ থাকে দীনু। থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ যেন কেমন বিগ্‌ড়ে যায়। ওদের ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সার কথা হয়ত এখনো ভুল্‌তে পারে নি ও।—এম্‌নি ক'র্‌তে ক'র্‌তেই আবার যাবে পালিয়ে। কখন পালাবে, অতসী টেরও পাবে না।'

—"অতসী!"

—"ঘুমোও নি এখনো?"

—"না। ঘুম আমার চোখে আসে না অতসী। তুমি শোও গে যাও। একা একা চুপটি ক'রে শুয়ে থাক্‌লে যদি আসে একটু ঘুম।"—দীনু পাশ ফিরে শুলো।

অতসী কি ভেবে আস্তে আস্তে উঠে গেল। দীনুর কথার আর কোন প্রতিবাদ ক'রল না সে। ওর অবস্থা দেখে মনটা এতক্ষণ আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল। দরজাটা টেনে দিতে দিতে আপনমনে বিড় বিড় ক'রে বলে—"যারা কাঙাল, তাদের আবার শান্তি!"

দীনু হাসে। অতসীর কথাগুলো বেশী স্পষ্ট না হ'লেও ওর কানে যায়।—ছেলেটা আর কাঁদে না। আফিমের নেশায় ঘোর হয়ে ঘুমিয়েছে এবার। এই ঘুমের সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনে নেমে এলো অনন্ত রাত্রি। কে জানে, কতকাল পরে প্রভাত হবে ওর ওই চিরন্তন অমানিশা!

ভুল। ভগবানের সৃষ্টিতে ভাঙা কাঁচের স্তূপ ওরা। ভুল ক'রে গড়া অসংখ্য দেহপিণ্ড এসে জমেছে এই দুনিয়ার কবরখানায়। তার চেয়েও বড় ভুল ক'রেছে ওরা ওদের সেই অক্ষম বিধাতাকে বাঁচিয়ে রেখে।

দীনু বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করে, ঘুম আসে না চোখে, স্পর্শও করে না ওর ব্যথিত অস্তিত্বকে। চোখের সাম্‌নে চলচ্চিত্রের ছবির মত ভাসে জগতের অগণিত অন্ধ শিশু: ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে পথে পথে কেঁদে বেড়ায়—একমুঠো চাল, না-হয় একটী আধ্‌লার আশায়।

বুকের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি: দীনুর মনে হয়, বস্তির এই বদ্ধ বাতাসে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। আবার উঠে বসে; বিমূঢ়ের মত বসে' ভাবে কত কি এলোমেলো। আকাশ-পাতাল সে চিন্তার যেন কূল কিনারা নেই কোন। মগজের মধ্যে পিল্ পিল্ ক'রে ওঠে অশান্তির বৃশ্চিকগুলো। ঘরের ভিতর অন্ধকারটা যেন আরও বেশী জমাট বেঁধেছে।

এবার দীনু পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়; দরজাটা অতি সন্তর্পণে টেনে দেয় বাইরে থেকে, যেন অতসী শব্দ না পায়।

নিস্তব্ধ পথ। গাড়ী ঘোড়ার ভিড় নেই। দিনের জীবন্ত রাজপথ রাতের অন্ধকারে শ্মশান হ'য়ে উঠেছে। কোলাহল থেমে গেছে। ভিখিরীদের করুণ ক্রন্দন শোনা যায় না। অলকাপুরীর উৎসব ঘুমের কোলে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। ক্বচিৎ দু'একজন পথবাসী পথের এদিক থেকে ওদিকে উঠে যায়। ফুটপাথের বুকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে গৃহহীন ভিখিরীদের শয্যাহীন সুখশয্যা।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দীনু একবার যন্ত্রপুতুলের মত উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে ফুটপাথ ধ'রে চল্‌তে লাগ্‌ল। বড় রাস্তার মোড়ে দু'একজন পুলিস টহল দিচ্ছে: তন্দ্রালু অবসন্ন পদে পায়চারি করে। গাড়ীবারান্দাগুলোর নীচে পথচারীদের ভিড়। যুদ্ধশ্রান্ত নগ্ন সৈনিকদের মত গায়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

চল্‌তে চল্‌তে দীনু থম্‌কে দাঁড়ায়। ওদিকের ফুটপাথে কতকগুলো ভিখিরী কলরব সুরু ক'রেছে। সবাই ঘিরে ধ'রেছে একটা ছোঁড়াকে। একবার মনে হ'ল কর্ণপাত ক'রবে না; আবার কি ভেবে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। —ছোড়াটা দীনুর চেনা। অনেকবার দেখেছে তাকে গলায় খাদি বেঁধে পিতৃদায়ের ভিক্ষে ক'র্‌তে। কখন কখন দাঁতে খড় নিয়ে গোবধের প্রায়শ্চিত্ত সেধে বেড়ায়। বয়েস চোদ্দ-পনরর বেশী নয়।

ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে দীনুর দেরী হয় না। এই বয়েসেই জেগেছে ওর প্রচণ্ড যৌনক্ষুধা। ওর অত্যাচারে কানা মেয়েটা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। মেয়েটা বোধহয় বয়েসে ওর চেয়ে দশ বছরের বড়। দীনুর ইচ্ছে হ'ল ছোড়ার মাথাটা জোর ক'রে ঠুকে দেয় দেয়ালের গায়ে, খুলিটা ভেঙে দু' টুক্‌রো ক'রে ফেলে; কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে আবার এগিয়ে চলে ফুটপাথ ধ'রে।—দীনু মোড়টা ছাড়িয়ে যেতে না-যেতেই সে কোলাহল আপনি থেমে গেল।

দীনু ভাবে ওর জীবন পথের এই সব মৃত্যুহীন সঙ্গীদের কথা। ক্ষুধার্ত্ত, উলঙ্গ নিঃস্ব মানুষের দল! এরা যেন মৃত্যুঞ্জয়ী হ'য়ে ব'সে আছে জগতের পথ রুদ্ধ ক'রে। এরা মরে না, মরেও না কোন দিন।

* * *

চল্‌তে চল্‌তে পা দুটো অবসন্ন হ'য়ে আসে। শরীরের রক্তস্রোত যেন এবার খুব কমে' এসেছে: চেষ্টা ক'রেও পা দুটো আর সাম্‌নের দিকে টেনে নেওয়া যায় না। গীর্জ্জার সাম্‌নে এসে দীনু একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। স্তিমিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে আকাশের দিকে। পাণ্ডুর বিবর্ণ চাঁদটুকু হেলে পড়েছে চূড়ার ওপারে। অবসাদগ্রস্ত তারাগুলো যেন রাত্রিশেষের ম্রিয়মান আলোকে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ক্ষণেক কি ভেবে দীনু এগিয়ে গেল গীর্জ্জাটার দিকে। একেবারে কাছে গিয়ে দুই হাত দিয়ে অনুভব ক'রল সেই বৃদ্ধের দেয়ালের শীতল স্পর্শটুকু।—ওপারের ফুটপাথে গাছতলাটার আশ্রয় নিয়েছে অনেক ভিখিরী। সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘুমিয়ে পড়েছে; ওদের বেদনাতুর নিশ্বাস মিলিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে।—দীনু ব'সে প'ড়ল পৈঠার একটা পাশে।

ওদের শিয়রে শিয়রে ঘুরে বেড়ায় একটী মেয়ে; ওদেরই কেউ। দেহ তার যৌবনের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেও, এখনো সীমারেখা ছাড়িয়ে যায় নি। জীর্ণ কাপড়ে লজ্জা ঢাকা পড়ে না। রুক্ষ চুলে জটা বেঁধেছে। গ্যাসের আলোতে এপার থেকেও বেশ স্পষ্ট দেখা যায় তার মুখ-চোখ। ওর ওই দেহে হয়ত কিছুদিন আগেও ছিল জীবনের প্রচুর সম্ভাবনা। কিন্তু এবার ভাঙন ধ'রেছে।

ভিখিরীদের মাথার কাছে গিয়ে মেয়েটা যেন কানে কানে কি বলে! ওর গতিভঙ্গী দেখে দীনু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে; অবস্থা দেখে সন্দেহ হয়।—একে একে অনেকের মাথার কাছে ফিরে, মেয়েটা শেষে এলো এদিকের ঘেয়ো ভিখিরীটার কাছে। সে বোধহয় তখনো ঘুমোয় নি। দেহের যন্ত্রণায় ঘুম আসে নি তার চোখে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে মেয়েটা কি ব'ল্‌তেই সে তাড়াতাড়ি উঠে ব'স্‌ল কলের পুতুলের মত। শিথানের ছেঁড়া ঝোলা-ঝাঁপির ভিতর থেকে খুঁজে খুঁজে বের ক'র্‌ল দু'টুক্‌রো চাপাটি রুটি!—বোধহয় ওরই ভুক্তাবশেষ। মেয়েটার চোখে মুখে অতৃপ্ত ক্ষুধার কি লেলিহান দৃষ্টি! ওই উচ্ছিষ্ট রুটির টুক্‌রো দুটোর দিকে চেয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত হাসে; চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে প'ড়তে চায়।

মেয়েটা ইসারায় আবার কি বলে।

রুটির টুক্‌রো-দুটো কোলের ওপর নামিয়ে রেখে, লোকটা এবার ভাল হ'য়ে ব'স্‌ল। সর্ব্বাঙ্গে সিফিলিসের ঘা দগ্‌দগ্ করে; নাকটা ব'সে গেছে; চোখের কোণে শাদা শাদা ঘায়ের চটা। ওর পানে চেয়ে দীনুর সর্ব্বশরীর শিউরে ওঠে।—ট্যাঁক থেকে দুটো পয়সা বের ক'রে মেয়েটাকে দেখায়। মেয়েটার মুখ আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। রুটিটুকু তার হাতে তুলে দিয়ে আবার সযত্নে পয়সা দুটো গুঁজে রাখে ট্যাঁকে!

কি বীভৎস উল্লাস! মেয়েটা সবুর সইতে পারে না। দু'হাতে রুটির টুক্‌রো-দুটো নিয়ে এক মুহূর্ত্তে গুঁজে দেয় মুখের ভিতর। পেটে যেন বিসুভিয়সের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে।

মেয়েটার খাওয়া হ'লে দুজনেই উঠে গেল। হাসপাতাল আর পাদ্রীদের কলেজের সাম্‌নে পথটা যেখানে অন্ধকার, সেইখানে গিয়ে ওরা বড় গাছটার আড়ালে শুয়ে প'ড়ল পাশাপাশি।—দীনু ভাব্‌তে পারে না; ওর আপাদমস্তক আবার তেমনি ঝিম্‌ঝিম্ করে: 'পেটের জ্বালায় জীবন্ত মানুষের ভিড় জমেছে পথের শ্মশানে।'

দীনু উঠে প'ড়ল; রাস্তাটা পার হ'য়ে আবার ফিরে চ'ল্‌ল ফুটপাথ ধ'রে।

মোড়ের কাছে এসে লাইট-পোষ্টটার পাশে দাঁড়াতেই ওর দৃষ্টি প'ড়ল একটী শীর্ণকায় লোকের দিকে। লোকটা যেন ওর দিকেই এগিয়ে আসে। পরণে জীর্ণ একখানা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া শার্ট, পায়ে জুতো নেই।—সবে, সবে সুরু হ'য়েছে। হয়ত এখনো আছে ওর ফিরে যাবার পথ। মুখখানা খুব চেনা, তবুও ঠিক চিনে উঠ্‌তে পারে না।

সাম্‌নে, একেবারে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চায় দীনুর মুখপানে। দীনু হঠাৎ অনুমানের ওপর জিজ্ঞেস্ ক'রে ব'স্‌ল—"বিমল বোস্?"

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বলে—"হাঁ। আপনি—?"

"আমার কথা যাক্। আপনার সে চাকরিটা গেছে বুঝি? য়ুনিভার্সিটির চাকরিটা!"

"ছেড়ে দিয়েছি। দাদা ষড়যন্ত্র ক'রে চাকরিটা খেয়েছে।"—ব'লে বিমলবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌ল।

"বেশ। দাদা ষড়যন্ত্র ক'রে চাকরিটা খেয়েছে; শৈলবালা খেয়েছে ভিটেমাটি; আর পাকস্থলীটা ষড়যন্ত্র ক'রে খেয়েছে বাকী সব—মান, ইজ্জৎ, মস্তিষ্ক!"—উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দীনু হন্‌হনিয়ে চলে গেল।

লোকটা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল ওর দিকে চেয়ে।

আবার জমে' ওঠে অবসাদ। ভোরের বাতাসে কন্‌কন্ করে শীত। চলার বেগে দীনু শীতটা কাটিয়ে উঠ্‌তে চায়, কিন্তু পারে না। পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যায় সাম্‌নের পথে এগিয়ে যেতে।

পথ ভিখিরীগুলো নড়ে' চড়ে' হাতপা গুটিয়ে শোয়। কেউ বা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে গুব্‌রে পোকার মত তাল পাকিয়েছে শীর্ণ দেহটাকে নিয়ে, কেউ পরণের শতছিন্ন আবরণটুকু দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকেছে।

দীনু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। চোখের পাতা ভারি হ'য়ে আসে ক্লান্তিতে; পায়ের শিরাগুলো কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে, হাত-পায়ের আঙুল টিস্‌টিস্ করে ব্যথায়।

—একটা গেঞ্জি, না-হয় যেমন-তেমন একখানা ছেঁড়া কাপড়ও যদি জড়াতে পার্‌ত গায়ে, তা হ'লে ওর মুহ্যমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোধহয় আবার সচল হ'য়ে উঠ্‌ত।—আর পারে না; ও পারে না আর এই বিলীয়মান সত্ত্বাকে জোর ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে।

লাল বাড়ীটার ভিতর থেকে ত্রস্তপদে বেরিয়ে আসে একটী প্রৌঢ়া! হাতে কাপড়ের একটা গাঁট্‌রি। মেয়েটা চকিত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চায়। হয়ত ওদেরই বাড়ীর ঝি। কেউ জাগ্‌বার আগে ওর খুঁটিনাটি দরকারের জিনিষগুলো চুরি ক'রে সরিয়ে ফেল্‌ছে।—

দীনুর ইচ্ছে করে গাঁটরিটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, কেড়ে নেয় একখানা ভাল আস্ত কাপড়। শীত-ভোর গায়ে দিয়ে বাঁচ্‌বে। নিজের পরণের কাপড়খানা একবার নেড়েচেড়ে দেখে।—জরাজীর্ণ হ'য়ে গেছে, সুতোগুলো ঢাকা প'ড়েছে ময়লায়।

মেয়েটা এগিয়ে আসে; ভীত সন্ত্রস্তপদে এগিয়ে আসে ওরই পথে। মগজটা চঞ্চল হয়, হাতদুটো অস্থির হ'য়ে ওঠে।

—এলো না, এলো না ওর কাছ পর্য্যন্ত। কোণের ডাষ্টবিনটার ভিতর গাঁটরিটা ফেলে দিয়ে, ভীতিচঞ্চল ক্ষিপ্র-গতিতে ফিরে গেল। পায়ে যেন ওর অমানুষের শক্তি! নিমেষের মধ্যে চলে গেল দীনুর দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে।

দীনু ভাবে, কিন্তু ভাব্‌নার কোন সূত্র নেই। নিতান্ত অজ্ঞাতসারে স্বপ্নাবিষ্টের মত এগিয়ে যায় ডাষ্টবিনটার কাছে। তিলমাত্র ইতস্তত না ক'রে, টেনে তোলে সেই কাপড়ের গাঁটরিটা। ওর শরীরে তখন ফিরে এসেছে অনেকখানি সজীবতা। কাপড়গুলোর স্পর্শ-আকাঙ্খায় শীতার্ত্ত ত্বক ওর উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে।

—কতকগুলো নেকড়া, একখানা কাপড়; রক্তাক্ত! তারই ভিতর তোয়ালে জড়ানো একটী সদ্যোজাত শিশু! দীনু দুহাত দিয়ে তুলে ধরে চোখের সাম্‌নে। ছেলেটা নড়ে! ধব্‌ধবে শাদা হাতপাগুলো তখনো একটু একটু নড়ছে। দীনুর বিশ্বাস হয় না। তুলে ধরে আরও কাছে, একেবারে মুখের কাছে নিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সেই মোমের পুতুলটা।—বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে।

চোখের সাম্‌নে থেকে পলকে পৃথিবীটা মুছে যায়। হাত-পা অসাড় হ'য়ে আসে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও দীনু নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারে না। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। আপাদমস্তক ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপে। ওর পেশিতে, স্নায়ুতে, এমন কি হাড়ের মধ্যেও সুরু হ'য়েছে প্রলয়। সে কম্পনের বেগ দীনু কোনমতেই পারল না সাম্‌লে নিতে। সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়ে এলো।—ছেলেটা হাত থেকে পড়ে গেল পেভ্‌মেণ্টের পাথরে। দীনু সপাহতের ন মত ঢ'লে পড়ল ডাষ্টবিনের ধারে।

তখন ভোর হ'য়ে এসেছে। ব্যবসাদার বস্তিওয়ালার অন্ধ-নুলো ভিখিরীগুলোর হাত ধ'রে ধ'রে এনে বসিয়ে দিয়ে যায় রাস্তার মোড়ে; কোনটাকে টবের গাড়ীতে বসিয়ে টান্‌তে টান্‌তে এনে গড়িয়ে দেয় ফুটপাথে। তাদের বেদনার্ত্ত করুণ কাৎরানি ভোরের অলস বাতাসে মিলিয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

নিখিল-প্রবাহ

প্রকৃতির সমতা ও জলজীবের শিকার-কৌশল

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

বস্তু জগতে ধ্বংস যেমন অনিবার্য্য জীবজগতেও সেইরূপ মৃত্যুর হিমস্পর্শে চিরনিদ্রা অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, জরা, বার্দ্ধক্য প্রভৃতির ফলে জীবজগতে মৃত্যু সংঘটিত হয়। তাহা ছাড়া কোন কোন জীবের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অতি নিরীহ জীবকেও মৃত্যুবরণ করিতে হয়। এইরূপ হিংসামূলক হত্যাকাণ্ডে যে অকালমৃত্যু, তাহাও সৃষ্টি রহস্যে প্রয়োজন। মায়াবাদী মানুষের মনকে মৃত্যুর এই অনিবার্য্যতা সততই চঞ্চল করিয়া তুলে কিন্তু মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। মৃত্যুর ধ্বংস-স্তূপ হইতে বর্ত্তমানের সৃষ্টি এবং অনাগত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের গর্ভে নিমজ্জমান। এক-কথায় বলিতে হইলে আমরা যে প্রকৃতির মানদণ্ড (The balance of Nature) জীবজগতে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিতেছি তাহার মূলে মৃত্যুর অবশ্য প্রয়োজন স্বীকার্য্য এবং এই প্রকৃতির মানদণ্ডের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান তাহার পক্ষে বিপদজনক।

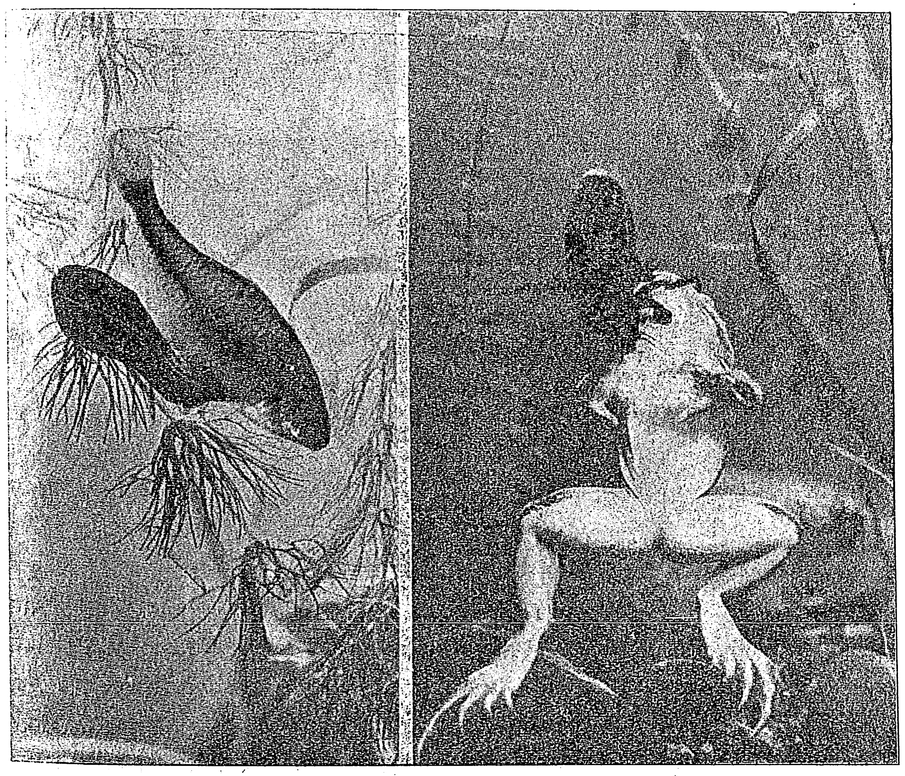

বর্ত্তমানে সেভার্ণ উপত্যকায় ও উত্তর স্কট্‌লাণ্ডে গন্ধ-

মাছের দেহ হইতে জোঁকের রক্ত শোষণ

'টাইগার বিট্‌লে'র শিকার আক্রমণ

মূষিকের (Muskrat) আবির্ভাব প্রমাণ করিল প্রকৃতির আধিপত্যকে বিপর্য্যস্ত করার ফল মানুষের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোমের ব্যবসার জন্য আদি জন্মস্থান ক্যানাডা হইতে কয়েক জোড়া গন্ধমূষিক ব্যাভেরিয়ার কোন বে-সরকারী রাজ্যে আমদানী করা হয়। অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে ইহাদের বংশ এরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা আর সম্ভব হইলনা। সুতরাং ব্যাভেরিয়ার জলাশয়ের সর্ব্বত্রই ইহারা বাসভূমি করিয়া লইল। আর সেভার্ণ উপত্যকার মধ্যে গন্ধমূষিকের বাসভূমি সীমাবদ্ধ নয়। ক্রমশঃ সাসেক্স ও হামশায়ারের জলাশয়গুলি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের এইরূপ অবাধ স্বাধীনতায় শস্যক্ষেত্র রক্ষণ করা সেখানকার কৃষকদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। শাক, আলু প্রভৃতি শাক্‌শব্জী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া কৃষকদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। কিন্তু বংশ হ্রাসের নিমিত্ত সেখানে তাহাদের কোন শত্রু না থাকায় ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশঃই এত বৃদ্ধি পাইল যে অবশেষে ব্যাভেরিয়ার গভর্ণমেণ্ট ইহাদের দমনের নিমিত্ত বাৎসরিক ৩০,০০০ মার্ক ব্যয় করিতে বাধ্য হইলেন।

অজ্ঞাত অবস্থায় কখন কখন প্রকৃতির মানদণ্ডের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ করায় কিরূপ বিপরীত ফল দাঁড়াইয়াছে তাহা বহু ঘটনার বিবরণ হইতে জানা যায়। সর্ব্বপ্রথম ডারউইন ঘোষণা করিলেন সকল প্রাণীর জীবন এক ঐক্যবিশিষ্ট সমগ্রের মধ্যে একসূত্রে গ্রথিত ; সেখানে কোন জীবই নিঃসঙ্গভাবে জীবন ধারণ করিতে পারেনা। প্রত্যেকেই অপর কোন না কোন প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির মধ্যেও এক অচ্ছেদ্য ঐক্য রহিয়াছে যেখানে অপর কাহারও প্রভাব ব্যতীত আমরা কোন কিছু বিচ্ছিন্ন বা সংযুক্ত করিতে পারিনা। যদি আমরা প্রকৃতির এই নিয়মকে বিশৃঙ্খল করি তাহা হইলে ইহার ফল বিপরীত অবস্থায় আসিয়া পড়ে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে ইহার জন্য বেশী ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

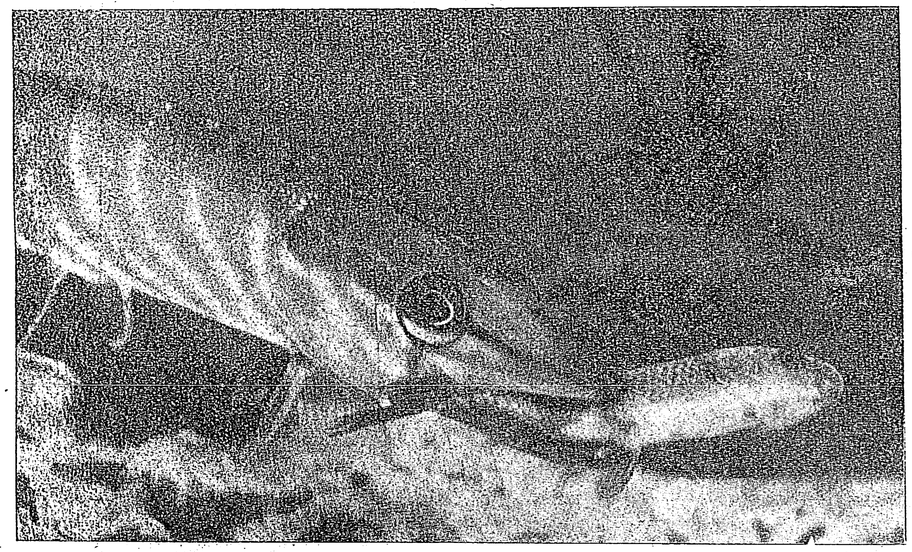

'পাইকে'র খাদ্য ভক্ষণ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জামাইকায় ইঁদুর ও বেজীর আগমনের বিস্তৃত ঘটনা হইতে প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে জামাইকায় কোন ইঁদুরের অস্তিত্ব ছিলনা। পরে বিদেশীয় জলযান হইতে কয়েকটী ইঁদুর সেখানের স্থলভূমিতে আসিয়া পড়ে। অনুকূল অবস্থার মধ্যে ইহাদের বংশ দ্রুত বাড়িতে লাগিল এবং দ্বীপে ইহাদের বংশ সংযত করিবার কোন শত্রু না থাকায় অল্পদিনের মধ্যে শাক্‌শব্জীর মাঠে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইল। ফলে নিরামিষভোজী ইঁদুরের অত্যাচারে সেখানের কৃষকেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইঁদুর দমনের নিমিত্ত ভারতীয় বেজীর আমদানী করিতে বাধ্য হইল। মাংসপ্রিয় বেজীর কবলে পড়িয়া দেখা গেল ইঁদুর বংশ ধ্বংস হইতে

বসিয়াছে। কৃষকেরা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু অপর দিকে বেজীর বংশ অদ্ভুতরূপে বৃদ্ধি পাইল এবং প্রায় চার বৎসর পরে দেখা গেল বেজীর খাদ্য-উপযুক্ত ইঁদুর সেখানে লোপ পাইয়াছে। খাদ্যাভাব প্রবল হওয়ায় বাধ্য হইয়া ইহারা গৃহপালিত পায়রা, মুরগী, হাঁস প্রভৃতি শিকারে মনোনিবেশ করিল। এমন কি সময়ে সময়ে ছোট ছাগল, কুকুর, বেড়াল হত্যা করিতেও বাধ্য হইত। কয়েক শ্রেণীর পাখী, সাপ, টিকটিকী যাহাদের এক সময়ে সচরাচর দেখা যাইত তাহাদেরও বংশ লোপ পাইতে বসিল। আবার কোন কোন জীব বেজীর ভয়ে দ্বীপ পরিত্যাগ করিল। দ্বীপের উত্তর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কচ্ছপ লক্ষিত হইত তাহাদের আর সহজে দেখা মিলিল না। অনুসন্ধানে জানা গেল কচ্ছপের ডিম বেজীর সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে চলিতেছে, ফলে কচ্ছপের বংশ লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে পাখী, সাপ, টিকটিকীর অবর্ত্তমানে কীটপতঙ্গের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে তাহাদের আক্রমণে শস্যক্ষেত্র নষ্ট হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দিল।

শেষে দেখা গেল প্রায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রকৃতির সমতা (Nature's balance) দ্বীপের চতুর্দ্দিকে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিরুপায় হইয়া এখন বেজী বংশ ধ্বংস করিতে সেখানের অধিবাসীরা মনোযোগ দিল। কিন্তু বেজীর বংশ এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহা ধ্বংস করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য এবং দমনের নিমিত্ত কার্য্য প্রণালীর গতিও খুব মন্থর।

অনুরূপ কারণে ক্যানেডার প্রিন্স অফ্ এডওয়ার্ড দ্বীপের কৃষকেরা Skunk বংশ নির্ম্মূল করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এক সময়ে ঐ অঞ্চলে Skunkএর লোম-সম্বলিত চর্ম্ম বিলাসিতার সামগ্রী ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে যখন ইহা বিলাসিতার কোন প্রয়োজনে আসিল না তখন বহু ব্যবসায়ী ইহাদের হত্যা না করিয়াই ছাড়িয়া দিল। ঐ সকল জন্তু জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া প্রথমাবস্থায় ইঁদুর ও বুনো ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ইহাদের কোনরূপ শত্রু না থাকায় অসম্ভবরূপ বংশ বৃদ্ধি পাইল। ফলে খাদ্যাভাবে গৃহপালিত পাখী, ছাগল ও শস্য ধ্বংস করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেখানের অধিবাসীদিগের সমূহ ক্ষতি করিল। কৃষিকার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট Skunk দমনে মনোযোগ দিলেন এবং প্রত্যেক মৃত Skunkএর বিনিময়ে দুই শিলিং মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।

সময়ে সময়ে এক দেশ হইতে অন্য নূতন দেশে গৃহপালিত পশু স্থানান্তরিত করায় যে প্রকৃতির সমতাকে বিশৃঙ্খল করা হইয়াছে তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ বহু গৃহপালিত ছাগল সমভিব্যাহারে সেণ্ট হেলানায় অবতরণ করে। ঐ সময়

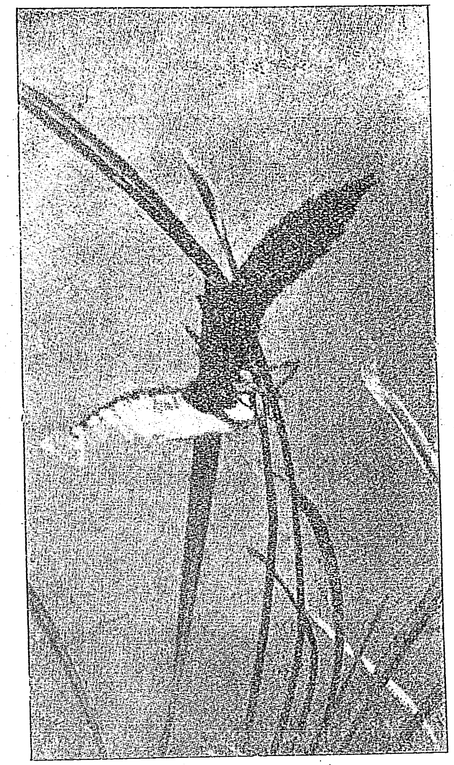

ড্রাগন ফ্লাই পতঙ্গ ও তাহার শিকার

দ্বীপটী বৃহৎ বৃক্ষ ও সতেজ তৃণগুল্মে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঐ সকল ছোট ছোট সতেজ উদ্ভিদ ছাগলের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় কয়েকবৎসর পরে ক্ষুদ্র দ্বীপটী বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়িল। বর্ত্তমানে এখনও সেখানে বসন্তকালে বৃক্ষে নূতন পত্রের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ভূমির অনুর্ব্বরতা-বশতঃ নিরামিষভোজী জীব কোনরূপে জীবন ধারণ করে।

প্লেগ রোগের বাহক ইঁদুর জাতির আবির্ভাবে মানুষ

কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছে তাহাও কয়েকটী ঘটনার উল্লেখে বুঝিতে পারা যায়। নিউসাউথ ওয়েল্‌সে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ইঁদুর বিনষ্ট করিবার কার্য্যকরী উপায় আবিষ্কারের জন্য ২৫,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত পুরস্কার লাভ করিতে কেহ সমর্থ হয় নাই। ইঁদুর-নিবারণী বেড়া, বিষাক্ত ঔষধ এবং ইঁদুর ধরিবার ফাঁদ প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য প্রণালী অবলম্বনে কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমানে ইঁদুরের অত্যাচার হ্রাস পাইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ইঁদুর দৃষ্ট হইলেও সামুদ্রিক বন্দর-সমূহে ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার

কাঁকড়ার সুদৃঢ় দাড়ায় মাছের আত্ম-সমর্পণ

আংশিক কারণ প্রকৃতির সমতার উপর মানুষের হস্তক্ষেপ। যদিও এ ক্ষেত্রে ইহা মানুষের অজ্ঞাতে ও আকস্মিকভাবে ঘটিয়াছে। কাল ও পিঙ্গল এই দুই জাতীয় ইঁদুর জাহাজ ও লোকালয়ের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নাকি এসিয়ার অধিবাসী।

প্রকাশ ১২০০ খৃঃ অব্দে এসিয়ার জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে অথবা অন্য কোন কারণে এক জাতীয় ইঁদুর এসিয়া ত্যাগ করিয়া ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হয়। মধ্যযুগীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে কিরূপে বৃহৎ ইঁদুরের দল ডানিউব (Danube) নদী সন্তরণে অতিক্রম করিয়া ইঁদুর-শূন্য দেশসমূহে গমন করিয়াছিল। বর্ত্তমানে সর্ব্বদেশে জলযানের গমনাগমনে ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধি পাইতেছে। উপস্থিত এই ইঁদুর বংশ ধ্বংস করিতে সকল সভ্য দেশই মনোযোগ দিয়াছে। কারণ ঐ সকল ইঁদুরের দ্বারাই প্লেগ নামক মারাত্মক ব্যাধির বিস্তার হইয়া থাকে।

অনেকেই কোন না কোন জীবজন্তুর শীকার ধরিবার কৌশল দেখিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে অনেকশ্রেণীর জলজীবেরা কিরূপ কৌশলে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবজগতে প্রকৃতির তুলাদণ্ড বা সমতা (Nature's balance) রক্ষা করে তাহার কয়েকটী চিত্র দেওয়া হইল। চিত্রগুলি কেবলমাত্র প্রকৃতির রাজ্যে হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইরূপ হত্যাকাণ্ডে অকালমৃত্যু সৃষ্টি-রহস্যে প্রয়োজন। কোন কোন জীব অতি নিরীহ জীবকে হত্যা করিয়া থাকে। যদিও এ দৃশ্য উপভোগ্য নহে তথাপি ইহার প্রয়োজন স্বীকার্য্য। তাহা না হইলে পৃথিবী জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত ফলে সর্ব্বত্রই প্রকৃতির সমতা (nature's balance) বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত।

বৃটেনের জলাশয়ে বহুভোজী পাইক (Pike) মৎস্যের

শীকার কৌশল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লম্বায় ইহারা পাঁচ ছয় ফিট ও ওজনে ত্রিশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়। মাথার উপরিভাগের মধ্যস্থলে বড় বড় চক্ষু দু'টী অবস্থিত। ইহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির মধ্যে শীকার একবার পড়িলে সহজে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না।

পাইক অলক্ষিতে শীকারের পশ্চাৎ অনুধাবন করে এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুখ গহ্বরে শীকারকে পুরিয়া লয়।

শীকারের প্রথম দর্শনে আক্রমণের পূর্ব্বে পাইক স্থিরভাবে অপেক্ষা করে। সে অবস্থায় তাহাদের দেখিয়া ইহাদের শক্তির হিংস্র স্বভাব অনুমান করা যায় না। এক-

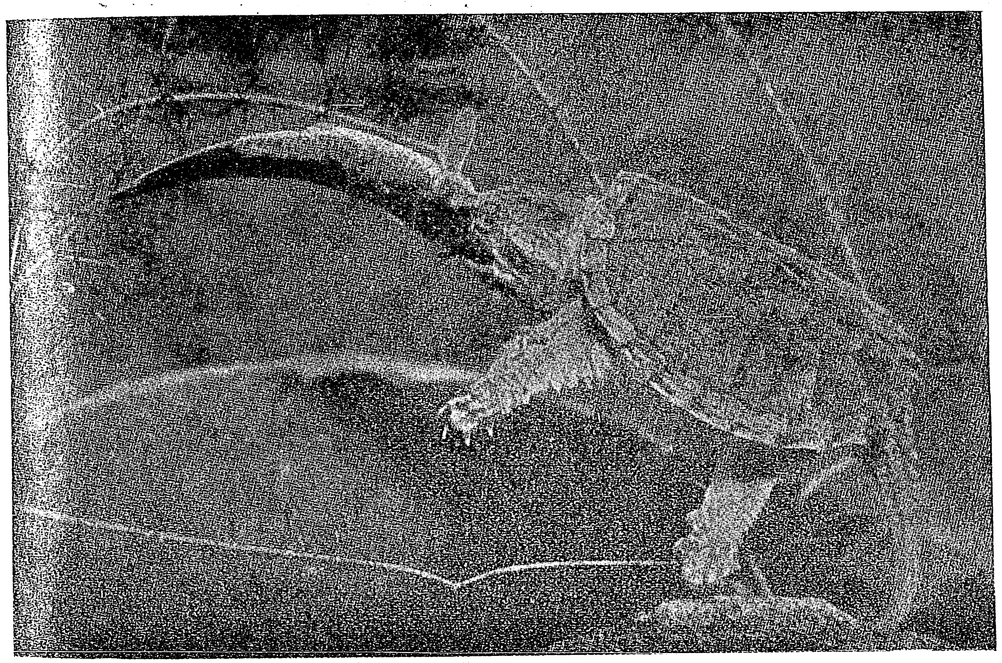

কচ্ছপের নিকট হইতে শীকারের আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা

জাতীয় পাইক জীবিত রাজহংসের মাথাও গলাধঃকরণ করিতে পারে। এইরূপ সংবাদও পাওয়া যায় যে কোন কোন জাতীয় পাইকের পাকস্থালী হইতে বহুবার মানবশিশু আবিষ্কার করা হইয়াছে। লণ্ডন-পশুশালায় পাইকের খাদ্য ধরিবার কৌশল দেখিবার জন্য দর্শকদের বেশ ভীড় জমিয়া যায়।

জোঁকের স্বভাব আরও হিংস্র। ছোট বড় শীকার কাহাকেও ইহারা বাদ দেয় না। পল্লীগ্রাম অঞ্চলের সকলেই ইহাদের ভাল করিয়া জানে। এরূপ কৌশলে ইহারা শীকারের শরীর মধ্যস্থ রক্ত শোষণ করিয়া লয় যে শীকার নিজেও তাহা অনুভব করিতে পারে না। যতখানি রক্ত না ইহাদের উদর পূর্ত্তির প্রয়োজনে লাগে তাহা অপেক্ষা বেশী রক্ত জোঁক শীকারের দেহ হইতে শোষণ করিয়া নষ্ট করে। ফলে অনেক সময় জোঁকের আক্রমণে মানুষকেও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। আফ্রিকার জঙ্গলে জোঁকের রক্ত শোষণে বলশালী জীবকেও মৃত্যু বরণ করিতে হয়। আমাদের দেশের জলাশয়ে বিশেষতঃ অব্যবহৃত জঙ্গলাকীর্ণ জলাতে ভীষণ মারাত্মক জোঁকের দর্শন পাওয়া যায়। জলে কোন জন্তুজানোয়ারের আগমনে ইহারা সুযোগ বুঝিয়া দেহের উপরে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত শোষণ করে। মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতিকেও বাদ দেয় না। একবার যদি পুকুরে ইহাদের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে মাছের বংশ ধ্বংস করিতে নাকি বেশী দিন লাগে না। সেইজন্য বিলাতের মৎস্য ব্যবসায়ী-গণ ইহাদের ডিম পাড়িবার সময় সমস্ত পুকুর হইতে আগাছা পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং আগাছা না থাকায় ডিমগুলি নষ্ট হইয়া যায় ফলে নূতন করিয়া জোঁকেরা বংশ বিস্তার করিতে

পারে না। কুমীরের শরীরের উপরিভাগের আবরণ ভেদ করিয়া রক্ত শোষণের কোন উপায় না থাকায় জোঁক ইহাদের মুখগহ্বর আক্রমণ করে। কুমীর ইহাদের আক্রমণের তাড়নায় মাঝে মাঝে ডাঙ্গায় উঠিয়া 'হাঁ' করিয়া পড়িয়া থাকে। কয়েক জাতীয় পাখী আছে যাহারা কুমীরের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। তাহারা নির্ভয়ে কুমীরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল জোঁক খাইয়া ফেলে। উপকারের বিনিময়ে কুমীর ইহাদের কোনরূপ ক্ষতি করে না।

সকল জলবাসী কচ্ছপই মাংসাশী। আমেরিকার জলাশয়ে লম্বায় ইহারা কয়েক ফিট পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের আত্মগোপন কৌশল অদ্ভুত বলিয়া সহজে শীকার ইহাদের উপস্থিতি বুঝিতে পারে না।

বৃটেনে সেপ্টেম্বর মাসের কাছাকাছি সময়ে 'টাইগার ওয়াটার-বিটল' নামক গোবরে-পোকা জাতীয় পতঙ্গের আক্রমণ হইতে সেখানের মৎস্য ব্যবসায়িগণ লাল মাছ রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। এই জাতীয় পতঙ্গের শুককীটও খাদ্য সংগ্রহে বিশেষ পারদর্শী। ইহাদের পরমায়ু কয়েক বৎসর মাত্র। রাত্রিকালে জলাভূমিতে আহারের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং উপযুক্ত স্থান পাইলেই আগাছার উপর ডিম পাড়ে। ইহাদের কাস্তে আকারের একজোড়া চুয়াল আছে। চুয়ালগুলির ভিতর ফাঁপা। শীকারের শরীরে এই চুয়াল দৃঢ়রূপে প্রবেশ করাইয়া রক্ত শোষণ করিয়া লয়। জলীয় পোকা, মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য।

গ্রীষ্মকালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আরও কয়েক জাতীয় দুষ্প্রাপ্য

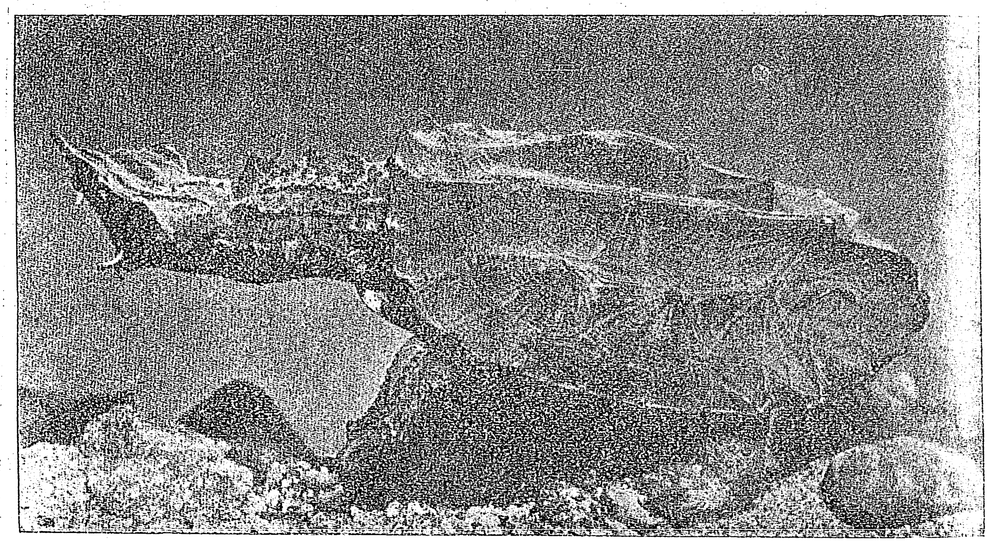

'মাতা মাতা' টেরাপিন শীকারকে প্রলোভন দেখাইতেছে

গিয়ানের কিম্ভূত কচ্ছপের শীকার-চাতুর্য্য অতুলনীয়। ইহাদের মুখের সম্মুখ ভাগের কিয়ৎ অংশ অদ্ভুত দেখিতে। সহজে প্রতারিত মাছ ঐরূপ অংশকে খাদ্য ভাবিয়া অগ্রসর হয়। কচ্ছপ মাছকে প্রতারণার জন্য সম্মুখ ভাগে মাথা অগ্রসর করিয়া এই অংশটীকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে। পরে ইহার প্রলোভনে আসিয়া শীকার যতক্ষণ না সুদৃঢ় চুয়ালের নাগালে আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত আক্রমণের কোন লক্ষণ বুঝিতে দেয় না। এই জাতীয় কচ্ছপ 'মাতামাতা' টেরাপিন নামে পরিচিত।

পতঙ্গকে শীকার অন্বেষণে ব্যস্ত দেখা যায়। ইহাদের ডানা ও শরীর বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। মশা, মাছি প্রভৃতির বংশ নাশ করিয়া সে সময় মানুষের বিশেষ উপকার করে। শীকার ধরিবার কৌশলও ওয়াটার বিট্‌লের অনুরূপ। ছোট বড় মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি জলীয় জীব ইহাদের খাদ্য। প্রকৃতির এই বিচিত্র জগতে এইরূপ কত যে জীব খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত নিজ নিজ স্বভাবজাত কৌশল তৎপরতার সহিত অবলম্বন করিতেছে তাহা মানুষের পক্ষে সকল সময়ে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না।

স্পেন-বিপ্লবের পটভূমিকা

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

স্পেন-বিপ্লবের নাটকীয় আকস্মিকতা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করলেও যাঁরা স্পেনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কাছে এ একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। যে অগ্নিপ্রবাহ সমস্ত স্পেনকে বিধ্বস্ত করেছে এবং যার জ্বলন্ত শিখা এক সময় সারা ইউরোপকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তা যে সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত নয় তা বলাই বাহুল্য। এর উৎস নিহিত রয়েছে সুদূর অতীতের তিমিরাচ্ছন্ন গর্ভে। স্পেনের আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক জীবন বিশ্লেষণ করলে এ কথাই মনে হবে যে, এই পরিস্থিতির এ রকম সংঘাত ছিল অনিবার্য। অবিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পেনে বহু শতাব্দী ধরে যে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, আচম্বিতে তা প্রকাশ পেয়েছে এই প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে।

বহু দিন ধরে স্পেন ইউরোপের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিল; ফলে অপরিচয়ের আবরণে সে বিদেশীর চোখে এক রহস্যময় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিশেষ ক'রে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—তার শৈলবন্ধুর জনপদের রোমান্টিক আবহাওয়া স্পেনকে ঘিরে একটি স্বপ্নময় আবেষ্টনী রচনা ক'রে রেখেছিল। স্পেন বলতে তাই মনে হ'ত এক বিচিত্র বর্ণরাগরঞ্জিত চিত্র; সেখানে নীলাভ আকাশের নীচে আঙুরের বন স্প্যানিশ রূপসীদের চটুল নৃত্যে চঞ্চল; গোলাপকুঞ্জগুলি মেষপালকদের গীটার-ধ্বনিতে মুখর। তার উন্মুক্ত প্রান্তর আর নিভৃত গিরি-কন্দর রোমান্সের লীলাভূমি। বিভিন্ন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে স্পেনের একটি শান্ত-মধুর পরম রমণীয় রূপ ফুটে উঠেছে।

সূর্যকরোদ্ভাসিত স্পেনের (Sunny Spain) এ নিতান্তই বাইরের রূপ। তার দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং গোলাপ-বীথির পিছনে লুকান ছিল অপরিসীম দারিদ্র্য; আপাত-দৃষ্টিতে সরল জীবনযাত্রা গোপন করেছিল তার দৈন্য ও হীনতা। রূঢ় বাস্তবের কঠিন আঘাতে যখন তার রোমান্টিক পটভূমিকা বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিশ্ববাসীর চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল অত্যন্ত প্রখর ভাবে। কল্পনার রঙীন জাল গেল ছিঁড়ে—প্রকাশ পেল সর্বহারা স্পেনের যথার্থ মূর্তি।

স্পেনের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে—যখন ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলার পরিণয়ের ফলে স্পেনের দুটি অঞ্চল কাস্টিল এবং এরাগন একসূত্রে গ্রথিত হ'ল। মধ্যযুগে স্পেন ছিল মুসলমান সাম্রাজ্যের অংশ—তার ছাপ আজও তার জাতীয় জীবনে রয়ে গেছে। ফার্দিনান্দ-ইসাবেলার শাসনকালে স্পেনে ইসলামের শেষ অধিকার গ্রানাডার পতন ঘট্‌ল এবং একটি অখণ্ড স্পেন রাষ্ট্রের পত্তন হ'ল। এঁদেরই আমলে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার ক'রে নতুন মহাদ্বীপে বিস্তীর্ণ স্পেনীয় উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত করেন। স্পেনের শ্রীবৃদ্ধি তাতে কিছু ঘট্‌ল বটে; কিন্তু সে সমৃদ্ধি জাতীয় জীবনের সমস্ত শ্রেণীকে স্পর্শ করে নি। মুষ্টিমেয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গই এতে বিশেষ লাভবান্ হ'ল। ফলে ব্যাপক আর্থিক উন্নতি ঘটে ওঠে নি। আমেরিকা থেকে যে ঐশ্বর্য-ধারা এসে স্প্যানিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিল, তা যদি সহস্র-ধারায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়্‌ত, তা হ'লে স্পেনের আর্থিক জীবনের বনিয়াদ হ'ত সুদৃঢ়, ঘট্‌ত শিল্পকলার প্রসার এবং দারিদ্র্যের কলঙ্ক থেকে স্পেন পেত মুক্তি। কিন্তু শ্রমবিমুখ অভিজাত-সম্প্রদায়ের আচরণ হ'ল আর্থিক উন্নতির পরিপন্থী। বিলাসের জালে জড়িয়ে পড়ে শিল্পকলার দিকে তাঁরা রইলেন উদাসীন। সনাতন-রীতির পরিবর্তন ক'রে জাতীয়-কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করার কোনও প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় নি। তার ওপর, প্রচণ্ড ধর্মান্ধতা আর্থিক অবনতির আর একটি কারণ। গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে শিল্পনিপুণ ইহুদী এবং মূরদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার ফলে শিল্প-প্রসারের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়ে দাঁড়াল।

এরই পরিণামে ইউরোপের বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আয়তনে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও স্পেন আজও অত্যন্ত দরিদ্র এবং সর্ব বিষয়ে অনুন্নত। শিল্প-বিপ্লবের পর অন্যান্য

ইউরোপীয় দেশ অগ্রসর হয়ে গেলেও স্পেন তাদের সঙ্গে পা ফেলে চল্‌তে পারে নি; ফলে সে রয়ে গেল মধ্যযুগীয় অন্ধকারে। ধনিকতন্ত্রের আবির্ভাব যখন একে একে ইউরোপের সমস্ত দেশগুলির সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাল তখনও স্পেনে অটুট রইল প্রাচীন-পন্থী সমাজ-শাসন। সামন্ততন্ত্রের শেষ আশ্রয় হ'ল স্পেন। এই অভিজাতবর্গের প্রতিপত্তির সঙ্গে বজায় রইল যাজক-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য—অক্ষুণ্ণ রইল প্রাচীনপন্থী সেনানীবৃন্দের দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

জমিদারবর্গ, যাজক-মণ্ডলী এবং সেনানীবৃন্দ—এই ত্রিশক্তি স্পেনের পুরাতনপন্থী সমাজের তিনটি স্তম্ভ। এই ত্রিশক্তির সহযোগিতায় স্পেনে বহুদিন (১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও স্পেন তার চারশো বছর আগেকার দুঃস্থ অবস্থার বিশেষ উন্নতি-সাধন করতে পারে নি। অত্যাচারী শাসক-সম্প্রদায়ের উৎপীড়নে স্পেন ছিল পূর্বের মতোই নিষ্পীড়িত। দেশের শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন লোকই ছিল নিরক্ষর। জমিদারদের অত্যাচারে কৃষাণকুল ছিল জর্জরিত; পুঁজিপতিদের স্বৈরাচারে নিঃস্ব শ্রমিকবৃন্দ ছিল ক্রীতদাসের মতই হীনদশাগ্রস্ত। দেশের দুরবস্থা প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, তা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্পেনের রাষ্ট্রবিপ্লবের পটভূমিকা হচ্ছে এই ক্রমবর্ধমান দেশব্যাপী নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য—তার অনুন্নত সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা। বহুবর্ষ ধরে স্পেনে যে শোষণ-কার্য চল্‌ছিল এ অন্তর্বিপ্লব তারই প্রতিক্রিয়া।

অথচ সুনিয়ন্ত্রিত হ'লে স্পেনের আর্থিক জীবন এত নিম্নস্তরের হবার কথা নয়; কেন না, প্রকৃতিদত্ত সম্পদ তার শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে সুপ্রচুর। কয়লার অভাব থাক্‌লেও অন্যান্য খনিজপদার্থের প্রাচুর্য যথেষ্ট। কিন্তু সে সবের খনি প্রায়ই বিদেশীর কবলে। ফলে তা দেশীয় শিল্প-গঠনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পেন কৃষি-প্রধান দেশ। অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিকর্মের ওপর নির্ভর করে উপজীবিকার জন্য। গম ও যব এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি-প্রণালী এখানে অজানা বল্‌লেই হয় এবং এর জন্য দায়ী সামন্তবৃন্দ—যাঁরা জমির মালিক। এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে স্পেনের অবস্থার সাদৃশ্য বিস্ময়কর। স্পেনের বহু অঞ্চলে বৃষ্টির অভাব—কৃত্রিম উপায়ে সেচের বন্দোবস্ত না করলে কৃষিকর্ম অসম্ভব। অথচ, ভারতের মতই এখানে সেচের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। দেশের অধিকাংশ জমিই কয়েকজন ধনশালী জমিদারের হাতে। হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছে, মাত্র পঞ্চাশ হাজার জমিদারের অধিকারে রয়েছে দেশের অর্ধেকেরও ওপর জমি অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা একভাগের দখলে রয়েছে শতকরা একান্ন ভাগ ভূমি। কৃষাণদের অধিকাংশেরই কোনও জমি নেই; লোকসংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগই এই দলে পড়ে। যাদের আছে তাদেরও অধিকাংশেরই ভাগে মাথা-পিছু তিন একরের বেশী জোটেনি। এ অবস্থায় কৃষিকার্যে যথেষ্ট লাভ হওয়া সম্ভব নয়। ফলে, সাড়ে আট লক্ষ কৃষাণের দৈনিক আয় গড়পড়তা সাড়ে পাঁচ আনার অতিরিক্ত ছিল না। ভারতীয় জমিদারের মত অধিকাংশ জমিদারই গ্রামের মায়া কাটিয়ে শহরে প্রবাসী হয়ে থাকেন; বৃটিশ জমিদারদের মত তাঁরা জমিদারীর উন্নতি করতে বিন্দুমাত্র প্রয়াস পান না। জমির উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করা প্রয়োজন তা কৃষাণদের সামর্থ্যের বাইরে; সুতরাং কৃষিকার্য যে নিতান্ত নিম্নস্তরের হবে এ আর বিচিত্র কি? অথচ চাষীর কাছ থেকে পাওনা আদায় করতে কেউই পশ্চাৎপদ নন। ফলে এদের জীবনযাত্রার নিরিখ যে খুবই সাধারণ তা সহজেই বোঝা যায়।

স্পেনের স্বেচ্ছাতন্ত্রের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল তার সেনা-বাহিনী। সেনাপতিদের সংখ্যাধিক্য তার একটা বৈশিষ্ট্য। সমগ্র স্প্যানিশ্ বাহিনীতে সর্বসুদ্ধ ছ'শো বত্রিশ জন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং প্রায় একুশ হাজার উচ্চপদাধিকারী কর্মচারী ছিল অর্থাৎ ছ'জন সাধারণ সেনার জন্য ছিল একজন ক'রে নায়ক। গুন্‌থার বল্‌ছেন, বোধ করি কাইজারের বিরাট বাহিনীতেও এত বেশী অফিসার ছিল না। সরকারী আয়ের সিকি ভাগ যেত এই শ্বেতহস্তী পোষণ করতে। এদের প্রতাপ ছিল অসামান্য এবং সামন্ততন্ত্রের বিশেষ সুবিধা সমস্তই এরা ভোগ ক'রত সাম্প্রতিক কালেও।

স্পেনের জাতীয় জীবনে যাজক-সম্প্রদায় চিরকালই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। ষোড়শ শতাব্দীর যে ধর্মগত বিরোধ ইউরোপের জীবনীশক্তির ব্যর্থ অপচয় ঘটিয়েছিল তার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল স্পেন। ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট্‌দের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা উঠ্‌লেই মনে পড়ে স্পেনের পাষণ্ডসংযম সভার (Spanish Inquisition) নৃশংস

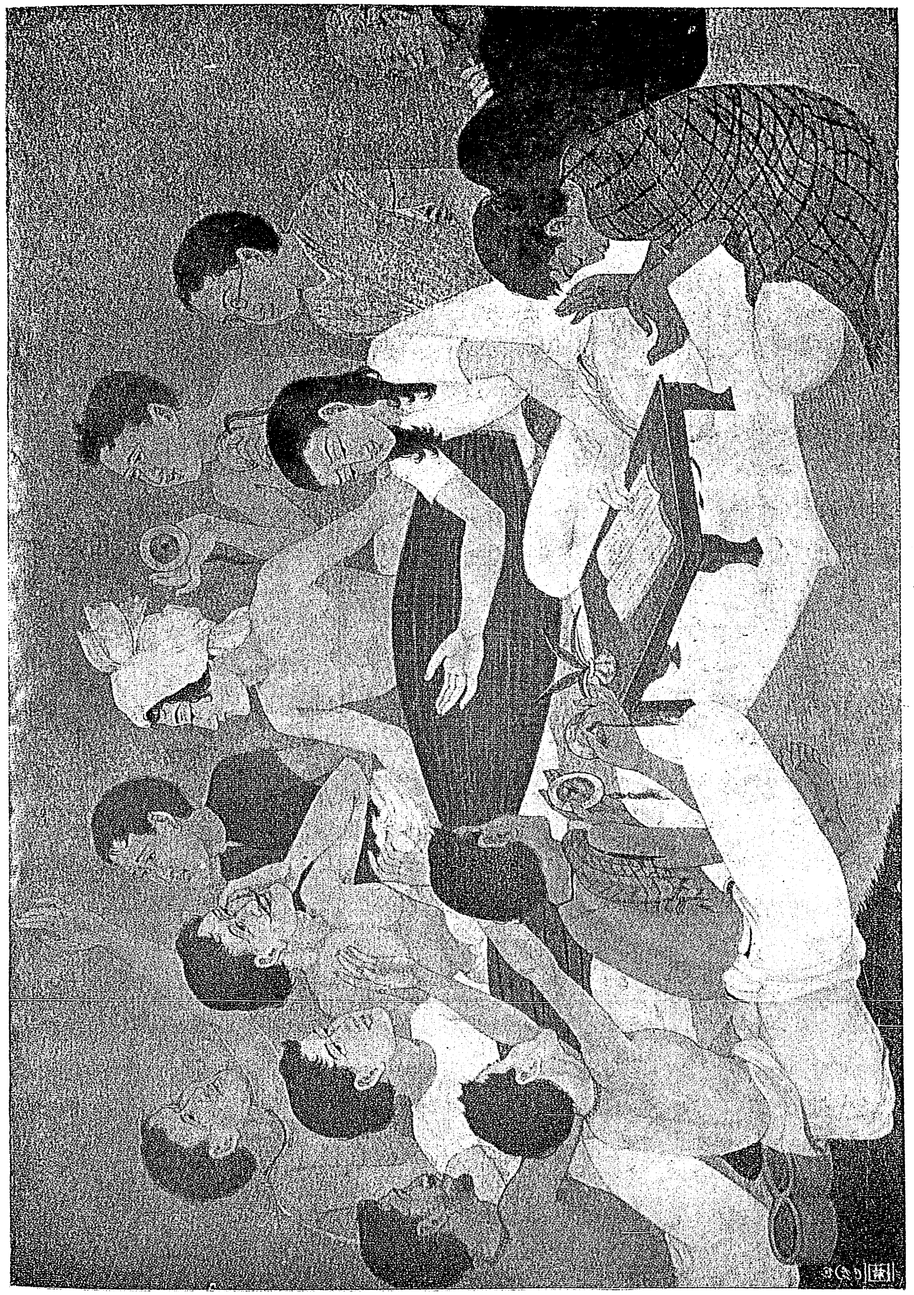

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মনসার গান

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রায়

নির্মমতা—যার অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রাণহীন দেহ স্পেনের মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সেই পাষণ্ডদলন সংসদ আজ ইতিহাসের পাতায় স্পেনের কলঙ্ককাহিনীরূপে বিরাজ কর্‌ছে বটে—বাস্তবে তার অস্তিত্ব আজ আর নেই—কিন্তু তার অতীত প্রভাবের সাক্ষ্য-স্বরূপ ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। স্পেনের ধর্মসমাজ (Church) এবং যাজক-গোষ্ঠি সুসংবদ্ধ এবং অমিত প্রভাব-শালী; আচার্যেরা (Priests) রাষ্ট্রের আশ্রিত এবং সরকারী বৃত্তিভোগী এবং ধর্মসমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্পেনে মঠ ছিল অগণিত এবং ধর্মযাজকদের সংখ্যা চল্লিশ হাজারের ঊর্ধ্বে। এই দীক্ষাগুরুরা সুধু পাষণ্ড-দলন ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, স্পেনের শিক্ষাগুরুও ছিলেন এঁরাই। স্পেনের শিক্ষাদানকার্য সম্পূর্ণ ছিল চার্চের হাতে; ফলে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও শতকরা পঞ্চান্ন জন অজ্ঞানের তিমিরে রয়ে গেল। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়-গুলির অর্থ-সম্পদও ছিল প্রচুর এবং বহু শিল্প এঁরা করতলগত করেছিলেন। ব্যাঙ্ক, রেলপথ, কমলালেবুর চাষ—কিছুই এঁদের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াতে পারে নি; ফলে স্পেনীয় জনসাধারণের শুধু পারমার্থিক নয়, আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্রাও অনেকটা ধর্মসমাজই নিয়ন্ত্রিত ক'রে এসেছে। ধর্মসমাজের এই প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রচুর ঐশ্বর্য যাজক-সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি ঘটিয়েছিল এবং তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে জনসাধারণকে শোষণ কর্‌বার যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী হচ্ছে ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রসারের যুগ। একে একে বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি ধসে পড়্‌ল এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসন-বিধি প্রতিষ্ঠিত হ'ল প্রায় সর্বত্র। এই প্লাবনের মুখে স্পেনের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের আসন উঠল কেঁপে এবং সেখানেও গণ-জাগরণের সূচনা দেখা দিল। ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের একটা কাঠামো স্পেনেও খাড়া হ'ল। কিন্তু সমর-নায়কদের প্রভাবে গণতন্ত্র এখানে বিশেষ মাথা তুল্‌তে পারে নি; স্পেনের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দীতে গড়ে তোলে সামরিক নেতৃবৃন্দই।

রাজা ত্রয়োদশ আলফন্‌সো রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়ে শাসন-বিধি (constitution) উপেক্ষা ক'রে সুরু কর্‌লেন স্বেচ্ছাচারের অভিযান। তাঁর স্বৈরাচারে স্পেনে জ্বলে উঠ্‌ল অশান্তির অনল। ধ্বংসোন্মুখ রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ প্রাইমো দ্য রিভেরা অতর্কিতে শাসনক্ষমতা নিলেন স্বহস্তে (১৯২৩); প্রতিষ্ঠিত কর্‌লেন সামরিক কর্তৃত্ব (military dictatorship)। কিন্তু এ ব্যবস্থাও স্থায়ী হ'ল না। জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষে শঙ্কিত হয়ে প্রাইমো দ্য রিভেরা স্পেনের শাসনতন্ত্রের স্বরূপ গোপন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন গণতান্ত্রিক আবরণের অন্তরালে। স্থাপন করা হ'ল এক ব্যবস্থা-পরিষদ, যার সদস্যেরা হলেন নির্বাচিত নয়—ডিক্‌টেটরের মনোনীত। কিন্তু স্পেনের বহুবিধ সমস্যার কোনটিরই এ ব্যবস্থায় সমাধান ঘট্‌ল না। ফলে, প্রাইমো দ্য রিভেরার প্রভাবের ঘট্‌ল অবসান—হ'ল তাঁর ডিক্‌টেটরী শাসনপ্রণালীর অন্তিম দশা (১৯৩০)।

এবার আসরে এলেন আর এক সৈন্যাধ্যক্ষ—বেরেঙ্গুয়ের (General Berenguer)। কিন্তু রাজতন্ত্রের দিন তখন ঘনিয়ে এসেছে। পিরেনিজের ওপার থেকে উদারনৈতিক ভাবধারা ধীরে ধীরে স্পেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। জনসাধারণ দাবী কর্‌ছিল পুরাতন সমাজবিধির আমূল সংস্কার—স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে কাটালোনিয়াতে সাম্যবাদ প্রসার লাভ কর্‌ছিল; জনসাধারণ সামন্ততন্ত্রের অক্ষমতায় এতই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, ক্রমেই সর্বহারা শ্রমিক এবং কৃষাণের দল নৈরাষ্ট্রবাদে (Anarchism) বিশ্বাসী হয়ে উঠ্‌ছিল।

১৯৩১এ স্পেনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের অবতারণা হ'ল। এপ্রিল মাসে পৌর-নির্বাচন দ্বন্দ্বে সর্বত্র গণতন্ত্রীরা অপূর্ব সাফল্য লাভ কর্‌ল। ফলে তাসের প্রাসাদের মত ডিক্‌টেটরী শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়্‌ল; রাজা ত্রয়োদশ আল্‌ফন্‌সো সিংহাসন ত্যাগ ক'রে হলেন পলাতক। প্রায় পাঁচশো বছর যে বুর্বঁ বংশ স্পেনে রাজত্ব ক'রে এসেছিল এতদিনে তাদের আধিপত্যের পরিসমাপ্তি ঘট্‌ল। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনমত এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত কর্‌বার জন্য এক বিন্দুও রক্তপাত হয় নি; একটি

কামানও ছুঁড়্‌তে হয়'নি। ছিন্নমূল তরুর মত তা আপনিই ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌ল।

এবার এল গণতন্ত্রের যুগ। ক্ষমতা এল বামমার্গীয় নয়—মধ্যপন্থীদের হাতে। সেনর আজানার নেতৃত্বে একটি গঠনতন্ত্র রচিত হ'ল। কর্টেজ বা জাতীয় পরিষদ হ'ল একটি মাত্র—ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত তার দুটি গৃহ নয়। সর্বশ্রেণীর নাগরিককে দেওয়া হ'ল ভোটের অধিকার। ল্যাটিন দেশগুলির কোথাও নারীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার নেই; এমন কি প্রগতিশীল ফ্রান্সেও না। স্পেনেই প্রথম সে রীতির ব্যতিক্রম ক'রে ভোটের অধিকার দেওয়া হ'ল মহিলাদের এই নতুন শাসন-ব্যবস্থায়।

শাসনতন্ত্র রচিত হবার পরই গণতন্ত্রী সরকার দৃষ্টি দিলে স্পেনের সমস্যাগুলি মেটাবার দিকে। তাদের প্রথম কাজ হ'ল রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম সমাজের সম্পর্ক ছেদ করা। জেসুইট সম্প্রদায়ের যে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি ছিল স্পেনে তা বাজেয়াপ্ত করা হ'ল। তাদের হাত থেকে শিক্ষা বিস্তারের ভার দিয়ে দেওয়া হ'ল রাষ্ট্রের হাতে। কিন্তু তাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি গণতন্ত্রী আমলেও; স্পেনীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে তারা সরকারের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

স্পেনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য থাক্‌লেও কোন কোনও অঞ্চলের উগ্র প্রাদেশিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য-কামনা একটি অখণ্ড স্পেনীয় জাতি গড়ে তুল্‌তে দেয় নি। পূর্বে কাটালোনিয়া এবং উত্তরে বাস্ক প্রদেশগুলি স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। এদের দাবী পূর্ণমাত্রায় মেটাতে গেলে স্পেনকে বহু ভাগে বিভক্ত করতে হয়—লোপ পায় তার অখণ্ড জাতীয়তা। তাই কাটালানদের তুষ্ট কর্‌বার জন্য গণতন্ত্রী সরকার দেয় এদের পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্ব-শাসন এবং তাদের স্বতন্ত্র ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষা কর্‌বার প্রতিশ্রুতি, যদিও এদের ওপর জাতীয় পরিষদের আধিপত্য রইল অব্যাহত।

গণতন্ত্রী সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে। শিক্ষামন্ত্রী ফার্ণান্দো দ্য লস রাইও স্বল্পকালের মধ্যে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে দশ হাজার বিদ্যালয় স্থাপন কর্‌লেন। সুদূর গ্রাম্য প্রদেশে শিক্ষা বিস্তার কল্পে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হ'ল। গ্রামে গ্রামে পাঠান হ'ল ভ্রাম্যমান শিক্ষা-সংসদ: এরা নিরক্ষর গ্রামবাসীদের বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। এক বৎসরে দেড় হাজার গ্রাম্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি হ'ল আমূল সংস্কৃত। প্রগতিশীল ছাত্র-সমাজও এই শিক্ষাপ্রসার-আন্দোলনে সানন্দে যোগ দিলে। মাদ্রিদ, সেভিল, সেগোভিয়া এবং ভ্যালেন্সিয়াতে গড়ে উঠ্‌ল 'গণ বিশ্ববিদ্যালয়' বা People's University. এখানে তরুণ বিদ্যার্থীরা নিরক্ষর কৃষাণ এবং শ্রমিকদের মধ্যে অধ্যাপনা কার্যে ব্যাপৃত রইল।

আর্থিক-সঙ্কট দূর কর্‌বার চেষ্টায় গণতন্ত্রী সরকার কৃষিকর্মের উন্নতির দিকে নজর দিলে। কিন্তু এখানে জমির-সমস্যা মেটাতে গিয়ে ঘট্‌ল বিপত্তি। বিস্তীর্ণ জমিদারী ভাগ ক'রে চাষীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করার প্রস্তাব হ'ল। সরকারের অভিপ্রায়ের আভাষ পেয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ সানহুরো কর্‌লেন বিদ্রোহ। একদিনের মধ্যেই এ বিদ্রোহ প্রশমিত হ'ল; বিদ্রোহী জমিদারদের দখল থেকে জমি আদায় ক'রে নিয়ে তা কৃষাণদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ল। সেচের বন্দোবস্তও হ'ল কিছু, ফলে কৃষাণের আর্থিক দুর্দশার অবসান হবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

স্বল্পকালের মধ্যে গণতন্ত্রী সরকার যা-কিছু করেছিল তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। বিক্ষুব্ধ ধর্মযাজক-গোষ্ঠী, জমিদারবর্গ এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের চেষ্টায় আজানার শাসনকালের হ'ল অবসান—ক্ষমতা এল দক্ষিণপন্থীদের হাতে। সেনর লেরু হলেন এদের নেতা। বামপন্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌ল সরকারের দমন-নীতির প্রতিবাদে ১৯৩৪ সালে। নিতান্ত নির্মমভাবে তা ঠেকান হ'ল। আষ্টুরিয়াসে নির্যাতিত শ্রমিকমণ্ডলীর অভ্যুত্থান দমন করতে গিয়ে প্রায় চোদ্দশো লোক নিহত করা হ'ল। স্পেনে প্রগতির যে দ্যুতি দেখা গিয়েছিল তা বিদ্যুৎশিখার মতই চকিতে নির্বাপিত হ'ল—সুরু হ'ল আবার প্রতিক্রিয়াপন্থীদলের অবাধ লীলা।

এর জন্য বামপন্থীরা কতকটা যে দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে ছিল অনৈক্য এবং নেতৃত্বের অভাব। লেনিনের যে দূরদৃষ্টি এবং নেতৃত্ব রুশ-বিপ্লবকে সাফল্য-মণ্ডিত করেছে সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং কর্মপটুতা স্পেনের সংস্কারকামী নেতাদের মধ্যে ছিল না। গণতন্ত্রের প্রথম যুগে তাদের মধ্যে খানিকটা একতা দেখা গেলেও তা স্থায়ী

হয় নি। এনার্কিস্ট, সিণ্ডিক্যালিস্ট এবং সোস্যালিস্ট—এই ত্রিবিধ বামপন্থীদলের মিলন হ'লে দক্ষিণপন্থীদের পরাভূত করতে পারা যেত গণতন্ত্রের সুরুতেই এবং অক্ষুণ্ণ রাখা যেত বরাবর বামপন্থীদের প্রতিপত্তি। কিন্তু এই মিলন সম্ভব না হওয়ায় ক্যাথলিক নেতা গিল রোব্‌ল্‌স্ এবং প্রতিক্রিয়াশীল লেরুর হাতে পড়্‌ল গণতন্ত্রের শাসনভার।

এই দক্ষিণপন্থী সরকারের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বামমার্গীয়েরা পপুলার ফ্রন্ট গঠন করতে বাধ্য হ'ল ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। এই বাম-সংহতি ঐ বৎসর নির্বাচন-দ্বন্দ্বে বিজয়-গৌরব লাভ কর্‌ল—আবার প্রাচীনপন্থীদের হ'ল শোচনীয় পরাভব। ক্ষমতা-বিলোপ অনিবার্য দেখে দক্ষিণপন্থীরা আর নিয়মতান্ত্রিকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রইল না—তাদের মুখোস খুলে ফেলে তারা খোলাখুলি অগ্রসর হ'ল স্পেন-গণতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনে। দেখা দিল ফ্যাসিজ্‌মের বর্বর রূপ—তাদের উদ্দেশ্য স্পেনের কল্যাণ নয়—তাদের অভীষ্ট, কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা। তাদের উদ্দেশ্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা নয়—অন্যায় কায়েম করা। তাদের অভিপ্রায় স্পেনের জাতীয় প্রগতি নয়—তাদের অভিসন্ধি, সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করা।

এই হচ্ছে স্পেন বিপ্লবের পটভূমিকা। এই বিপ্লবের একদিকে ছিল—আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত স্পেনের গণতন্ত্রী সরকার; উদারনৈতিক এবং সাম্যবাদী সমস্ত দলই ছিল সরকার পক্ষে এবং তাদের পিছনে ছিল স্পেনের নির্যাতীত কৃষাণ এবং শ্রমিকমণ্ডলী। স্বাতন্ত্র্যকামী কাটালান ক্যাথলিক বাস্করাও ছিল এই দিকে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও সরকারের সহায়তা করেছে। অন্যদিকে ছিল—সেনাবাহিনী, যাজক সম্প্রদায় এবং জমিদারবর্গ অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী সমাজের তিনটি স্তম্ভ। এদের নেতৃত্ব করেছে ক্যালান্‌জিষ্টরা—যারা হচ্ছে স্পেনের ফ্যাসিস্ট্ সম্প্রদায়। বিদ্রোহী স্পেনবাহিনীতে ছিল প্রচুর জার্মান, ইতালীয়ান এবং মুর সেনা। কাজেই একে অন্তর্বিপ্লব না বলে, বলা উচিত প্রগতি-বিরোধী স্পেনীয়দের সহায়তায় স্পেনে ফ্যাসিষ্ট অভিযান।

এই অভিযানের সুরু হয় ১৯৩৬ এর ১৮ই জুলাই। এর ভূমিকা নিতান্ত সাধারণ। ৪ঠা মার্চ তারিখে লেফ্‌টেনাণ্ট কাস্তিলো নিহত হন আততায়ীর গুলিতে। তিনি ছিলেন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী; তাঁর হত্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁর কয়েকজন বন্ধু হত্যা করে সেনর সোতেলোকে—সোতেলো ছিলেন স্পেনের ফ্যাসিষ্টদের নেতা। ফলে যে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল তা অচিরেই ছড়িয়ে পড়্‌ল স্পেনে এবং স্বল্পকালের মধ্যে এক বিরাট দাবানল প্রজ্বলিত হ'ল যার সমগ্র পরিসমাপ্তি ঘটেছে মাদ্রিদের পতনের পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে।

জেনারেল ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কো এই বিপ্লবে ছিলেন দক্ষিণপন্থীদের নেতা এবং তাঁরই আধিপত্য এখন স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রাঙ্কো ছিলেন স্প্যানিশ মরক্কোতে স্পেনীয় বৈদেশিক বাহিনীর অধিনায়ক। এ বিপ্লব সহসা ঘটে ওঠেনি; বরঞ্চ তা পূর্ব-প্রকাশিত। একই দিনে মাদ্রিদ, বার্সেলোনা এবং ভ্যালেন্সিয়া প্রভৃতি বৃহত্তর শহরে একই সঙ্গে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে; সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এদের হাতে থাকায় এদের সাফল্যলাভ কিছুমাত্র কঠিন হয়নি। সমস্ত শিক্ষিত সেনা বিপক্ষে যোগদান করায় সরকার পক্ষের অসুবিধা অত্যন্ত তীব্র হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু স্বল্প-শিক্ষিত সামরিক স্বেচ্ছাসেবকেরা যেভাবে অটল বিক্রমে বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে তা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। আর এখানে ফ্যাসিষ্টরা অসামরিক জনসাধারণকে নির্মমভাবে বোমা-বর্ষণ করে যেভাবে হত্যা করেছে তারও তুলনা ইতিহাসে অল্পই মেলে। শ্রেণী-সংঘর্ষের তীব্রতম উলঙ্গ রূপ দেখা গিয়েছে স্পেনের এই ঘরোয়া বিবাদে।

স্পেন-বিপ্লব একটি অনন্যসংলগ্ন স্বতন্ত্র ঘটনা নয়। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে দ্বন্দ্ব চলেছে বাম ও দক্ষিণ পন্থীদের মধ্যে এ তারই একটি বিকাশ। এখানে দ্বন্দ্ব ব্যক্তি-বিশেষ বা জাতিবিশেষকে নিয়ে নয়—এখানে বিরোধ মানব-জাতির ভবিষ্যৎ প্রগতি এবং কল্যাণ নিয়ে। এ কথা আজ অজানা নেই যে, ফ্রাঙ্কোর বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র দুটির আন্তরিক সহযোগিতা এবং গণতন্ত্রী রাজ্যগুলির উদাসীনতা। বাস্তবিক পক্ষে এখন ফ্রান্স ও বৃটেনের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা হচ্ছেন প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিষ্ট্, কাজেই ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে তাঁদের রয়েছে নীতিগত ঐক্য এবং আদর্শের মিল। যদিও ফ্রাঙ্কো গণতন্ত্রের পরিপন্থী এবং সার্বভৌম নায়কত্বের পক্ষপাতী, তবুও শ্রেণীগত

স্বার্থের দিক থেকে তাঁর মিল যেমন হিট্‌লার-মুসোলিনীর সঙ্গে, তেমনই চেম্বারলেন-দালাদিয়ের সঙ্গে। সুতরাং যে নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন ক'রে বৃটেন এবং ফ্রান্স প্রকারান্তরে স্পেনীয় সরকারের বিরোধিতা এবং ফ্রাঙ্কোর সহায়তা করেছে তা তাদের পক্ষে বিশেষ অসঙ্গত মনে করা ভুল হবে।

স্পেনে বিজয়লাভ করলেও ফ্যাসিজ্‌মের স্থায়ী সাফল্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়ে যায়নি। নির্যাতীত সর্বহারার দল সর্ব দেশেই আত্ম-অবিশ্বাসী এবং সংহতিহীন। বহু যুগের অত্যাচারে তাদের আত্মা হয়ে উঠেছে নিষ্পেষিত; ফলে জাগরণের আলো এখনও এদের মধ্যে সর্বত্র পৌঁছয়নি। পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক সম্প্রদায় সর্বত্রই সুসংবদ্ধ এবং আত্ম-সচেতন। আত্মরক্ষার সমস্ত অস্ত্রই এদের হাতে; কাজেই ন্যায়ে হোক, অন্যায়ে হোক তারা স্বাধিকার অটুট রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। কিন্তু যখন দেখা যাবে আর্থিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে পুরাতন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব তখন তা খসে পড়্‌বে জীর্ণ বস্ত্রের মত। নতুন রূপ পরিগ্রহ করে তখন এক নবীন মানব-সমাজ জেগে উঠ্‌বে, ন্যায় এবং সত্যে হবে যার প্রতিষ্ঠা এবং সাম্য ও ঐক্য হবে যার ভিত্তি। কল্যাণের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'—এ কথাই স্পেন মনে করিয়ে দিচ্ছে। কাজেই স্পেনে গণতন্ত্রের পতনে নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই; কেন না, সাময়িকভাবে প্রতিহত হলেও মানব সভ্যতার বিজয়-রথ সগৌরবে এগিয়ে চল্‌বে বহু সঙ্কট অতিক্রম করে এবং বহু বিপর্যয় পিছনে ফেলে।

শ্রাবণের দীঘি

কাদের নওয়াজ

১

শ্রাবণের দীঘি, ভরিয়াছে জলে, কানায় কানায়
কূলে কূলে ঢেউ ফুলে ফুলে উঠে' সোহাগ জানায়;
পানিকো'র উড়ে, ডাকপাখী ডাকে,
ডুবুরী বেড়ায় শেওলার ফাঁকে,
ভেসে উঠি' জলে সফরী লুকায় 'টোপর্‌-পানায়'।

২

হে দীঘি! তোমার দুই তট যেন প্রেমিক প্রিয়া,
চুম্বন দিতে আসিতেছে সরি' তৃষিত হিয়া;
কিন্তু সলিল প্রহরীর মত,
মধ্যে দাঁড়ায়ে আছে অবিরত,
মুখোমুখী চেয়ে তাই তারা কাঁদে বিরহ নিয়া।

৩

"কমলে কামিনী"—জানিনে আজিকে কোথায় রাজে,
"কালিদহ"—সে কি ছিল এ দীঘির বক্ষ মাঝে?
সে সব খবর কেউ নাহি জানে,
অমল কমল শুধু এইখানে;—
দেখি, আর ভাবি অতীতের কথা সকাল সাঁঝে।

৪

হে দীঘি! তোমার বুকে বারিরাশি অঝোর ঝরে,
কেয়াবধূ তার ঘোম্‌টা খুলিয়া সোহাগ ভরে—
ঢলি' পড়ে সাঁঝে কভু তব তীরে,
'কোয়া'-পাখী ডাকে, হাওয়া বহে ধীরে;
শ্রাবণের দীঘি শ্রাবণ তোমারে আদর করে।

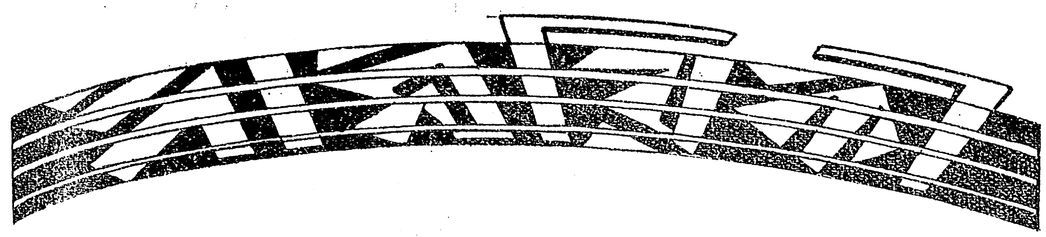

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। ছাত্রদত্ত পরীক্ষার ফি অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য এই আয়বৃদ্ধি একটা সাময়িক ঘটনা। ইহার উপর নির্ভর করা চলে না বলিয়াই শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের যে মোটামুটি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের আয়ের পরই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদত্ত পরীক্ষার ফি'র উপরই সব চেয়ে বেশী নির্ভর করিয়া থাকেন। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ সর্ব্বসমেত পাঁচ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। এই অবস্থায় বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে পন্থার আশ্রয় লইয়াছেন তাহা জন-শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরীক্ষার ফি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে ফি'এর টাকা জোগানো কি রকম কঠিন হইয়া উঠিতেছে তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। কিন্তু তথাপি কুলাইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশ করিতেছেন এবং টানিয়া টানিয়া তাহার আয়ও তিন লক্ষ টাকায় তুলিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা মাড়োয়ারী বুদ্ধিকেও হার মানাইয়াছে। যাহাতে কোন বই পরবর্ত্তী বৎসরে কাজে না লাগে, তাহার জন্য দুই-একটি অংশের অদল-বদল করিয়া প্রতি বৎসরই অভিভাবকদের বই কিনিতে বাধ্য করিতেছেন। অভিভাবকদের পক্ষে তাহা যে কতদূর কষ্টকর তাহা হিসাব করিয়া দেখিবারও তাঁহাদের অবকাশ নাই। সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা কিনিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু যাহারা বাকি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা জোগাইয়া চোর সাজিয়াছে তাহাদের কথার কোন মূল্যই দেওয়া হয় না।

যদি জ্ঞান এবং শিক্ষার আলো বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সার্থকতা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেই শিক্ষা সুলভ এবং সহজলভ্য করিতে হইবে। সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির আশা বোধ হয় নাই। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-বাহুল্য ছাঁটিয়া ফেলাই একমাত্র পন্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস। ভদ্র-লোকদের যখন ছেলে না পড়াইয়া উপায় নাই, তখন যেখান হইতে পারেন শিক্ষার কড়ি তাঁহারা জোগাড় করিবেনই, এ মনোভাব একচেটিয়া ব্যবসাদারদের সাজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়।

সত্যাগ্রহ শাসন—

এবারের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই বৈঠকে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার একটি এই যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মতি গ্রহণ না করিয়া কোন কংগ্রেস সদস্য সত্যাগ্রহ করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে বামপন্থীগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাব এবং আরও কয়েকটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য নিখিল ভারত দিবসও ধার্য্য করিয়াছেন।

এ কথা সত্য যে, রাজকোটের পরে "নব নব আলো দর্শনের" ফলেই এই প্রস্তাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য সত্যাগ্রহ শাসন। দেশীয় রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহের যে আগ্রহ উঁকি দিতেছে, নানা প্রকার বিধি-নিষেধের বেড়াজালে মহাত্মাজি তাহা শৃঙ্খলিত করিতে চান। ইতিপূর্ব্বে সত্যাগ্রহীর জন্য কি কি আবশ্যকীয় গুণপনার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে হরিজন পত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। এখন সেই গুণপনা

যাঁহাদের আছে তাঁহাদিগকেও প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনুমতি খোঁটায় বাঁধিয়া রাখিলেন।

কিন্তু ইহার স্বপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। কংগ্রেসের শক্তি ও মর্য্যাদা আজ অনেক বাড়িয়াছে। তাহার একটা শৃঙ্খলাও আছে। যে কোন কংগ্রেস-সেবককে তাঁহার ইচ্ছামত সত্যাগ্রহ করিতে দিতে কংগ্রেস এখন আর পারে না। কংগ্রেস-সেবকের কার্য্যের সহিত কংগ্রেসের মর্য্যাদা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত, সত্যাগ্রহ করিবার পূর্ব্বে যে কংগ্রেস-সেবক তাঁহার নিজের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মতি এবং সমর্থন সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর একটা কথা আছে। যে সকল কংগ্রেস-সেবক দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ করিতে যাইতেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা তাঁহাদের প্রযুক্ত হইবে কি-না? হইলে দেশীয় রাজ্যের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

সিংহলে ভারতীয় বিদ্বেষ—

সিংহলে ভারতীয় বিদ্বেষ মাত্র কয়েক বৎসরের প্রচার কার্য্যের ফল। সম্প্রতি সিংহল সরকারও ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহার মধ্যে সরকারী ও আধা-সরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগের হার বাঁধিয়া দেওয়া একটি। ইহা ভারতীয় বিতাড়নের প্রথম পর্ব্ব। তাহা ছাড়া ধনিক স্বার্থরক্ষার গূঢ় উদ্দেশ্যও আছে। ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের জন্য সিংহলের নারিকেল বর্জ্জন করিয়া প্রতিশোধমূলক পন্থা গ্রহণের কথা উঠিয়াছিল। কংগ্রেস বহু বিবেচনার পর এখনই সেই চূড়ান্ত পন্থার আশ্রয় লইতে চান না। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা আপোষের পথে একটা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী লইয়া ১৫ই জুলাই বিমানপথে সিংহল যাত্রা করিবেন।

সিংহল ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী। স্মরণাতীত কাল হইতে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য এবং সংস্কৃতিগত ঐক্য বর্ত্তমান। এমন দুইটি নিকট প্রতিবেশীর মধ্যে বিরোধ এবং বিদ্বেষ বাঞ্ছনীয় নয়। এ অবস্থায় কংগ্রেসের প্রস্তাব সর্ব্বাংশে সমীচীন হইয়াছে। দৌত্যের ভারও যোগ্যতর ব্যক্তির উপর অর্পিত হইতে পারিত না। আমরা আশা করি, সিংহলের প্রধান মন্ত্রী ব্যারন জয়তিলক তাঁহার পন্থার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা—

সিংহল সম্বন্ধে কংগ্রেস শান্তির নীতি অবলম্বন করিলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম নীতিই সমর্থন করিয়াছেন। এই ব্যবহার-বৈষম্যের কারণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন, সিংহলে ভারতীয় বিতাড়নের আন্দোলন কয়েক বৎসর হইতে চলিলেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে যে অপচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের স্মাট্‌স্-গান্ধী চুক্তি, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কেপটাউন চুক্তি, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফিট্‌হাম কমিশনের চেষ্টা, মিঃ হফমেয়ারের উক্তি, সমস্ত কিছু সত্ত্বেও তাহা এখনও পুরাদমে চলিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের মধ্যে শতকরা আশী জনের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকাতেই। সেইখানেই তাহাদের বাড়ী ঘর, অন্য গৃহ নাই। যে ভাবে বুয়রেরা দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী, যে ভাবে অন্য ইউরোপীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী, সেই হিসাবে ভারতীয়েরাও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী। একদা ইংরেজেরাই নিজেদের গরজে ও প্রয়োজনে তাহাদের ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই প্রয়োজন চুকিয়া যাইতেই এখন ভারতীয়দের নানাপ্রকার হীনতার মধ্যে ফেলিয়া আফ্রিকা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার জঘন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

এই হীনতা ও অপমানসূচক আইনের বিরুদ্ধে আত্মসম্মান ও ভারতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রবাসী ভারতীয়গণ যে সংগ্রাম করিতেছেন, কংগ্রেস তাহা সমর্থন করিয়াছেন এবং অন্যান্য অ-শ্বেতকায় জাতিদের সহিত যুক্তভাবে সিগ্রিগেশন আইনের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্য ও মহাত্মা গান্ধী—

দেশীয় রাজ্যের আন্দোলন স্থগিত এবং রাজকোটের অভিজ্ঞতার পরে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "নূতন আলোক"

সম্বন্ধে 'হরিজন' পত্রে যে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা শুধু আমাদের কাছেই নয়, পণ্ডিত জওহরলালের মত লোকের কাছেও দুর্ব্বোধ্য ঠেকিয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া সেই দুর্ব্বোধ্য সত্যটি সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সত্যাগ্রহ স্থগিতের পক্ষে তাঁহার যুক্তি এই যে, বৃটিশ ভারতের নাগরিকগণ বহু দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার এবং বহু গঠনমূলক কাজের অভিজ্ঞতা লাভের পর সত্যাগ্রহ করিবার যে অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন, দেশীয় রাজ্যের নাগরিকগণ এখনও তাহা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখনও সত্যাগ্রহ করিবার উপযুক্ত হন নাই। কিন্তু তার চেয়েও তাঁহার বড় যুক্তি এই যে, সত্যাগ্রহ মন্ত্রের ঋষি মহাত্মাজি। এই মহাত্মাজি অলৌকিক শক্তিশালী ব্যক্তি। তাঁহার কথা ও কাজ সাধারণ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার না করিয়া নির্ব্বিবাদে ও অন্ধভাবে তাঁহার অনুসরণ করাই শ্রেয়।

বোঝা যাইতেছে, ভারতের রাজনীতিতে আজও গুরুবাদই প্রবল।

হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট—

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে মাদ্রাজে সমস্ত সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে মহাত্মার সহানুভূতি নাই, সুতরাং মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীরও না থাকিবারই কথা। কিন্তু হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহের দায়িত্ব কংগ্রেসের নয়। উহা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলিতেছে না এবং হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের কোন আত্মীয়তাও নাই। এমন অবস্থায় মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনাহূত ভাবে হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতে যাওয়া শুধু অনাবশ্যক নয়, বিসদৃশ।

বর্ম্মা বিচ্ছেদ—

শাসনতন্ত্রের দিক দিয়া বর্ম্মা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও উহা এতদিন ভারতীয় কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবারে বোম্বাই বৈঠকে উহা ভারতীয় কংগ্রেস হইতেও বিচ্ছিন্ন করা হইল। ফলে উভয় দেশের মধ্যে যে শেষ রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিল তাহাও এতদিনে ছিন্ন হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে উভয় দেশেরই ক্ষতির আশঙ্কা আছে, বিশেষ করিয়া বর্ম্মার। বর্ম্মায় ভারতীয় বিদ্বেষও বাড়িতে পারে।

জনসভায় পুলিশ—

জনসভায় পুলিশের উপস্থিতি—এ কেহই পছন্দ করেন না। তাহাদের উপস্থিতিতে বাধা সৃষ্টির জন্য পুলিশের নিকট হইতে তাহাদের বসিবার ভাল জায়গা, চেয়ার টেবিল ইত্যাদির জন্য টিকিটের মূল্য হিসাবে বেশী টাকা লওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন পুলিশের প্রতি এই অবিচারে ব্যথিত হইয়া তাহাদের জন্য জনসভায় বিনামূল্যে প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমলাতন্ত্রেও পুলিশের যে অধিকার ছিল না, স্বায়ত্তশাসনে তাহাও পুলিশের আয়ত্তে আসিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে বাঙ্গলা দেশ যে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আর ভুল নাই।

আইনের অপপ্রয়োগ—

বর্দ্ধমানে ক্যানেল কর পাঁচ টাকা হইতে দেড় টাকায় কমাইবার জন্য যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের একজনকে জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া ট্যাক্স না দিতে প্ররোচিত করার অপরাধে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হাইকোর্টে আপীল করা হইলে মিঃ জাষ্টিস হেণ্ডার্সন বলেন, আইনের এমন অপপ্রয়োগ তিনি আর দেখেন নাই। জনসাধারণকে সরকারী ট্যাক্স দিতে বাধ্য করিবার জন্য ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন আইনের ৭ ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে! বলা বাহুল্য, আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। কাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে উক্ত আইনটিকে এইভাবে প্রয়োগ করিবার কৌশল প্রথম আবিষ্কৃত হয় সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

মুসলমান রাজত্বের স্বপ্ন—

কলিকাতা মিউনিসিপাল বিলের আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোয়ালিশন দলের নেতা খাঁ

বাহাদুর আবদুল করিম উৎসাহ ও উত্তেজনার মুখে তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্যের কথাটা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"আমাদের লক্ষ্য ভারতের মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ১৭৬৫ সালে ইংরেজেরা দেওয়ানী লাভ করিয়া মুসলমানদের নিকট হইতে বাঙ্গলার শাসনভার কাড়িয়া লয়। তখন পর্য্যন্তও আমাদেরই আধিপত্য ছিল। এখন তাঁহারা যখন সেই অধিকার দেশের জনসাধারণের হাতে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া ফেরত দিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন পূর্ব্বের অবস্থা (stutus quo ante) ফিরিয়া আসাই স্বাভাবিক"।

এখানে মুসলমানের আধিপত্য মানে মুসলীম লীগের আধিপত্য। এমনই স্বপ্ন দেখিয়া একদা মীরজাফর ইংরেজের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। পৌনে দুই শত বৎসর পরে আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে। কিন্তু এ স্বপ্ন খাঁ বাহাদুর অথবা মুসলমান মন্ত্রীরা দেখিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু মন্ত্রীরাও কি এই স্বপ্নে বিভোর থাকিবেন ?

শ্রীযুক্ত কামাখের পদত্যাগ—

শ্রীযুক্ত হরিবিষ্ণু কামাথ আই-সি-এস ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া বল্লভ-পন্থীগণের বিরোধিতা করায় তাঁর সে "চাকুরী" রহিল না। তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁহার যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল তাহাতেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, বল্লভ-পন্থীগণের বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেসের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা চলিবে না। শ্রীযুক্ত কামাথ তাঁহার পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "এক জেল হইতে অন্য জেলে যাওয়ার জন্য আমি আই-সি-এস ছাড়ি নাই।" অনেকদুঃখেই তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। কংগ্রেসের এই স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিবার জন্য বামপন্থীদের লইয়া নূতন দল গঠন করা হইতেছে।

ডিগবয় ধর্ম্মঘট—

ডিগবয় ধর্ম্মঘটের এখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং মৌলানা আবুল কলাম আজাদও এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আসাম অয়েল কোম্পানী শ্রমিকদের একটা দাবীতেও সম্মত হন নাই। এমন কি, এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সালিশী বোর্ড নিয়োগের যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল তাহাও তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্যর্থকাম হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন।

অবশেষে তিনি এই ব্যাপারটি ওয়ার্কিং কমিটির গোচরে আনেন। ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোম্পানী যদি এখনও মনোভাব পরিবর্ত্তন না করেন তাহা হইলে আসাম গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে শ্রমিক বিরোধ বিল বিধিবদ্ধ করিয়া আইনের বলে কোম্পানীকে সালিশী বোর্ড মানিতে বাধ্য করিবেন।

আমরা আশা করিয়াছিলাম, ওয়ার্কিং কমিটির এই দৃঢ় মনোভাব কোম্পানীর মনোভাব পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিবে। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিয়াছে, নিরীহ ও নিরুপদ্রব ধর্ম্মঘটকারীদের উপর গুণ্ডার তাণ্ডব চলিতেছে। কয়েকজন শ্রমিক গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াছে এবং তাহাদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীও লওয়া হইয়াছে। এই আবহাওয়া নিশ্চয়ই আপোষের অনুকূল নয়। শ্রমিক ইউনিয়ন অবিলম্বে এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য ও অপরাধীগণকে শাস্তি দিবার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমরা আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট তৎপরতা আশা করি।

মাধ্যমিক শিক্ষার দুরবস্থা—

বাঙ্গলার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৩২-৩৭ সালের যে পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। ১৯৩৬ সালে একা বাঙ্গলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১৮৮, অর্থাৎ মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম এই পাঁচটি প্রদেশের মোট বিদ্যালয় সংখ্যার (১০৯৯) চেয়েও বেশী। কিন্তু সংখ্যার বেশী হইলে কি হয়, অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মাত্র একচল্লিশটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সরকারেরও চারিটি মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে এবং

৫৪০টি সরকারী সাহায্য পায়। অবশিষ্ট ৫৯৫টি কোন সাহায্যই পায় না। ছাত্রদত্ত বেতন ছাড়া ইহাদের দ্বিতীয় সম্বল নাই।

বাঙ্গলা দেশের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শোচনীয় অবস্থার সহিত সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত অল্প। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা কেহই শিক্ষকতার দিকে ঝোঁকেন না। কোথাও কোন চাকুরী না পাইয়াই লোকে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই প্রকার মনোভাবসম্পন্ন শিক্ষকদের নিকট হইতে ছাত্রেরা বেশী কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না। অথচ আমাদের শিক্ষালয়ে ইঁহাদেরই সংখ্যা অধিক। কিন্তু যাঁহারা বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ঔৎকর্ষ রক্ষার পক্ষপাতী, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নই। বাঙ্গলা দেশে শিক্ষিতের যে হার তাহাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। সরকারের উচিত সেগুলির অর্থসাহায্যের দ্বারা উন্নতি বিধান করা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন তো হইল না, এখন মনোযোগের অভাবে যদি উচ্চ বিদ্যালয়গুলির অর্দ্ধেকও উঠিয়া যায় তাহা হইলে শিক্ষার দুরবস্থার আর বাকি থাকিবে না।

বামপন্থী ঐক্য—

বোম্বায়ে বিভিন্ন বামপন্থী দলকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম, ইহার ফলে আর কিছু যদি নাও হয় বল্লভপন্থীদলের স্বেচ্ছাচারিতা অনেকখানি সংযত হইবে। কিন্তু সে আশাও বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়। বোম্বাই বৈঠকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত মাসানীর দল সরিয়া পড়িলেন। এখন কংগ্রেসের শান্তির ভয়ে আরও অনেকেই বুঝি-বা সেই পন্থাই অনুসরণ করেন।

কংগ্রেসের কয়েকটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য বামপন্থী ঐক্য সম্মেলনে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র তদনুসারে ৯ই জুলাই তারিখ নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবস বলিয়া ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তার প্রেরণ করেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আচার্য্য কৃপালনী সেই সময় এই ফতোয়া জারী করেন যে, কোন কংগ্রেস অথবা কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি কংগ্রেস বিরোধিতাসূচক এই কার্য্যে যোগদান করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র জানাইয়া দেন যে, কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অথবা মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। তাঁহারা কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে যাইতেছেন না, তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন মাত্র। নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবস প্রত্যাহার করিয়া লইতে তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণ নীরব। সম্ভবত তিনি এই গোলযোগে নামেন নাই; শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় নিজে তো ইহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেনই, পণ্ডিত জওহরলালকেও সমাজতন্ত্রী দলকে দূরে রাখিবার অনুরোধ করিয়াছেন। একমাত্র বোম্বায়ের শ্রীযুক্ত নরীম্যান ছাড়া বামপন্থী "ঐক্য" দলের উল্লেখযোগ্য আর কাহাকেও সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা যাইতেছে না। পণ্ডিত জওহরলাল অন্য অনেক ব্যাপারে বামপন্থীদলের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও এ ব্যাপারে সুভাষবাবুর সম্পূর্ণ বিরোধী।

ডাক্তার সাহার প্রবন্ধ—

গত আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ডি-এস-সি, এফ-আর-এস মহাশয়ের প্রবন্ধের ৪২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ২১ লাইনে 'ইরাকি' (Babylonian) স্থলে 'ইংরাজি' ছাপা হইয়াছে। অধ্যাপক সাহাকে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর সভা উপলক্ষে প্রায় এক মাস বোম্বায়ে বাস করিতে হইয়াছিল—সেজন্য তাঁহার প্রবন্ধের শেষাংশ শ্রাবণে প্রকাশিত হইল না।

ঢাকা মেডিকাল স্কুলের পুরাতন কাসুন্দী—

ঢাকা মেডিকাল স্কুলের ছাত্রীগণ স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ মৈজুদ্দীনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছিলেন মিঃ টাইসন অনেক দিন পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে তাঁহার তদন্ত-ফল গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন। মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ জানাইয়াছেন, "জনস্বার্থের কল্যাণে" উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হইবে না; ডাঃ মৈজুদ্দীনকেও কোন প্রকার শাস্তি দেওয়াও হইবে না। ইহার পর মন্ত্রীমণ্ডলের উপর সাম্প্রদায়িকতা-আরোপ করা বৃথা!

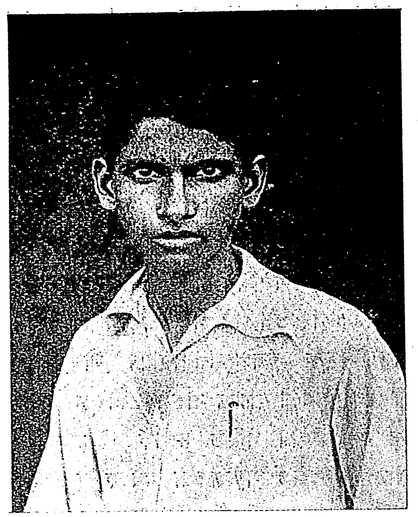

শ্রীশান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

গত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৬০৫ নম্বর পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন

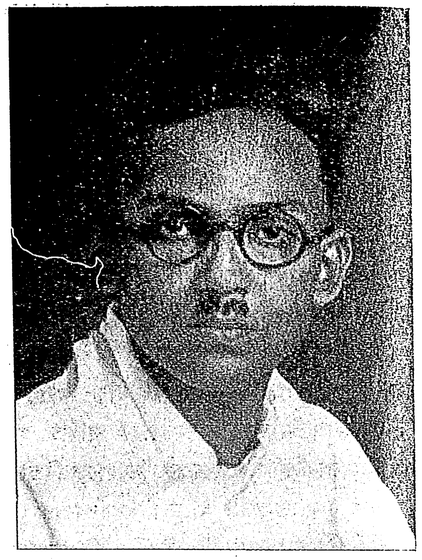

শ্রীএন-জি-দত্ত

যুক্তপ্রদেশপ্রবাসী নব্বই হাজার বাঙ্গালীর পক্ষে আন্দোলন পরিচালন জন্য এলাহাবাদে বাঙ্গালী সমিতি করিয়াছেন

কুমারী বাণী ঘোষ

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র দশ বৎসর সাত মাস বয়সে প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছেন

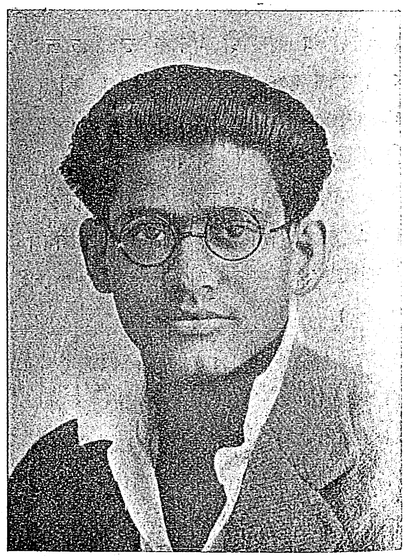

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে

কাশীহিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছেন

শ্রীসুশীলকুমার রায়

ইনি আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ; সম্প্রতি অজৈব রসায়নে ডি এস-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। বয়স ৩২ বৎসর।

রামবল্লভ নন্দন

হুগলী, বাঁশবেড়িয়ার প্রবীণ কর্ম্মী—বহু অর্থ দান করিতেন। সম্প্রতি ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

৺ধরণীকুমার বসু

(১)

যে-তোমার কাছে বন্ধু পেয়েছি শুধুই সমাদর,
বিশ্বাস-নিবিড় প্রীতি আনন্দের দাক্ষিণ্য-সৌরভে ;—
যে-তুমি বিলাতে নিত্য আতিথেয় আলো শুভংকর
জীবনের ছায়াব্যথা প্রাণতলে লুকায়ে নীরবে ;—

যে-তোমার শুভ্র হাসি নূপুরের ম'ত ঝংকারিয়া
অশ্রু-রাগিণীর সুরে দিত তাল—কান্ত, কমনীয় ;—
যে-তুমি অপরিচিতে আত্মীয়তা-তিলকে বরিয়া
অন্তরের অন্তরঙ্গ করি' নিতে ওগো সর্বাত্মীয় !—

যে-তোমার নির্বিচল শ্রদ্ধা চিরউচ্ছল, উদার
অক্লান্ত নির্ঝরসম উর্বরিয়া স্বপ্নহীন মন
বিছাত শ্যামল শান্তি বসন্তের ছন্দে অনিবার
অস্থিরতা-মর্মে যাহে উঠিত বাজিয়া চিরন্তন ;—

সে-তোমার বিসর্জন-ব্যথা থাক্ আমারি আপন :
তোমার সুন্দর স্মৃতি জনে জনে করুক অর্চন।

জুলাই, ১৯৩৯

(২)

প্রসিদ্ধি যাহারে বলে চাহো নি তো কর্মে বন্ধু তুমি।
কীর্তির কনকমাল্য, করতালি, যশোজয়ধ্বনি,
বিলাসরঙ্গিণ রাগ প্রাণে তব ওঠে নি কুসুমি'।
ধনজন মাঝে ছিলে আপনারে একান্তে গোপনি'।

যারা তব শুভনীড়ে পেয়েছিল আত্মীয়-আশ্রয়
তাদের আপন করি' রেখেছিলে স্নেহপক্ষপুটে,
যেথা তোমারেই সখা কেন্দ্র করি' প্রীতির প্রণয়
উঠিত গড়িয়া গানে—সেথা সবে ফুল হ'য়ে ফুটে

শোষিত বসন্তব্রতী ! তব আতিথ্যের কোজাগরে।
নগণ্যেও দিতে মান জননীর ম'ত আলোহেসে :
শ্রদ্ধার মন্দিরে তব অখ্যাতেরো মাঝে যে সুন্দরে
দেখিতে হে গুণগ্রাহী ! গুণী তুমি ছিলে ছদ্মবেশে।

মুখরতা-রোলে শুনি তোমার বিনয়মন্ত্র বাজে।
খ্যাতি নহে—চরিত্রের মর্মবাণী তব রূপে সাজে।

স্নেহকৃতজ্ঞ—দিলীপ

* সিলেটে মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে—৫,৭,৩৯।

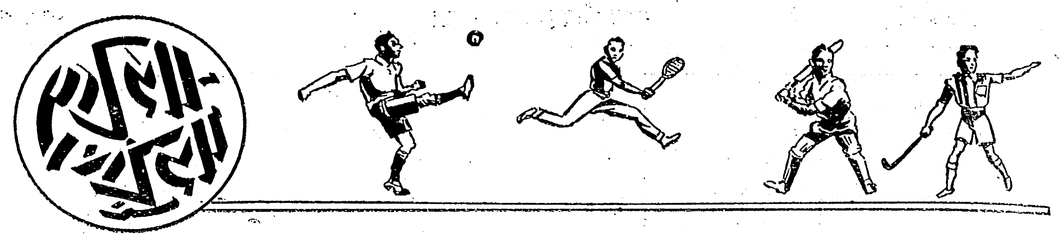

ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ—২৭৭ ও ২২৫

ইংলণ্ড ঃ—৪০৪ (৫ উইকেট ডিক্লিয়ার্ড) ও ১০০ (২ উইকেট)

ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী।

দশ হাজার দর্শকের সামনে লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড আর

আর গ্রাণ্ট (ক্যাপ্টেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ সুরু হ'ল। আকাশে বেশ মেঘ র'য়েচে ; জল যে কোন সময় হ'তে পারে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জিতে ব্যাট ক'রতে নাবলো। ২৯ রানের মাথায় প্রথম উইকেট গেল, ষ্টোলমেয়ার ও হেডলে খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলে লাঞ্চের সময় রান তুললেন ১ উইকেট ৯৫। মেয়ার ৫৯ ক'রে আউট হ'লেন, হেডলে তখনো খেল্‌চেন। চায়ের সময় রান উঠলো ৪ উইকেটে ২২৬। দর্শক সংখ্যা বেড়ে ২০ হাজার হ'ল। আকাশও বেশ পরিষ্কার। এবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ভাঙ্গন সুরু হয়ে সব উইকেট গেল ২৭৭ রানে। হেডলে নিজস্ব ১০৬ রান ক'রে উডের বলে কপসনের হাতে ধরা দিলেন। কপসন ৮৫ রানে পাঁচটা উইকেট পেয়েচেন। ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ৪০৪ ক'রে প্রথম ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড ক'রলে। হাটন মাত্র চার রানের জন্য ডবল সেঞ্চুরী করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রতে পারলেন না। কম্পটন ক'রলেন ১২০। ক্যামেরন তিনটে উইকেট পেলেন ৬৬ রানে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ২২৫ রানে শেষ হ'ল। হেডলে এবারেও সেঞ্চুরী ক'রলেন, ২৩০ মিনিট

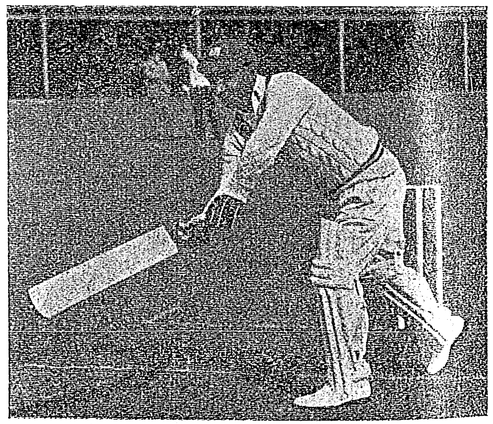

জর্জ্জ হেডলে

খেলে। লর্ডস মাঠে টেষ্ট খেলায় দু' ইনিংসে সেঞ্চুরী ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যাটস্‌ম্যান ক'রতে পারেন নি। কপসন চার উইকেট পেয়েচেন ৬৭ রানে। ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় ১০০ রান তুলতে মাত্র দু' উইকেট পড়ে ; হাটন বিশেষ সুবিধা ক'রতে পারেন নি।

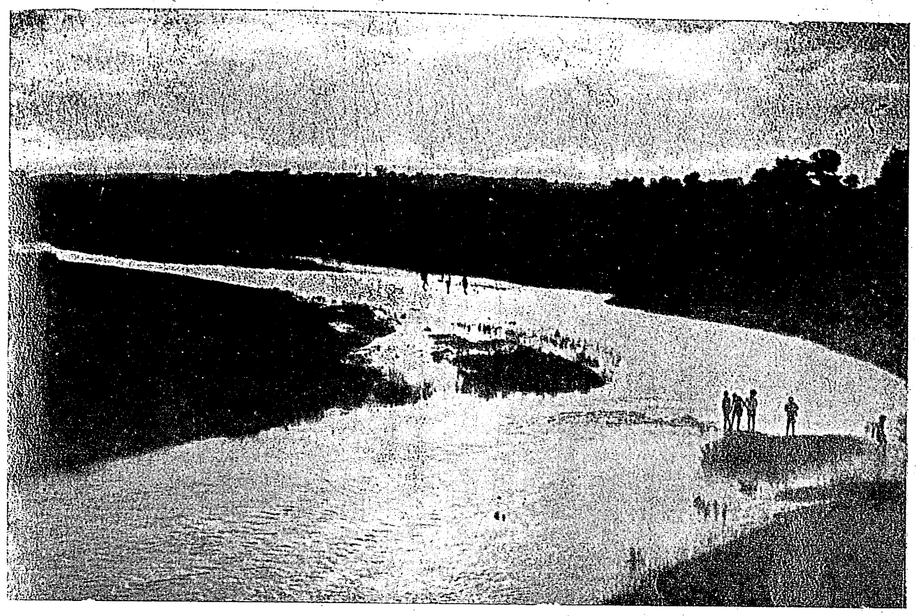

নদীর বাঁক শিল্পী—সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, মাদ্রাজ আর্ট স্কুল

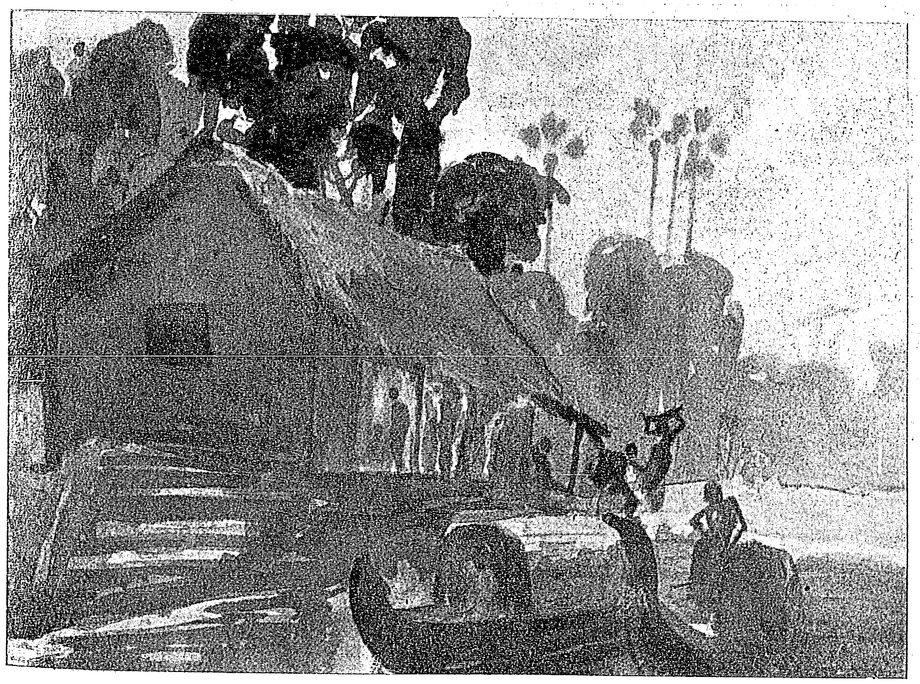

চাঁদিনী রাতি শিল্পী—কে সি এস পাণিকার, মাদ্রাজ

দুষ্টু বুদ্ধি শিল্পী—সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা

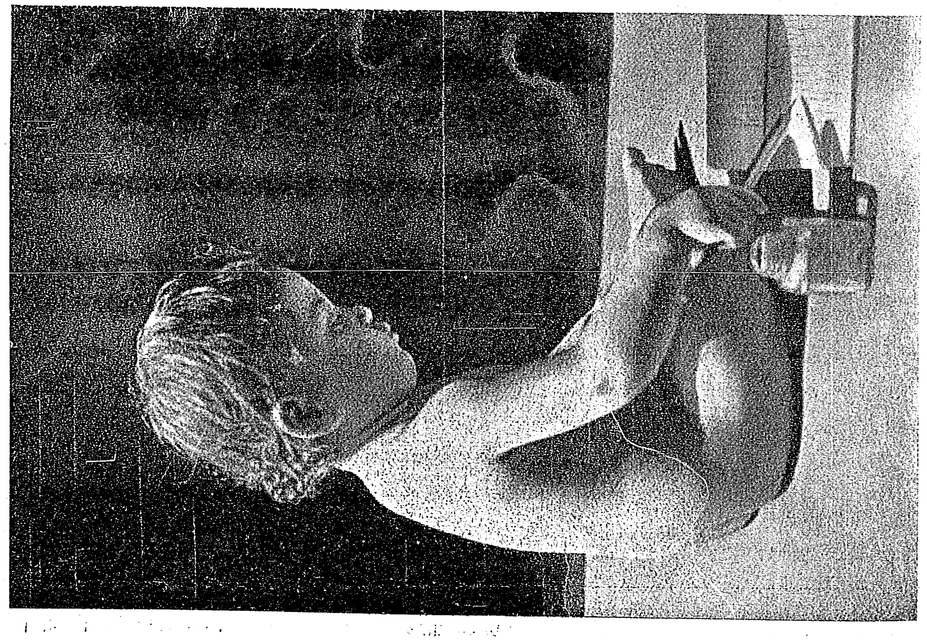

খুদে পণ্ডিত শিল্পী—নরেন্দ্র বসু, বেলিয়াঘাটা

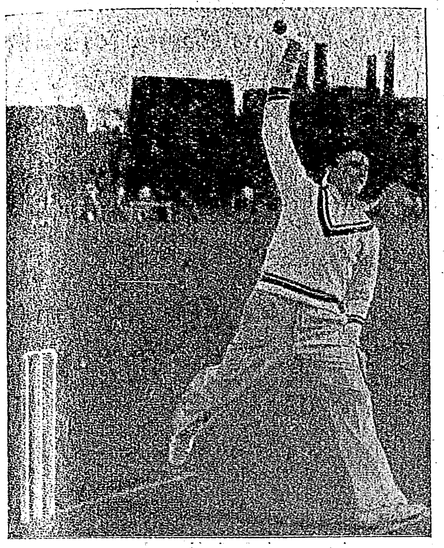

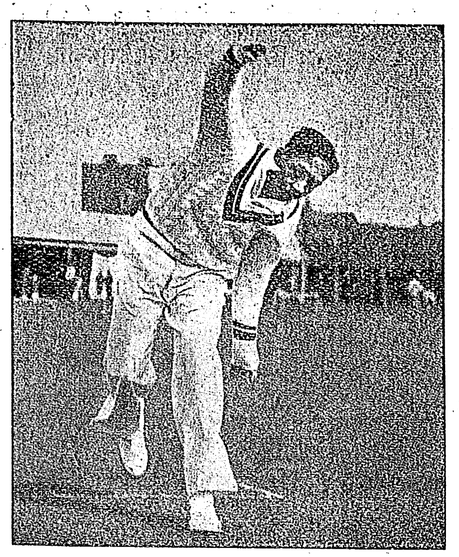

ষ্টোলমেয়ার

সি বি ক্লার্ক

আগামী অলিম্পিক ঃ

' ১৯৪০ সালে হেলসিনকিতে যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে তাতে ভারতবর্ষ যোগদান করবে কি না এ নিয়ে মতভেদ দেখা গেছে। ইণ্টারন্যাসনাল অলিম্পিক কমিটির সদস্য মিঃ জি ডি সোন্ধি কয়েকটী প্রবন্ধে ভারতবর্ষের এ্যাথেলেটদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন বর্ত্তমান অবস্থায় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের যোগদান করার কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। কারণ অন্যান্য দেশের এ্যাথেলেটস ও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে এ্যাথেলেটস কর্তৃক যে সকল রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে তার তুলনায় ভারতবর্ষের রেকর্ড মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর মতে অলিম্পিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের তুলনায় ভারতবর্ষ এত পিছনে আছে যে বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন না করে এবং উপযুক্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ডে উন্নত না হয়ে যোগদান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মিঃ জানকী দাসেরও মতে কোনরূপ নিম্ন শ্রেণীর সাফল্য লাভ করাও যখন ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব নয় তখন অর্থব্যয় করে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের কোন মূল্য থাকতে পারে না। তাঁর মতে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহে বিশিষ্ট 'কোচে'র তত্ত্বাবধানে ভারতীয় এ্যাথেলেটদের শিক্ষাদান অবশ্য প্রয়োজন। অপর দিকে পাতিয়ালার মহারাজা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের যোগদান করার সপক্ষে মত দিয়াছেন। (১) অলিম্পিক শপথ গ্রহণ

আর্থার উড্ (উইকেট রক্ষক—ইংলণ্ড)

পদ্ধতি (২) এ্যাথেলেটদের উৎসাহ ও (৩) বিশেষ অভিজ্ঞতার দিক থেকে তিনি ভারতবর্ষের যোগদান প্রয়োজন মনে করেন।

মিঃ দাস উল্লিখিত তিনটি কারণের একটিকেও উপযুক্ত বলে মনে করেন নি। তিনি লিখেছেন মাত্র কয়েকজন এ্যাথেলেট ও ম্যানেজারকে উৎসাহ দেবার জন্য অর্থ ব্যয় না করে উপযুক্ত কোচের তত্ত্বাবধানে এ্যাথেলেটদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাই উপযুক্ত উৎসাহ দেওয়া। ইহা ছাড়া অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় এ্যাথেলেটদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড এতই নিম্নশ্রেণীর যে তাহারা অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিশেষ অভিজ্ঞতা (Big Experience) অনুধাবনের উপযুক্ত নয়।

নিম্নলিখিত তালিকাটী আন্তর্জ্জাতিক কার্য্যকরী সমিতির জনৈক সভ্য প্রকাশিত করেন, এ থেকে বুঝা যায় ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নিম্নস্তরে।

বিষয়	আন্তর্জ্জাতিক রেকর্ড	ভারতীয় রেকর্ড
হাই জাম্প	৬ ফিট্ ১-১।৪ ইঞ্চি	৫ ফিট্ ৪-৩।৪ ইঞ্চি
ব্রড্ জাম্প	২৩ ফিট্ ৭ ইঞ্চি	২২ ফিট্ ৬-১।২ ইঞ্চি
পোল ভল্ট	১২ ফিট্ ৯-½ ইঞ্চি	১১ ফিট্ ৩-৩।৮ ইঞ্চি
হপ্ ষ্টেপ্ ও জাম্প	৪৫ ফিট্ ১০ ইঞ্চি	৪৪ ফিট্ ৩-১।২ ইঞ্চি
ডিস্কাস্	১৪৭ ফিট্ ৬ ইঞ্চি	১১৯ ফিট্ ৬-১।৮ ইঞ্চি
জেভ্লিন্	২১৩ ফিট্	১৬৭ ফিট্ ৬ ইঞ্চি
হ্যামার	১৬০ ফিট্	১২৪ ফিট্ ৭ ইঞ্চি.

সাউথ ক্লাবের প্রচেষ্টা ঃ

প্রতিবারের ন্যায় এবারও সাউথ ক্লাব বিখ্যাত খেলোয়াড় আনাবার ব্যবস্থা ক'রচেন। ভন ক্রাম, পুনসেক ও মিটিক যে আসবেন তা' সুনিশ্চিত। খোসিনকিরও আসবার সম্ভাবনা আছে; তিনি যদি না আসতে পারেন তাহ'লে

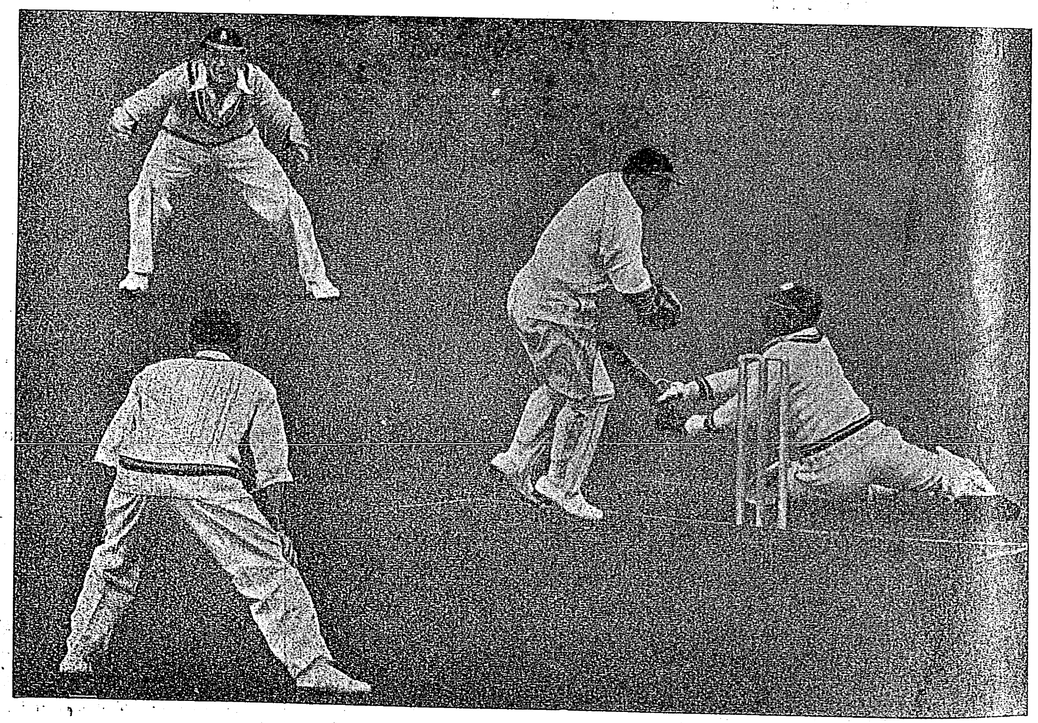

ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের প্রথম টেষ্ট খেলায় জে হেডলে (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) বোলার রাইটের একটী বল বাউণ্ডারীতে পিটে উইকেটের সামনে পড়ে গেছেন

তাঁর স্থলে অন্য একজন নামকরা খেলোয়াড় আসবেন। এঁরা সবাই আগামী শীতকালে সাউথ ক্লাব পরিচালিত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ানসিপে যোগদান ক'রবেন। ভন ক্রাম এরপর পেশাদার হ'বার মনস্ত ক'রেছেন। অতএব ভারতবর্ষের এই অভিযানই সখের খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর শেষ অভিযান।

সাউক্লিফের সাফল্য ঃ

ইয়র্কসায়ার ও ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় হারবার্ট সাটক্লিফ এ বৎসর পর পর চারটি খেলায় সেঞ্চুরী করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, চতুর্থ খেলায় ১০৭ রান হলে তাঁর বিশ বৎসর ক্রিকেট খেলার জীবনে ৫০,০০০ রান পূর্ণ হয়। লর্ডস মাঠে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ইয়র্কসায়রের হ'য়ে প্রথম ইনিংসে তাঁর ১৭৫ রান সত্যসত্যই প্রমাণ ক'রল যে তিনি এখনও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড় নামের যোগ্য। বর্ত্তমানে সাটক্লিফের বয়স ৪৪ বৎসর। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার রান সংখ্যা এবং এম সি সির হ'য়ে তিনি অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা ও জামাইকার বিরুদ্ধে প্রত্যেক ইনিংসে যে রান সংখ্যা তুলেছিলেন তাহা ৫০,০০০ রানেরই অন্তর্গত। উক্ত রান সংখ্যা তুলতে জ্যাক হবসের ২৯ বৎসর, পাটসি হেনড্রেন ও মিডের ৩১ বৎসর এবং বব উলির ৩২ বৎসর লেগেছিল।

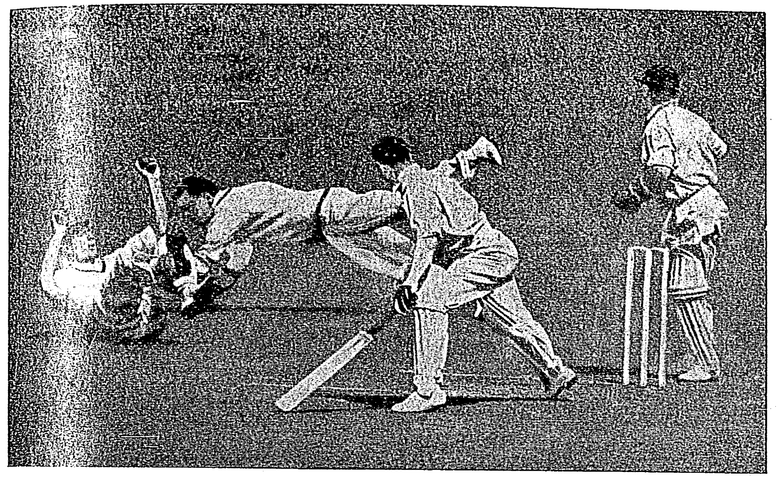

মিডলসেক্স ও ইয়র্কসায়ারের খেলায় এ মিচেল ভেরিটির বলে ই কিলিককে (মিডলসেক্স) ষ্লিপে সুন্দর ভাবে লুফছেন। খেলায় ইয়র্কসায়ার এক ইনিংস ও ২৪৬ রানে বিজয়ী হয়। ইয়র্কসায়ারের ইহা উপর্য্যুপরি পঞ্চমবার ইনিংস বিজয়

সাটক্লিফ, হবস্ হেনড্রেন, মিড, উলি এবং ডবলউ জে গ্রেস এই কয়জন ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রথম শ্রেণীর খেলাতে এ পর্য্যন্ত ৫০,০০০ রান তুলতে সক্ষম হ'য়েছেন। লিসেষ্টারের বিরুদ্ধে ইয়র্কসায়ারের হ'য়ে তিনি সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলে ২৩৪ নট্ আউট থাকেন। প্রখর রৌদ্রে দর্শকরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল কিন্তু তিনি স্বাচ্ছন্দের সহিত দর্শনীয় ক্রীড়া-চাতুর্য্যে উইকেটের চারিদিকে বল চালনা করে দর্শকদের আনন্দ জুগিয়েছিলেন। সাটক্লিফের যে সকল রেকর্ড হ'য়েছে তার মধ্যে (১) এ বৎসর পর পর চারটি খেলায় সেঞ্চুরী (২) ১৯৩১ সালে পর পর চারটি সেঞ্চুরী এবং সেই বৎসরই আরও তিনটি খেলায় উপর্য্যুপরি শতরান করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিলেন।

কুড়িবৎসরে সাটক্লিফের রান সংখ্যার তালিকা ঃ—

ইনিংস্	নট্ আউট	সর্ব্বোৎকৃষ্ট	মোট রান	এভারেজ
১,০৭৮	১২৩ বার	৩১৩	৫০,০৬৮	৫২.৪২

বিলেতের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই পর পর তিনটি টেষ্ট ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরী করেছেন। (সিডনিও মেলবোর্ণ, ১৯২৪-২৫ সালে ৫৯, ১১৫, ১৭৬ ও ১২৭।)

সাটক্লিফ

ও'রেলী ঃ

১৯৩১ সাল থেকে মোট ৬বার এবং এ বৎসর নিয়ে পর পর দু'বার ডবলউ জে ও'রেলী নিউ সাউথ ওয়েলসের বোলিংএ প্রথম স্থান অধিকার করার

সম্মান লাভ ক'রেছেন। বোলিংএ তাঁর ৪৬ উইকেটে ৯.৮৯ এভারেজ। তিনি সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন প্যাডিংটনের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ১৪ উইকেট নিয়ে। ঐ খেলার প্রথম ইনিংসেই মাত্র ১৫ রানে ৫টা উইকেট পেয়েছিলেন। ও'রেলী সম্প্রতি সিডনির গ্রামার স্কুলের শিক্ষকতার পদত্যাগ ক'রে টেষ্ট খেলোয়াড় ম্যাক্কাবের সিডনির স্পোর্টসের দোকানে যোগদান করবেন স্থির ক'রেছেন। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ ও'রেলীর এই প্রথম। পূর্ব্বে তিনি শিক্ষাবিভাগে শিক্ষকতা করতেন, ১৯৩৬ সালে সাউথ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে উক্ত পদত্যাগ করে সিডনির গ্রামার স্কুলে যোগদান করেন।

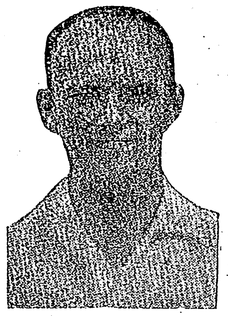

ও'রেলী

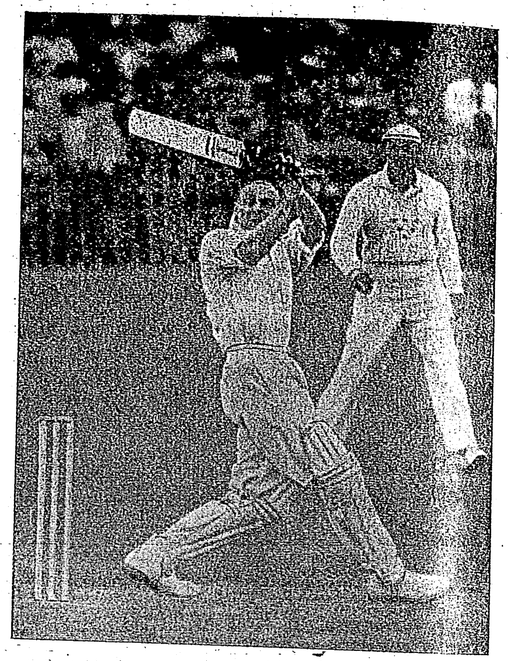

নিকলস্ (এসেক্স) সাসেক্সের বিরুদ্ধে ১৪৬ রান পূর্ণ করছেন। এ বৎসর এই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী

অমরনাথ ও অমর সিংয়ের সাফল্য ঃ

ল্যাঙ্কসায়ার ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতায় বার্ণলে এক রানে লাওয়ার হাউসকে পরাজিত করে। অমরনাথ বার্ণলে দলের হ'য়ে ১০৬ রান তুলে বাটিংএ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লাওয়ার হাউসের পক্ষে অমরসিং ৫৩ রানে ৬টা উইকেট পেয়েছেন।

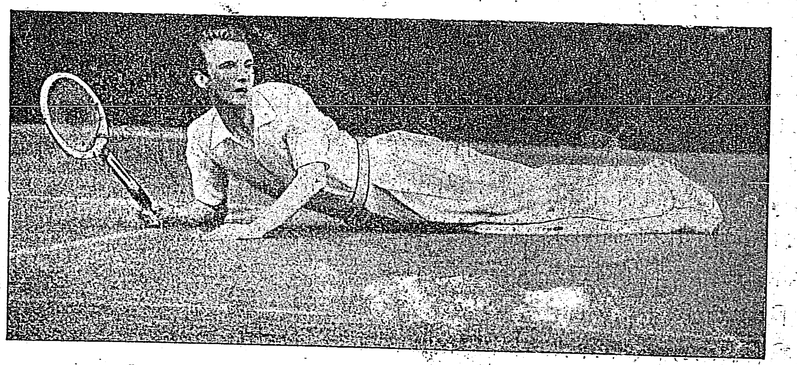

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউণ্ডে ইংলণ্ডের খেলোয়াড় সি হেয়ারের একটী বল আটকাতে গিয়ে ফ্রান্সের বি ডেসরেমণ্ড ভূতলশায়ী হ'য়েছেন

ফ্রেঞ্চ লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—ম্যাকনীল (আমেরিকা) ৭-৫, ৬-০, ৬-৩ গেমে আমেরিকার এক নম্বর খেলোয়াড় রিগসকে পরাজিত করে বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। ম্যাকনীলের নিখুঁত সার্ভিস ও ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইভ রিগসকে বিপর্য্যস্ত করেছে।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—ম্যাথু (ফ্রান্স) ৬-৩, ৮-৬ গেমে পোল্যাণ্ডের পান্না জেডরিজোস কাকে পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলসে—ম্যাকনীল ও হ্যারিস ৪-৬, ৬-৪, ৬-৩, ২-৬, ১০-৮ গেমে বরোটাও ব্রাগননকে হারিয়েছেন।

মিক্সড ডবলসে—মিসেস

আনন্দের আতিশয্য

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী

সান্ধ্য সৌন্দর্য্য

পেশোয়ারে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের অভ্যর্থনা

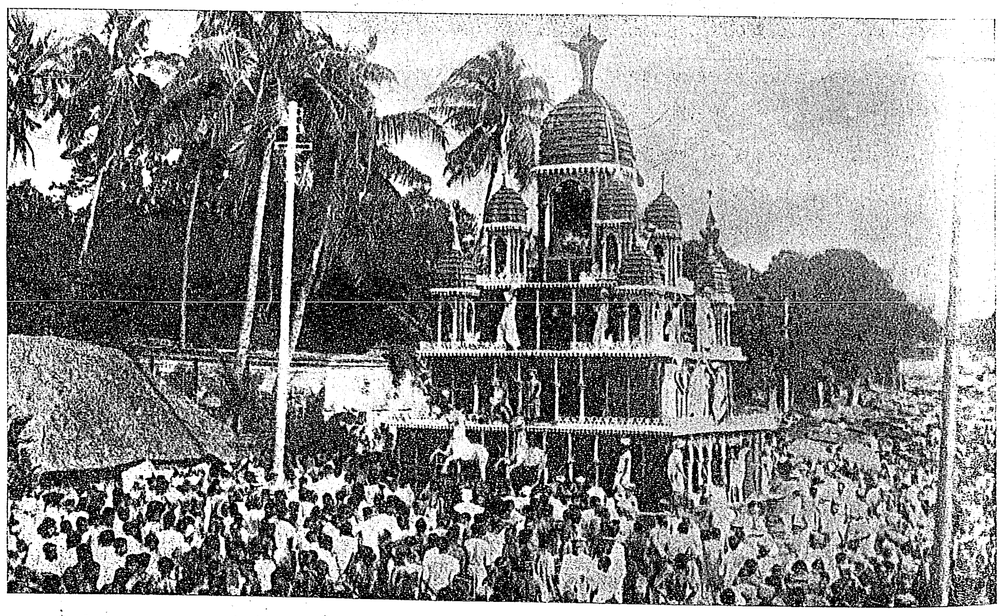

মহেশে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা

ছবি—পান্না সেন, কলিকাতা

ফ্যাবিয়ান ও কুক ৪-৬, ৬-১, ৭-৫ গেমে ম্যাথু ও কুকুলজেভিককে পরাজিত করেছেন।

কুইন্‌স্ ক্লাব টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—গাউস মহম্মদ ৬-১, ৬-৩ গেমে ভন্‌ক্রামের নিকট পরাজিত হ'য়েছেন। গাউস কোয়াটার-ফাইনালে বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় কুকুলজেভিককে ৬-২, ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। কলিন্সকে সেমি-ফাইনালে গাউস ৬-৪, ৬-২ গেমে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠেন। কলিন্স উইম্বলডন খেলায় ১৯৩২ সালে কোসেকে এবং গ্রিনহগস্‌এ ১৯২৭ সালে অষ্টিনকে পরাজিত করেন।

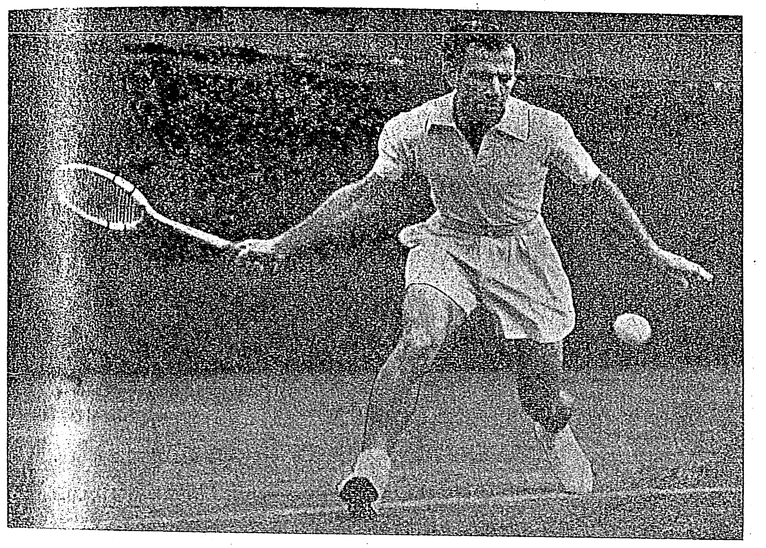

কুইন্‌স ক্লাব টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলার ফাইনালে ক্রীড়ারত গাউস মহম্মদ—ভন্‌ক্রামের নিকট পরাজিত হয়েছেন

মহিলাদের সিঙ্গলসে—পান্না জেডরিজোসকা (পোল্যাণ্ড) ৬-১, ৬-৪ গেমে ফ্রে স্পার্লিকে (ডেনমার্ক) হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবলসে—জে এস ওলিফ (গ্রেটবৃটেন) ও ভন্‌ক্রাম কলিন্স ও টিনলোরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে—ডি বি এণ্ড্রুস (আমেরিকা) ও এস হেনরোটিন (ফ্রান্স) ৬-২, ৬-২ গেমে পান্না ও এ এম ইয়র্ককে (গ্রেটবৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে—ই টি কুক ও মিসেস ফ্যাবিয়ান ৯-৭, ৬-২ গেমে রবার্ট রিগস ও পান্না জেডরিজোসাকাকে পরাজিত করেছেন।

উইম্বলডন টেনিস্ ঃ

টেনিস জগতে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব আর একবার প্রতিপন্ন হ'ল। আমেরিকার ১নং খেলোয়াড় রিগস পুরুষদের সিঙ্গলস, রিগস ও কুক পুরুষদের ডবলস এবং কুমারী এলিস মার্ব্বেল মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী হ'য়েছেন। ফাইনালে রিগস আমেরিকার খেলোয়াড় কুককে ২-৬, ৮-৬, ৩-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে হারান। রিগস ও কুক ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩, ৯-৭ গেমে হেয়ার ও ওয়াইল্ডকে (বৃটেন) পরাজিত করেছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী এলিস মার্ব্বেল ৬-২, ৬-০ গেমে ষ্টামারকে পরাজিত করেছেন। ষ্টামার এলিসের কাছে মোটেই দাঁড়াতে পারেন নি। রিগস কোয়াটার ফাইনালে ও সেমি-ফাইনালে যথাক্রমে গাউস মহম্মদ ও পুনসেককে এবং কুক, অষ্টিন ও হেঙ্কেলকে পরাজিত করেন। ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস এবার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একাধিক খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে হারিয়ে তিনি কোয়াটার ফাইনালে উঠেছিলেন। হাঙ্গেরীয়ান খেলোয়াড় সিগেটির সঙ্গে ২ ঘণ্টা ১৫ মিঃ খেলে গাউস বিজয়ী হন। গাউসের এ বৎসরের খেলায়

মার্ব্বেল

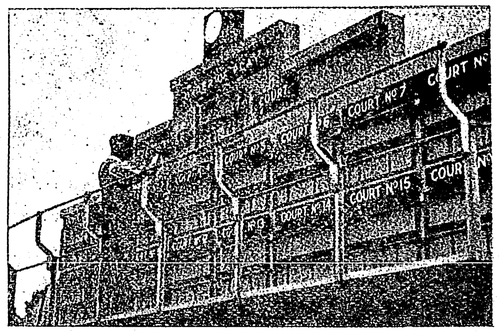

উইলিয়াম টার্ণে উইম্বলডন টেনিস খেলার ফলাফলের বোর্ড প্রস্তুত করছেন। মেরামত খরচা ও বোর্ড আঁকার জন্য বাৎসরিক ৪৫০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়

যন্ত্র সাহায্যে টেনিস বল পরীক্ষা করা হ'চ্ছে। ওজন ও আকারের তারতম্য থাকলে বল বাতিল করা হয়। উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় প্রতি বৎসর প্রায় ৮০০ ডজন বল লাগে

বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। এদিকে আমেরিকার ৭নং খেলোয়াড় কুক, অষ্টিন ও হেক্সেলকে হারিয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেছিলেন। গত বারের ফাইনালিষ্ট ও বৃটেনের ১নং নম্বর খেলোয়াড় অষ্টিন কুকের কাছে দাঁড়াতেই পারেন নি। তিন সেটে অষ্টিন মাত্র চারটি গেম পেয়েছিলেন। ফ্রেঞ্চ টেনিস চ্যাম্পিয়ন ডন্ ম্যাকনীল কুকুলজেভিকের কাছে হেরে গিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রেচেন। তিনি উইম্বলডন বিজয়ী রিগসকে ফ্রেঞ্চ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের ফাইনালে হারান। গত দু'বৎসরের উইম্বলডন বিজয়ী বাজ এবার খেলায় যোগদান করেননি; তিনি এখন পেশাদার খেলোয়াড়। গত বৎসরের মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী মুডীও এবৎসর যোগদান করেন নি। ভারতবর্ষের যে সব খেলোয়াড় প্রথম খেলাতেই হেরে যান তাঁদের ভেতর পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার তরুণ খেলোয়াড় যথাক্রমে ইফতিকার ও দিলীপ বসু প্রশংসনীয় খেলেছিলেন। ইফতিকার ষ্ট্রেট সেটে হারলেও ১৮টা গেম পেয়েছিলেন। দিলীপ বসু পাঁচ সেট খেলে হেরে যান। তাঁর খেলা দর্শনযোগ্য হ'য়েছিলো।

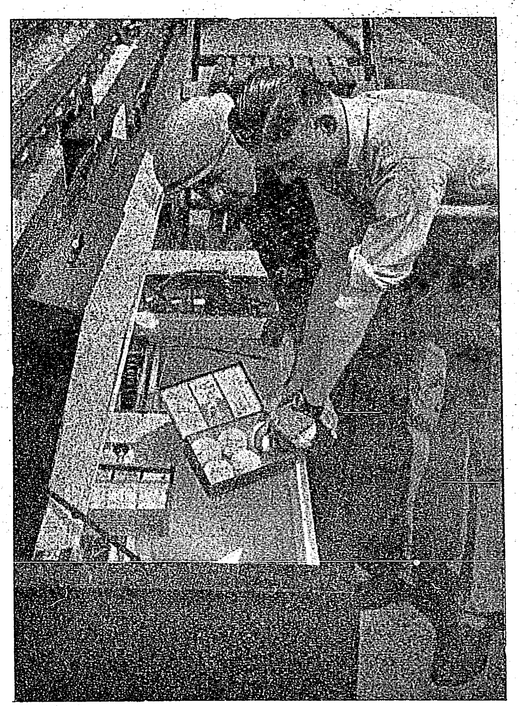

আম্পায়ার সীটের নিম্নভাগে ঠাণ্ডা রাখবার যন্ত্র (Refrigerator) রেখে দেওয়া হয়। বাম দিকে টেনিস বল, মধ্যভাগে খেলোয়াড়দের পানীয় ঠাণ্ডাজল এবং দক্ষিণভাগে ঠাণ্ডা রাখবার যন্ত্র দেখা যাচ্ছে

দক্ষিণ চীন বনাম বর্ম্মা ঃ

দক্ষিণ চীন বনাম বর্ম্মা দলের দ্বিতীয় ফুটবল খেলাটি উভয় পক্ষে একটি করে গোল হওয়ায় অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে। চীন খেলোয়াড়দের আদান প্রদান সুন্দর এবং বিপক্ষ দলের গোল সম্মুখে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর বর্ম্মা দল অপেক্ষা উন্নততর হলেও তারা কয়েকটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করায় জয়লাভে সমর্থ হয় নি। বর্ম্মা দলের গোলরক্ষক বা সিদ

কয়েকটি অব্যর্থ গোল রক্ষা করে নিজ দলকে পরাজয় হ'তে রক্ষা করেন।

বিদ্রোহীতা ঃ

আই এফ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীতা করেছে, মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট। তাদের শাস্তি দিয়াছে আই এফ এ সর্ব্বসম্মতিক্রমে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ পর্য্যন্ত সাসপেণ্ড করে। এরিয়ান ক্ষমা চেয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে। তাদের অভিযোগপত্র সকাল ৮টায় প্রেসিডেণ্ট নিকলসের নিকট পৌছায়, কিন্তু তার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংবাদপত্রে ঐ পত্র প্রচারিত হ'য়েছে। সেই দিনই কোনরূপ প্রতিকার

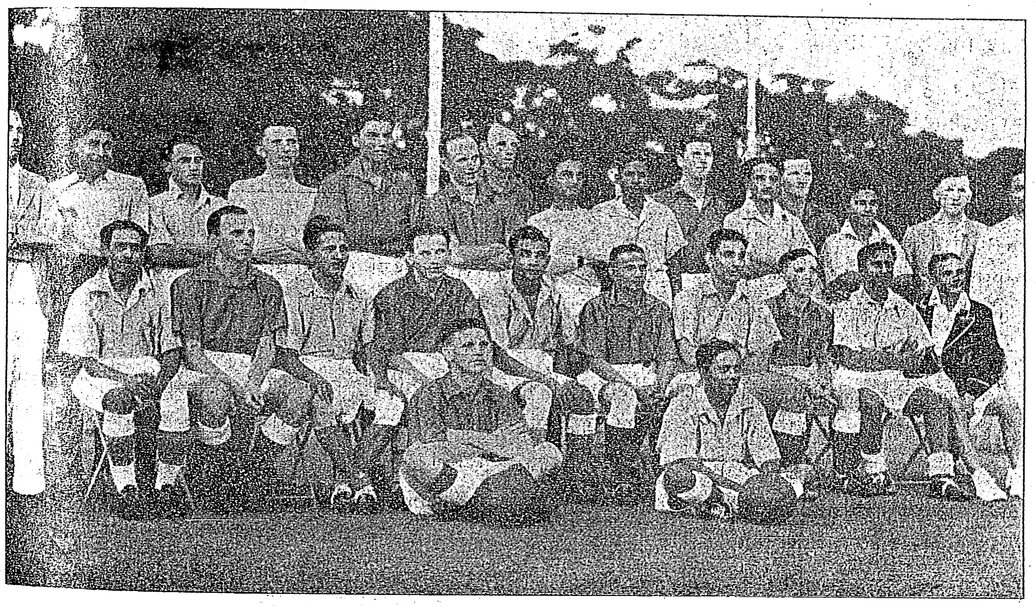

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় খেলোয়াড়গণ

না হলে মহমেডান ও ইষ্টবেঙ্গল তাদের সেইদিনের খেলায় যোগ দেবে না এবং ভবিষ্যতে কোন খেলায় নামবে না বলে ঐ পত্রে আই এফ একে শাসায়। খাজা নাজিমুদ্দীন সেদিন পার্ক রেষ্টুরেণ্টের সভায় বলেছেন যে একজন পাহারাওয়ালাকেও বরখাস্ত করতে হ'লে তাকে তার বিরুদ্ধের অভিযোগ জানাতে হয়। কিন্তু তিনি এটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না যে একটা এসোসিয়েশনকে নোটীস দিয়ে অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিকার করানোও বিশেষ সময় সাপেক্ষ।

প্রেসিডেণ্ট নিকলস সংবাদ পত্রে ঐ ক্লাবদের অভিযোগ পত্রের সকল বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন। ক্যালকাটা ফুটবল লীগ কমিটির বিগত সভায় (যাতে মহমেডান ক্লাবের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন) লীগ তালিকার পরিবর্ত্তন করা হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হয় যে, এই নূতন তালিকার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হবে না। অতএব খেলার তারিখ বা মাঠ পরিবর্ত্তন এক্ষণে অসম্ভব। ইহা গোলা লোকেও স্বীকার করবে যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা কারও ইচ্ছানুযায়ী বারবার পরিবর্ত্তন করলে কোন অনুষ্ঠানই চলা সম্ভব হয় না। ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রতিনিধির সেই সভাতেই ঐ তারিখ ও মাঠ সম্বন্ধে এবং কালীঘাটের প্রতিনিধির তাদের উপর্য্যুপরী খেলার বিপক্ষে প্রতিবাদ করে, যদি সম্ভবপর হতো, তার প্রতিকার করে নেওয়া উচিত ছিল। তা যখন তারা করেনি, তখন খেলার দিন বা তার পূর্ব্ব দিনে তাদের খুসি মত আই এফ একে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেবার সাহস তাদের মনে কি করে সঞ্চার হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। বোধ হয় আই

এফ এর পূর্ব্বের দুর্ব্বলতাই তাদের এইরূপ সাহসের কারণ।

কালীঘাটের উপর্য্যুপরি কয়েকদিন খেলার জন্য দায়ী তারাই। জনের মৃত্যুর জন্য তাদের খেলা স্থগিত রাখতে হয়। আবার ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাটের খেলার তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় তাদের অনেকগুলি খেলা বাকী পড়ে। গত বৎসরেও কালীঘাট কয়েকবার উপর্য্যুপরি খেলেছে। এ সম্বন্ধে আমরাই লিখেছিলুম, কিন্তু কালীঘাট কোন উচ্চবাচ্য করেছে বলে জানতে পারে নি। এ বৎসরে হঠাৎ তাদের বিদ্রোহীদলে যোগদানের কি গূঢ় ও গুপ্ত কারণ থাকতে পারে?

মোহনবাগান ও ক্যামেরোনিয়ান্সের খেলায় রাসেল চমৎকারভাবে একটি বল রক্ষা করছেন ছবি—আনন্দবাজার

এরিয়ান যে তাদের ভুল বুঝে সময়ে সরে পড়তে পেরেছে, তাতে তাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ।

ইষ্টবেঙ্গলের মহমেডানদের সঙ্গে যোগদানের কারণ কতকটা বোধগম্য হয়। কারণ, লীগে তাদের একমাত্র সুহৃদই যে মহমেডানস্পোর্টিং! প্রতিবারই তারা মহমেডানদের হারালেই তাদের বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড মুর্গেশকে হারাতে বাধ্য হয়। খেলার শেষে বিপক্ষের মাঠ থেকে পুলিস প্রহরী বেষ্টিত হয়ে তাদের জাঁক-জমকের সঙ্গে ফিরে আসতে হয় নিজের ঘরে, যেখানে তারা তাদের প্রতিবেশী শত্রু (তাদের মতে) মোহনবাগানের সভ্যদের কাছ থেকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা পেয়ে এসেছে। তারা চিরদিনই পরের মাঠে খেলতে ভালবাসে, পরের মাঠেই নাকি তাদের খেলা ভাল খোলে, কারণ মোহনবাগানরা সেখানে থাকে না। মোহনবাগান কিন্তু নিজ মাঠেই (নিয়ম মত যেগুলি তারা খেলতে পায়) খেলে, তাতে তাদের প্রতিবেশী সভ্যদের খেলা দেখতে দিতে আপত্তি নেই। শোনা যায়, অনেক ইষ্টবেঙ্গলের সভ্য শুধু মোহনবাগানের খেলা দেখবার জন্যে ইষ্টবেঙ্গলের সভ্যভুক্ত হয়েছেন, কারণ মোহনবাগানের সভ্য হওয়া এক্ষণে অসম্ভব ব্যাপার। ইষ্টবেঙ্গলের উচিত মোহনবাগানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করা। ষ্টেটসম্যান কাগজও লিখেছে, মোহনবাগানের নিজস্ব মাঠ হওয়া উচিত। আমাদেরও মত যে দুটো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবকে এক মাঠে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। মোহনবাগানের খেলা দেখতে অত্যধিক ভিড় হয়। কিন্তু সে তুলনায় ঐ মাঠে যাতায়াতের রাস্তার ব্যবস্থা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। হয় মোহনবাগানকে অন্য কোন রাস্তাঘাটের সুবিধাজনক বিস্তৃর্ণ মাঠে স্থান দেওয়া হউক, আর না হয় ইষ্টবেঙ্গলকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হউক। আচ্ছা, মহমেডানদের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলকে স্থান দিলে তো সোনায় সোহাগা হয়!

বিদ্রোহীদের আর একটি অভিযোগ খারাপ রেফারিং—এ সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট নিকলস যা' বলেছেন তাই যথেষ্ট।

What you say regarding the supervision of League matches has been heard over a period of years and as I have pointed out before, the job of refereeing is an unenviable task. The best of referees are abused, threatened and have to be provided with Police escorts and your great interest in football in this town prompts me to ask you to propose, from your own club. members or other suitable men, who, in your opinion, would be more capable than the referees we have at present to control games.

প্রেসিডেণ্টের একটি অতি সত্য কথায় বিদ্রোহীদলের বিশেষ আপত্তির কারণ হয়েছে। এতে তাদের অন্তরের নিভৃত কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 'If, by withdrawal from your engagements in C. F. L. you wish to belittle another club's performance in winning the league, and I can see no other reason for your present attitude, I believe you will be disappointed * * *"—মোহনবাগানের লীগ পাবার জন্য তোমাদের যে কত দরদ, তা' বেড়ার ধারের দর্শকদের মোহনবাগানের পরাজয় বা ড্র হলে আনন্দ প্রদর্শনেই মালুম হয়। ইষ্টবেঙ্গল তাবুতে ঢোকবার সময় ক্যামারোনিয়নদের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে "You must win" বলে উৎসাহিত করাও বোধ হয় মোহনবাগানের প্রতি ঐ ক্লাবের দরদেরই নিদর্শন। মার চেয়ে যে দরদী তাকে যা বলে তোমরা মোহনবাগানের তাই। মিটিংয়ে ভারতীয় ক্লাব মোহনবাগানের লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে না বললেই দেশের লোক তোমাদের ভুল বুঝবে না। যখন দেখলে যে আর মোহনবাগানের গতিরোধ করা চলে না, তখন খেলা বন্ধ করে লীগটা ভেস্তে দেবার ফন্দি ছাড়া আর কি বলা যায়। তাতেও না হ'লে, পরে বলা যেতেও তো পারবে যে আমরা খেলি নি তাই ওরা পেয়েছে। সব চাল যে বান-চাল হয়ে যাবে, তা তখন বোঝা যায় নি। ভেবেছিলে যে সন্তোষের মহারাজার আমলে যে রকমে কার্য্য উদ্ধার করে, আবার তাঁকেই দোষী বলে গালাগালি দিয়ে এসেছিলে সেই রকমই চলে যাবে। কিন্তু এবার শক্ত ঘানি—স্বাধীন জাতির মানুষ, ভুল বুঝিয়ে চোখ রাঙিয়ে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে না। সাবাস মিষ্টার নিকলস—এতদিনের পরে তুমি আই এফ এর মান রাখলে। যদিও বিদ্রোহী দলদের ঘোঁটেই আই এফ এর ৩৩নং রুল, এমন কি আই এফ এর ৬৬নং রুলেরও ন্যায্যতা রক্ষা করা হয় নি। এই সব কারণেই বিদ্রোহীদের মনে বল সঞ্চার হয়েছিল যে তারা যা করাবে আই এফ এ তাই করতেই বাধ্য হবে।

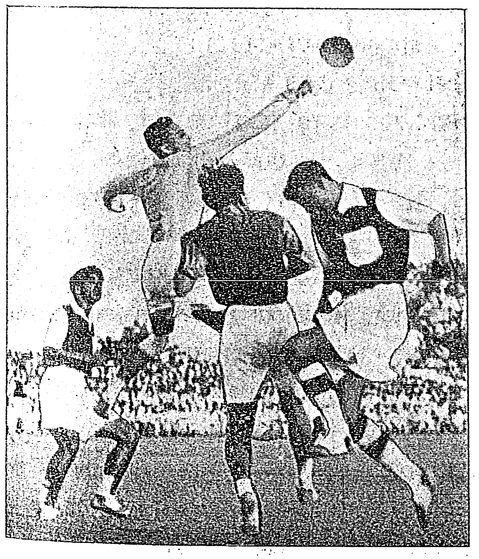

কালীঘাট বনাম মহমেডান স্পোর্টিং খেলায় কালীঘাটের গোলরক্ষক একটি অব্যর্থ গোল রক্ষা করছেন ছবি—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড

বিদ্রোহী দলের সভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে যে সন্তোষজনকরূপে আই এফ এর সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি না হ'লে নূতন ফুটবল এসোসিয়েশন গঠন এবং নূতন একটি ফুটবল লীগ খেলার বন্দোবস্ত করা হবে। বিভিন্ন প্রদর্শনী ফুটবল খেলা ও চ্যারিটি ম্যাচ খেলারও ব্যবস্থা হবে।

দোষী বলে অভিযুক্ত হ'য়ে শাস্তি পাবার পর সন্তোষজনকরূপে আপোষ-নিষ্পত্তির আশা করার অভিলাষ বাতুলতা নয় কি? সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখানও আছে, নূতন লীগ হবে, নানা রকম বাজী হবে···ইত্যাদি। বেশ, তবে তাই হোক্। আবার আপোষের কথা তোলো কেন? যা হয় কর—আপত্তি নেই। আই এফ একে অনুরোধ—তাঁরা ন্যায় রক্ষার্থ যে শাসন-দণ্ড উত্তোলন করেছেন তার যেন অমর্য্যাদা আর না করেন। অপাত্রে দয়া প্রদর্শনও পাপ। মাফ্ চাইলেই তা পাওয়া যায় না। কঠোর দণ্ডে ক্রমশঃ মাঠের আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে, খেলার মাঠে শান্তি আসবে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। সত্য ও ন্যায়ের বিচার করতে কারো মুখ চাইবার দরকার নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে ন্যায় বিচার করলে তাতে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

রেফারিং ঃ

চিরকালের মতন এবারও রেফারিং ভাল হয় নি, এ সত্য। কিন্তু রেফারিংয়ে দোষ ত্রুটি থাকলেও এবার

রেফারিদের অন্যবারের অপেক্ষা বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। ইংরাজ রেফারিও বাদ যান নি। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাতেই বিশেষ করে রেফারির লাঞ্ছনা হয়। কর্পোরাল হ্যাণ্ডিসাইড মহমেডানদের বিরুদ্ধে কাষ্টমসের পক্ষে পেনালটি দেওয়ায় ক্লাবের মেম্বাররাও তাকে রেহাই দেয় নি। সার্জ্জেণ্টদের এসে তাকে রক্ষা করতে হয়। মহমেডানদের পক্ষের কথা, জলকাদার মাঠে একটু পা পিছলে পড়লে পেনালটি দেওয়া উচিত হয় নি। কোন কাগজে লেখা হয়েছিল, it appeared to be a foul which was not of very serious nature. It might have been unintentional. অনিচ্ছাকৃত ফাউলও যদি পেনালটি সীমানার মধ্যে হয়, তাতেও পেনালটি হয়। রেফারির মতে হ্যাণ্ডবল ইচ্ছাকৃত না হলে রেফারি তা' না ধরতে পারেন, পিছন থেকে ধাক্কা দিলেই তা' ফাউল হয়, তাতে বিপক্ষ পড়ুক আর না পড়ুক এবং সে ফাউল পেনালটি সীমানার মধ্যে হলেই তাতে পেনালটি দিতে হয়।

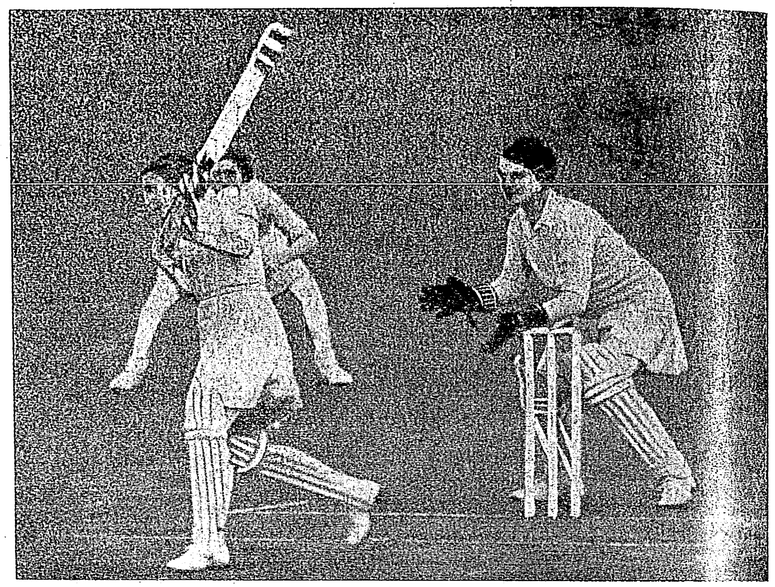

কেন্ট বনাম সারের মহিলাদের ক্রিকেট খেলায় কুমারী এম হাউড (সারে) ব্যাট করছেন

রেফারি গিলসনও একটি খেলাতে লাঞ্ছিত হন। সেই জন্য এই দুই জন মিলিটারী রেফারি মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা পরিচালনা করতে অস্বীকার করে আই এফ একে পত্র দিয়েছেন। কলিকাতার ফুটবল জগতে এ ঘটনা নূতন। পূর্ব্বেও কখন কখন রেফারিরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। কিন্তু একই দলের খেলা পরিচালনা করতে হলে তাদের যে প্রাণান্ত হ'তে হবে এরূপ ভাব পূর্ব্বে ছিল না। মোহনবাগান ও মহমেডানদের চ্যারিটি খেলা পরিচালনায় রেফারি পাওয়া দুর্ঘট হয়েছিল। যদি না ভারতীয় রেফারি প্রাণের মায়া উপেক্ষা করে পরিচালনা করতে নামতো। যেরূপ বিপুল পুলিস বাহিনী মাঠের মধ্যে এবং আসে পাশে সজ্জিত রাখা হয়েছিল, তাতে খেলাধূলা যাঁরা দেখেন না তাদের অন্যরূপ ব্যাপার ঘটবার আভাস মনে এসেছিল। ইহাও বোধ: হয় কোন দলের পক্ষে সম্মানজনকই বলে মনে হবে।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

লীগ খেলা এখনও সমাপ্ত হয় নি। জগাখিচুড়ি হয়ে আছে। বুঝতে পারা যাচ্চে না আই এফ এ অপরাধী দলগুলির পয়েণ্ট বণ্টন সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা ক'রবেন। দু'রকম ব্যবস্থা হ'তে পারে। হয় দলগুলির সঙ্গে যাদের খেলা বাকী আছে তারা পূর্ণ পয়েণ্ট পাবে, অথবা লীগের খেলার গোড়া থেকে তাদের সঙ্গে খেলায় অন্য ক্লাবগুলির হারজিতের সব পয়েণ্ট বাদ যাবে। এখনও এরিয়ানের সঙ্গের খেলা বাকী, তা' হ'লেও মোহনবাগান লীগ বিজয়ী, কেন না রেঞ্জার্সের সঙ্গে তাদের অনেক পয়েণ্টের তফাৎ। অবশ্য এরকম বিশেষ অবস্থা না হ'য়ে যদি মহমেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট তাদের পরবর্ত্তী খেলাগুলি খেলতো তাহ'লেও মোহনবাগানেরই লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার আশাই অধিক ছিল। কারণ বাকী তিনটী খেলায় তিন পয়েণ্ট পেলেই মোহনবাগান বিজয়ী হতো; অন্য দলরা সবগুলি খেলায় জয়ী হলেও। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের উপর বিশেষ অধিকার বিস্তার ক'রতে পারেনি। মোহনবাগানের বিশেষ বাহাদুরি যে তারা প্রথম থেকেই শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। একদিনের জন্যও কেউ তাদের

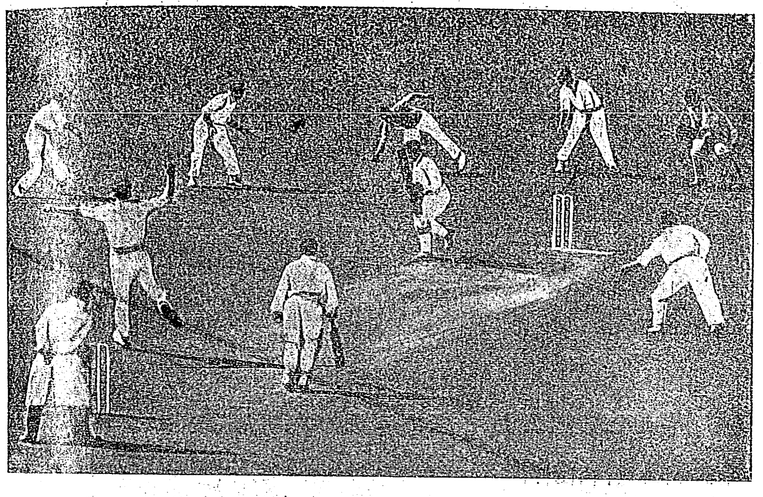

ওভাল মাঠে গোভারের বলে গ্রেগারী এক হাতে সুন্দর ক্যাচ নিয়ে ক্রমকে আউট করেছেন

স্থানচ্যুত করতে পারে নি। তারা মাত্র ভবানীপুরের সঙ্গে খেলায় একবার পরাজিত হয়েছে, আর কেহ পরাজিত করতে পারে নি। ২১টি খেলে তারা ৩৩ পয়েণ্ট পেয়েছে। তাদের শেষ খেলা আজ এরিয়ান্সের সঙ্গে হবে।

লীগে দ্বিতীয় স্থানে আছে রেঞ্জার্স'। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে স্পোর্টিং ইউনিয়ান প্রথম বিভাগে উঠবে। বহুদিন পরে তারা প্রথম বিভাগে আসবার যোগ্যতার্জ্জন করলে।

শীল্ড খেলা ঃ

আজ ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবারের বারবেলা থেকে শীল্ড খেলা আরম্ভ হবে। বিয়াল্লিশটি দল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। মাত্র তিনটি বাইরের সামরিক দল, ইষ্টইয়র্ক (গতবারের বিজয়ী), রয়েল ফুজিলিয়ার্স ও ডি সি এল আই, আঠারটি স্থানীয় ক্লাব এবং বাকীগুলি ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ক্লাব। এ বারের নূতনত্ব, নানা ছোট ছোট ক্লাব যোগদান না করে প্রতি জেলার সম্মিলিত দল যোগদান করেছে। এতে প্রথম রাউণ্ড থেকেই খেলাগুলি বেশ প্রতিযোগিতা- মূলক হবে বলে আশা হয়।

মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

জো লুই ও গালেনটো ঃ

ইয়াঙ্কি ক্রীড়াঙ্গণে জো লুই তার প্রতিদ্বন্দ্বী টনি গালেনটোকে চতুর্থ রাউণ্ডে টেকনিক্যাল নক্ আউটে পরাজিত করে পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গালেনটো প্রথম ও তৃতীয় রাউণ্ডে বিজয়ী হ'ন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর ঠোঁট কেটে যায় এবং নাক হ'তে অতিরিক্ত রক্ত পড়া সত্ত্বেও তিনি নির্ভীকভাবে খেলেছিলেন। এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখবার জন্য দর্শক সমাগম হ'য়েছিল ৩৪,৮৫২ এবং টিকেট বিক্রয়ে ৪৮, ৬০ ষ্টার্লিং উঠেছিল। জো লুইয়ের ওজন—১৪ ষ্টোন ৪·৭৫ পাউণ্ড এবং গালেনটোর ওজন ১৬ ষ্টোন ৯·৭৫ পাউণ্ড।

ফ্রাঙ্ক ম্যালিনো ও ইয়ং ফ্রিস্কো ঃ

ভারতীয় লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায় ফ্রাঙ্ক ম্যালিনো ও ইয়ং ফ্রিস্কোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'য়েছে। ইয়ং ফ্রিস্কো প্রাচ্যের চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা এবং ম্যালিনো ভারতের লাইট হেভিওয়েট বিজয়ী। বাঙ্গলাদেশে এই দুইজন মুষ্টিযোদ্ধার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইহাই প্রথম। সিঙ্গাপুরে ফ্রিস্কো দু'বার ম্যালিনোকে পরাজিত করেছিলেন। ফ্রিস্কোর ওজন ১১ ষ্টোন ২ পাউণ্ড এবং ম্যালিনোর ওজন ১১ ষ্টোন ১০ পাউণ্ড। ফ্রিস্কো ওজনে ম্যালিনো অপেক্ষা ৮ পাউণ্ড কম। কিন্তু তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণে বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত ক'রেছেন। খেলাটি বার রাউণ্ড পর্য্যন্ত হ'য়েছিল এবং বেশীর ভাগ সময়েই ম্যালিনো ফ্রিস্কোকে আক্রমণে ব্যস্ত রাখিলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। ফ্রিস্কোর ঘুঁসির জোর বেশ তীব্র এবং তিনি

দু'একবার 'আপার কাট' মারবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম রাউণ্ডে ম্যালিনোর লড়াই ভাল হ'য়েছিল কিন্তু শেষের দিকে ফ্রিস্কোই ভাল লড়েছিলেন।

লাইট ওয়েট প্রতিযোগিতায় রবিন সরকার ও মরিস কোনরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরকার পঞ্চম রাউণ্ডে টেকনিক্যাল নক্ আউটে কোনারকে পরাস্ত করেন। প্রথম রাউণ্ডে রবিন ধীরভাবে খেলতে থাকেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে উভয়েই বেশ আক্রমণ করেন এবং মরিস বাম হাতের 'সুইং' দ্বারা সরকারের মুখে আঘাত করতে থাকেন। এই সময় রবিন 'রাইট সুইং' চালিয়েও কোনরকে আঘাতে সক্ষম হন নি। তৃতীয় রাউণ্ডে রবিনকে দুবার ভূতলশায়ী হ'তে হয়। চতুর্থ রাউণ্ডে কোনর রবিনকে দড়ির ধারে ভীষণ আঘাত করেন। পঞ্চম রাউণ্ডে কোনর ভাল লড়লেও রাউণ্ড শেষ হ'বার আগে দু'বৎসর পূর্ব্বে এপেণ্ডিসাইটিসের জন্য যে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল পেটের সেলাইগুলি খুলে যাওয়ায় তার যন্ত্রনায় পুনরায় লড়তে অসমর্থ হন। ট্রেচারে তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

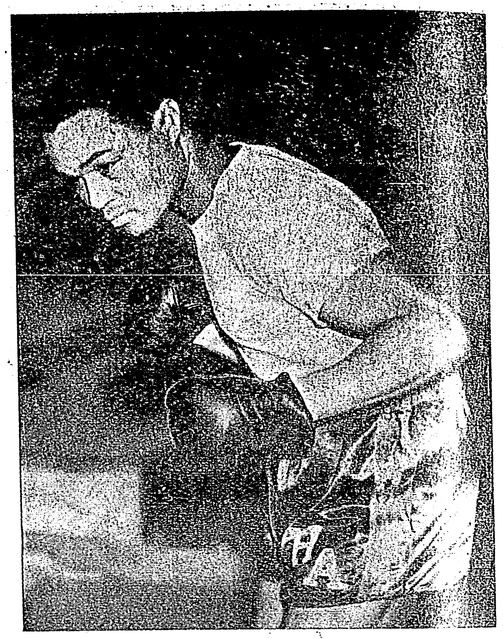

পৃথিবীর ওয়ালটার ওয়েট চ্যাম্পিয়ান আর্ম্মষ্ট্রং

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "শেষের পরিচয়"—২৷৷০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মরুর মাঝারে বারির ধারা—১৷৷০

সুধীরেন্দ্র সান্যাল প্রণীত (উপন্যাস) "পথ ও পথিক"—২৲

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ অনূদিত "দিওয়ান-ই-মখ্‌ফী" (জেব্-উন্নিসা)—১৲

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত "তীর্থঙ্কর" (কথোপকথন)—২৸০

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আত্মসমর্পণ"—২৲

শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "নষ্টতারা"—১৲

ডাঃ শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র প্রণীত "রামায়ণ বোধ" বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ"—২৲

শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত গল্পগ্রন্থ—"তৃষা"—১৲

দীপিকা দে প্রণীত উপন্যাস "বর্ম্মা দেশের মেয়ে"—১৷৷০

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত পৌরাণিক নাটক "রামকৃষ্ণ"—১৷৷০

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত (গল্প পুস্তক)—"কয়েক ঘণ্টা মাত্র"—১৲

শ্রীগৌতম সেন প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়া ও মানসী"—১৷৷০

রায় বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত মুস্লিম নারী চিত্র "পুরবাসী"—১৷০

ডাঃ প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত হাইড্রোপ্যাথি মতে "শিশু-চিকিৎসা"—১৲

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত Gospel of Buddhaর অনুবাদ "বুদ্ধবাণী"—৸০

শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রহস্য সিরিজের "মৃত্যুচক্রের মায়াবিনী"—৸০

ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স প্রণীত পুস্তকের অনুবাদ "সমাজতন্ত্রবাদ-কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক"—১৷০

শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা"—১৷০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "মরণ মহল"—১৷০

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "পাশ্চাত্য পাকপ্রণালী ও বেকারী দর্পণ"—১৷০

কার্ল মার্কস্ প্রণীত পুস্তকের অনুবাদ "কেপিটেল—সংক্ষিপ্তসার"—১৷৷০

সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ‖ শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

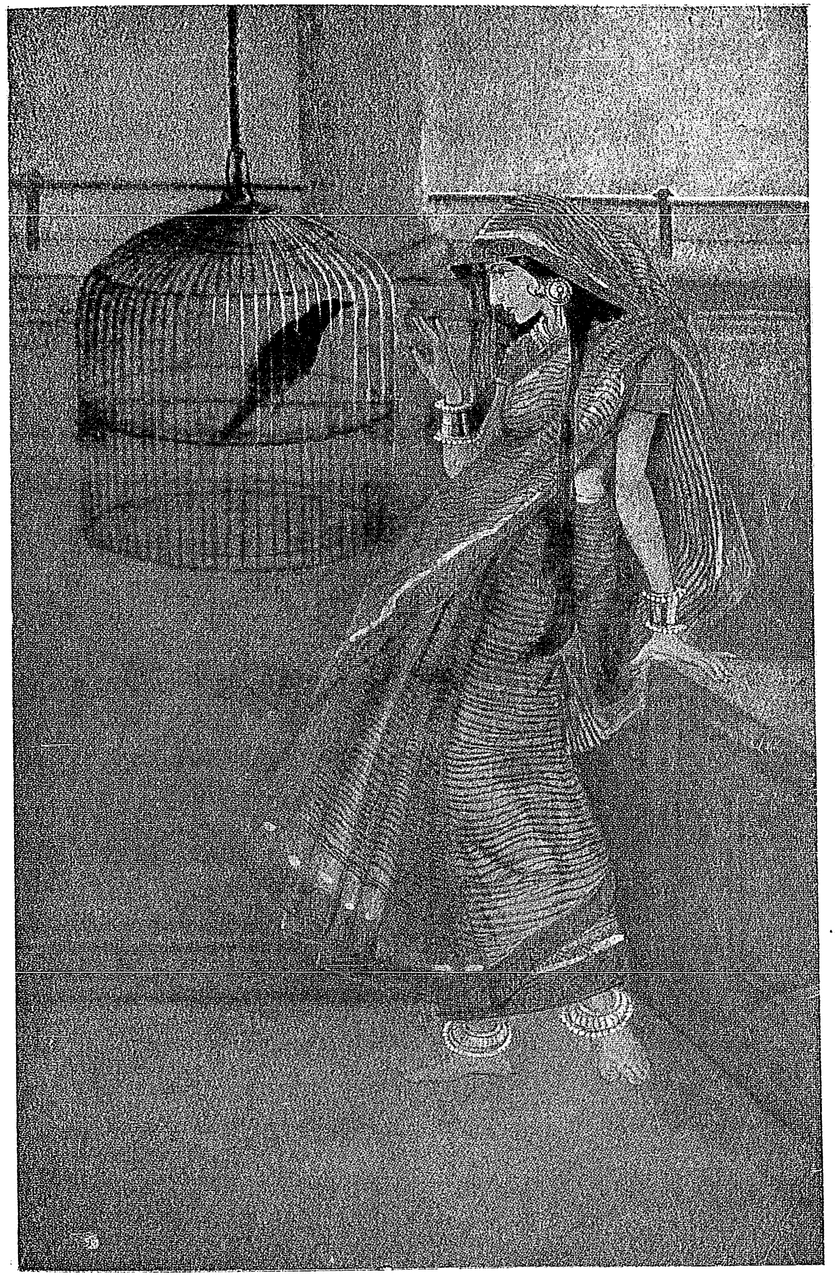

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শৈলেন দাশ পিঞ্জরে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্